চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা শহিদদের আত্মবলিদানের পরবর্তী নির্বাচিত কবিতার কথা

"Thou wast not born for death, immortal Bird!
No hungry generations tread thee down;"[1]
('Ode to a Nightingale' – John Keats)

ভাষা শহিদদের উদ্দেশ্যে আমরাও জন কিট্‌সের (নাইটিঙ্গলের উদ্দেশ্যে) বলা অমৃত বাণীর মতো বলতে পারি তুমি/তোমরা মরে যাওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করোনি, শহিদ হও নি— এই পৃথিবীতে। এবং কোনও ক্ষুধার্ত বা অবক্ষয়ী উত্তরসূরী তোমাদের আত্মবলিদানের মহিমাকে ম্লান করতে পারবে না কখনও কোনদিন। বরাক উপত্যকার ১৯৬১ সালের ১৯মে ভাষাশহীদরা শাহাদৎ বরণ করার পর থেকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে কবিতায়) এক গভীর নান্দনিক, আলংকারিক, শারীরিক পরিবর্তন আসল—এক বৈপ্লবিক ভাবজাতসহ জোয়ারসহ। কবিতার আঙিক পরিবর্তন হল, পট পরিবর্তন হল, পটভূমি পরিবর্তন হল অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ পরিবর্তন হল, বিষয় ধাতুর পরিবর্তন হল—ঐ মহা উৎসর্গের দানে, উর্বরতায়। অর্থাৎ বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতা জগৎ এক নতুন মাত্রা পেতে শুরু করল—পেয়ে গেল এক নতুন পৃথিবীর সরঞ্জাম—উর্বরতাপূর্ণ মাঠ। এর আগে কোথাও এই রকমভাবে সাহিত্যে (কবিতায়) বাঁক ফেরানোর মতো সামগ্রী পাননি বরাকের কবিরা।

বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতা বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের প্রথমদিকে অর্থাৎ ষাটের দশক থেকেই অনেক আধুনিক হয়ে ওঠল। এই আধুনিকতাটা কিন্তু এখানকার আলো হাওয়া জল মাটি আকাশ প্রভৃতির প্রকৃতি, প্রবণতা ও পারিপার্শ্বিকতার মাপ অনুযায়ী। তারপর বিশ্বের আধুনিক কবিতার কাছাকাছি, তুলনা, সংযোগ, সংগতি, বিচার ইত্যাদি। এখানে একটা কথা গভীরভাবে মনে রাখতে হবে যে বিশ্বের ও দেশের বিভিন্ন পরিবর্তন, জাগরণ, রূপান্তর, আবিষ্কার, উন্নতি অবনতি, উত্থান পতন ইত্যাদি এইসব কবিদের প্রতিভায় শেকড়ে গভীর উর্বরতা যোগান দিয়েছিল — কোথাও প্রত্যক্ষভাবে কোথাও পরোক্ষভাবে। এখানে মনে করতে পারি ১৯১৪-১৯১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯-১৯৪৫ সাল ও পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ। দেশের বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলন, কার্ল মার্কস্-এঙ্গেলস্, ডারউইন- লেমার্ক, ফ্রয়েড-ইয়ুঙ্গ-লাকা প্রভৃতি চিন্তাবিদদের চিন্তাচেতনার তুমুল চর্চা চর্যা অনুশীলন ইত্যাদি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের উত্তাল সময় বাংলা ভাগ — মানুষের ভিটেমাটি স্থানবদল, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রক্তমাখা দিন, ১৯৬০-এর জুলাই মাসের কুখ্যাত 'বঙ্গাল খেদা' ষড়যন্ত্র ও বর্বরতা, ১৯৬১-এর ১৯-এ মে'র রক্তঝরা দিন এবং আন্দোলন। কলকাতার বিভিন্ন কাব্য আন্দোলন, বিভিন্ন সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব বিকাশ প্রচার প্রসার প্রয়োগ ইত্যাদি, ১৯৭১ সালে আবার বাংলা ভাগ, ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট ও ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই আরও তিনজন ভাষা শহিদ, ১৯৮৩ সালে নেলী ও গোহপুরে বর্বর গণহত্যা। এবং তারপর আরও অন্যান্য অনেক ঘটনা, আন্দোলন, বিবর্তন ইত্যাদির ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, পরিণতি, ইতিহাস, ফুল ফল ফসল এইসব পটভূমি ইতিহাস চাষ ইত্যাদির দানে স্পর্শে উপাদানে প্রভাবে স্রোতে আলোজলে এখানকার কবির কবিতা হয়ে ওঠল একদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন অন্যদিকে আধুনিক। অর্থাৎ বরাকের কবিতা শুধু একটা প্রান্তিকায়িত জায়গার কবিতা থেকে মুক্তি পেতে লাগল। এই মুক্তি পাওয়ার পেছনে আরও একটা গভীর কারণ আছে, তা হল এইসব কবিরা

বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল আধুনিক কবি এবং তাদের কবিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত। এখানে বিশ্বচেতনা ও বিশ্বজনীনতাবোধ এসে যোগ হয়ে এইসব কবির সৃষ্টিতে আলাদা একটা মাত্রা যোগ করেছে তার বহুরূপে, বহুস্বরে, বহুমাত্রায়, বৈচিত্র্যে, আঙ্গিকে, প্রকরণে, শৈলীতে, বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন বাঁকে বিভিন্ন রঙে।

ভাষাশহিদ দিবস থেকে অর্থাৎ ষাটের দশক থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছরের একটা বিশাল বাঁক। এই বাঁককে আবার দশক অনুযায়ী চারটা ভাগে ভাগ করা যায়। কিন্তু অন্যভাবে বিচার করলে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় — এক) ষাট-সত্তর দশকের কবিতা এবং দুই) আশি-নব্বই দশকের কবিতা। আলোচনার সুবিধার্থে এইভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। আলোচনার সুবিধার্থে কথার চেয়ে বড় কথা হল সময়ের একটা হিসেব, বাঁক, গভীরতা, দান, উর্বরতা, রঙ, রূপ ইত্যাদি বোঝার জন্য এরকম ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন ষাটের দশকের কবিতার মূল সুর ইঙ্গিতধর্মী ছিল। সত্তরের দশকেও তার রেশ ছিল তবুও সত্তর আশির দশকের কবিতা প্রধানত বিবৃতিধর্মী। বক্তব্যকে সরাসরি তুলে ধরার প্রবণতা বেশি ছিল। কিন্তু নব্বই দশকের কবিতা এই জিনিসটাকে অনেকটা কাটিয়ে নান্দনিক ব্যঞ্জনাকে গ্রহণ করে প্রকরণ, শৈলী ও শব্দবন্ধনে অনেক উন্নতি করল। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ষাটের দশকে কবিতায় সাহিত্যিক আধুনিকতা কেবল নান্দনিক আধুনিকতা হিসেবেই প্রকাশ পেয়েছে। এই আধুনিকতা সমাজে এল না। সামাজিক আধুনিকতা আসে নি তাই সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, টানাপোড়নে বেঁধে রইল এই আধুনিকতা। কিন্তু আশির দশক থেকেই সমাজে আধুনিকতা এল ভিন্ন মাত্রা নিয়ে। তাই এই দশক থেকে কবিতা অন্য মাত্রা নিয়ে আরও আধুনিক হয়ে ওঠল। তার আগে ষাটের দশক থেকে তার চাষ পর্ব বলতে পারি আমরা।

কিন্তু আমরা কোনোভাগে ভাগ না করে নির্বাচিত কিছু শ্রেষ্ঠ কবিতা নিয়ে গবেষণার পথে এখানকার কবিতার আধুনিকতা, প্রবণতা, সময়, সমাজ বাস্তবতা, বহুস্বর, বৈচিত্রময়তা ইত্যাদি দিক নিয়ে সামগ্রিকভাবে কবিতা চর্চা করে এগিয়ে যাব। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু এটাই। তবে একটা কথা উল্লেখ করা উচিত যে এই শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি রণজিৎ দাশ, মনোতোষ চক্রবর্তী, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, করুণাসিন্ধু দে, তপোধীর ভট্টাচার্য প্রভৃতি কবির নির্বাচিত। অর্থাৎ এ অঞ্চলের প্রথম সারির কবিদের নির্বাচিত এবং শ্রেষ্ঠ শিরোপা দেওয়া কবিতা থেকে নির্বাচিত। তাই এই নির্বাচিত বা শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি বহু আলোচনাযোগ্য, চর্চাযোগ্য, সমৃদ্ধ বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন দিক দিয়ে। কোনও কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাই মহৎ কবিতা। আর এই শ্রেষ্ঠ কবিতাতেই তাঁর কবিপ্রতিভা সম্পূর্ণ বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাই আমরা এই পথ নির্বাচন করেছি।

আমরা আরেকটা জিনিস বিশ্বাস করি যে, যে কোনও কবিতার দুই চারটা লাইন নিয়ে আলোচনা চর্চা করে সমগ্র কবিতার বিচার হয় না। সমগ্র কবিতা বিশ্লেষণের আলাদা একটা মূল্য আছে যা সমগ্র কবিতাকে পুরোপুরি বা সামগ্রিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় — বোঝাও যায়। এই জায়গায় রোমাণ্টিক কবি কোল্‌রিজের 'Kubla Khan' এর কথা মনে করতে পারি। এই কবিতাটি লিখতে বসে প্রথম স্তবক লেখার পর তাঁর ঘরে একজন মানুষ এসেছিল। তাই বিরতি হয়ে গেল মাঝখানে। পরে কবিতাটি সম্পূর্ণ করলেন। যদিও ঐ প্রথম লিখার সময় ভাবজগতে একটা বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। কিংবা আধুনিক কবি বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার'এর কথা মনে করতে পারি। এই কবিতাটি অর্ধেক লিখে ঘুমিয়ে পড়লেন কবি। ঘুম থেকে ওঠে কবিতাটি সম্পূর্ণ করলেন। এরকম কোনও কারণে বা অকারণে বা অন্য কোনও কারণে কি শুধু উজ্জ্বল স্তবককেই গুরুত্ব দেব? 'Kubla Khan' ও 'ঘোড়সওয়ার' সম্পূর্ণ আলোচনায় আলাদা অনুভব আছে। ঠিক সেরকমই কোনও কবিতা রচনার সময়ের মাঝখানে বিরতি বা ভিন্ন রকম ভাব থাকুক আর নাইবা থাকুক সম্পূর্ণ কবিতার আলাদা একটা মানে মূল্য আছেই। যে কোনও শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্পূর্ণ চর্চাবিশ্লেষণ বা সম্পূর্ণ বিচারই হল

সুবিচার। কোনও সৃষ্টি বা শিল্পকে আংশিকভাবে বিচার করলে তার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। অর্থাৎ বাকি অংশগুলি অচর্চিত হয়ে থেকে যায়। কিন্তু যখন একটা শিল্পকে সামগ্রিকভাবে বিচার করি তখন তার থেকে সামগ্রিক চিন্তাচেতনা ফুটে ওঠে — বার হয়ে আসে সম্পূর্ণতার ধারণা। সেইজন্যই আমরা প্রতিটা কবিতার সম্পূর্ণ পাঠে বিশ্বাস করি।

কিন্তু কবিতা বিচারের আগে কয়টা বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। প্রথমে 'আধুনিকতা' সম্পর্কে কথা বলা জরুরি। কারণ এই 'আধুনিকতা' নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা আলোচনা সমালোচনা বিশ্লেষণ হয়েছে — বিভিন্ন পথে, বাঁকে। বিশ্বের প্রতিটা দেশে 'আধুনিকতা'-র চাষ হয়েছে নিজস্ব অবস্থান দেশকাল সময় সমাজ ঐতিহ্য সংস্কৃতি ইত্যাদির মাপ অনুযায়ী।

'আধুনিকতা' এই বহুস্বরিক বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যময় বিষয়টি কোনও একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় প্রকাশ করা যায় না। কারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলোচক সমালোচক কবি সাহিত্যিক তাত্ত্বিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিষয়টিকে মূল্যায়ন করেছেন। আধুনিকতা মূলত একটা ধারণা। যা সময়ে সময়ে সমসাময়িকভাবে ধরা দিয়েছে — প্রকাশ পেয়েছে তার রূপ। এই 'আধুনিক' শব্দ থেকে আধুনিকতা, আধুনিকতাবাদ, উত্তর আধুনিক, উত্তর-আধুনিকতাবাদ ইত্যাদি তত্ত্ব ধারণা চেতনার উদ্ভব বিকাশ বিস্তার প্রয়োগ চাষ ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

> *''কাজটা সহজ নয়। কারণ পাঁজি মিলিয়ে মডার্‌ণের সীমানা নির্ণয় করবে কে? ... নদী যেমন বাঁক ফেরে সাহিত্যও তেমনি গতি বদলায়। সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে — মডার্‌ণ। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।''*[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধুনিকতার ধারণা আজ একুশ শতকের মানুষ (গবেষক) হয়ে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারছি না। কারণ এটা ঠিক আধুনিকতার সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া খুব কঠিন। তার বাঁক বদলেছে বারবার। সাহিত্যও তার সঙ্গে বাঁক বদলায়। সাহিত্যের এই বাঁক বদলটার পথ হাঁটাটাই হল আধুনিকতা। কিন্তু এই জিনিসটা বা বিষয়টা কেবল মর্জি নিয়ে নয় কিন্তু — সময় নিয়েই। অর্থাৎ আসল কথাটা হচ্ছে আধুনিকতাটাকে তো সময় দিয়েই ধরতে হবে। এতে কোনও নির্দিষ্ট সময় না-ও থাকুক। খণ্ড খণ্ড বা বিখণ্ডিত সময় দিয়েই হোক। তাকে সময় দিয়ে বিচার করতে হয়। কারণ সময়ের বাঁকে যখন সাহিত্য বদলায় তখন আধুনিকতার ধারণাটাও তো বদলায়। আর এই বদলানোটা তো সময়ের দাবি, নির্দেশ, আদেশ, চাহিদা, ইচ্ছা, বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা ইত্যাদির সূত্রানুযায়ী। এই জায়গায় বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য মনে পড়ে —

> *''আধুনিক বাংলা কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা যেন সবিস্ময়ে এই কথাটা উপলব্ধি করি যে ঐক্যের মধ্যেও বিপরীতের স্থান আছে, বিরোধের মধ্যেও সংহতির সম্ভাবনা।*
>
> *অর্থাৎ, এই আধুনিক কবিতা এমন কোনও পদার্থ নয় যাকে কোন-একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকলভাবে শনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের , ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে, শুধু ভিন্ন-ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।''*[২]

এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা আধুনিক কবিতার বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য রূপ স্বর সুর উপাদানের কথা পাই। এই বয়ান পরেই বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিদের কথা বলতে গিয়ে আবার অন্যরকম করে বলেছেন —

''এই কবিরা নতুন সুর এনেছেন আমাদের কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন সুর, রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন সুর। এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্রভাবে নতুন। এই কথার অর্থ অনেকখানি।''[৩]

এই বয়ানে সময় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিরা বাংলা কবিতায় 'নতুন সুর', 'প্রথম নতুন সুর' এনেছেন। সেই নতুন সুরটাই আধুনিক সুর — ঐ সময়ের আধুনিক 'প্রথম নতুন সুর'। এখানে একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে চট্ করে তবে বাংলার প্রথম আধুনিক কবি মধুসূদন দত্ত কি আধুনিক নন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কী নন আধুনিক? অবশ্যই মধুসূদন দত্ত একজন শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। তবে তাঁরা একটা বিশেষ সময়ে — বিশেষ সময়ের আধুনিক। যখন তারা 'নতুন সুর' বা 'প্রথম নতুন সুর' শুনালেন স্বতন্ত্রভাবে তখন তাঁরা আধুনিক। এই আধুনিকতাটাকে বলতে পারি অন্যরকম আধুনিক। অর্থাৎ সমসাময়িক সময়ে থেকেও সমসাময়িক সময়কে অতিক্রম বা উত্তীর্ণ করে স্বতন্ত্রভাবে 'নতুন সুর', 'প্রথম নতুন সুর' শুনালেন তখন তাঁরা সার্থক আধুনিক। আজও তাঁরা নিজের সময় অবস্থান পারিপার্শ্বিকতার পরিসরে আধুনিক। কিন্তু আজকের কবিতা তাদের ভাব, প্রভাব, পথ, কাল, ইত্যাদি পার হয়ে গিয়ে আজকের সময় অনুযায়ী আধুনিক। বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যে তার আভাস পাওয়া যায়।

এই ভাব ধারণাকে আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রকাশ করেছেন সময়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে —

''আধুনিকতার ধারণা স্বভাবতই গতিশীল ধাবমান। সে-কালের যৌবন মদমত্ত আধুনিকতা একালে লোলচর্ম পলিত কেশ; আবার একালের ঝক্‌ঝকে আধুনিকতা পঁচিশ পঞ্চাশ কি একশ বছর পরে বেজায় সেকেলে হয়ে যাবে।''[৪]

এই মন্তব্যের একটা ঝক্‌ঝকে উদাহরণ মনে পড়ছে মোহিতলাল মজুমদার নিজের কবিতাকে খুব আধুনিক বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু দু'চারটা কবিতা ছাড়া আজ মোহিতলালের কবিতাকে আধুনিক বলে কেউ বিচার করে না। আজ সেইসব আধুনিক কবিতা 'বেজায় সেকেলে'।

কিন্তু এখানে আরেকটা কথা। শুধু সময়ের দিক দিয়েও আধুনিক কবিতা হয় না। এই সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের একমাত্র কবিতার আলোচনাগ্রন্থ 'কবিতার কথা'-য় বারবার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম করে বলেছেন। যেমন—

''নূতন সময়ের জন্যে নতুন ও নতুনভাবে নির্ণীত পুরোনো মূল্য, নূতন চেতনা ও নতুনভাবে আবিষ্কৃত পুরোনো চেতনার যে একান্ত দরকার শিল্পে ও জীবনে এ কালের কোনো কোনো বাঙালী কবি সেটা বুঝতে পেরেছেন।''[৫]

এই বয়ানে সময়ের বাঁকের সঙ্গে সঙ্গে তুমুল নতুনত্ব ও নতুন চেতনার একান্ত দরকার — 'আধুনিক কবিতা' হয়ে ওঠার পথে। আমাদের অতীত-ই বর্তমানকে নির্মাণ করে আর অতীত-বর্তমান মিলেমিশেই ভবিষ্যতকে নির্মাণ করে। তাই অতীত বা পুরাতনকে নতুনভাবে নতুনত্ব দিয়ে আবিষ্কার করে গ্রহণ করতে হয়। তাই 'বর্তমান' নতুনত্বে উজ্জ্বল হয় — আধুনিকও। হয়তবা সে জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সময়কে গভীরভাবে উপলব্ধি করে ভবিষ্যতে আরও বেশিদিন আরও বেশি আধুনিক থাকার কথা চিন্তা করে লিখেছিলেন '১৪০০ সাল' কবিতা।

জীবনানন্দ দাশের আরও একটা মন্তব্য স্মরণ করা প্রয়োজন মনে করি এখানে —

''আধুনিক বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য দিকটার অভ্যুত্থান হল নতুন সময় তার নতুন দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বলে। মধুসূদন যেমন বিদেশী সাহিত্যিকদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী — রবীন্দ্র বঙ্কিমও তাদের কাছে অল্পাধিক গিয়েছিলেন — বর্তমান কবিদেরও অল্পবিস্তর পরস্পরনিঃসক্ত বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী তেমনি বোদলেয়র ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের থেকে শুরু করে ইয়েটস্, এলিয়ট ও পাউন্ড-এর কাছে গেলে

খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্বের গরিমা সে সব জায়গায় খুঁজে পেয়েছে বলে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালী কবির তেমন মন যোগাত না; অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভারলেন, রঁসার ও ইয়েটস্ ও এলিয়ট-এর সদর্থক বা নঞর্থক মননবিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।"[৬]

এই বয়ান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতায় এইসব বিদেশী কবি সাহিত্যিকদের 'সদর্থক বা নঞর্থক মননবিচিত্রতা'র মাত্রা যোগ হল। বরাক উপত্যকার কবিতাবিশ্বও তার ব্যতিক্রম নয় — অন্তত আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে। এই আশ্রয় গ্রহণ সংযোজন — আধুনিক কবিদের কবিতায় বহু বিচিত্র দৃষ্টিকোণটি বিচিত্র মাত্রায় সমৃদ্ধ হয়ে গেল — তাদের চেষ্টায় অনুশীলনে চর্চা চাষে। বুদ্ধদেব বসু কথিত আধুনিকতার সকল বৈশিষ্ট্য উপাদান দিক এখানে লভ্য কিন্তু। এই জায়গায় আরেকটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য মনে হয়। সমালোচক অর্ণব সেন বলেছেন —

"আমাদের বাংলা কবিতায় যে আধুনিকতার জন্ম দেশজ, কিন্তু বিশ শতকে সেই আধুনিকতার উৎসভূমি অনেকাংশেই ইয়োরোপে তা অস্বীকার করা যায় না। ১৮৫৭ তে বোদলেয়র প্রকাশিত 'ল্য ফ্ল্যর-দ্যু-মাল' 'The Flowers of Evil' বা 'অশিব পুষ্প'-কে আধুনিকতার উৎস বলে একালে আধুনিকরা মেনে নিয়েছেন। তবে কবিতার স্রোতের গতি বিশ শতকে বড় দ্রুত ধাবমান! তাই পরাবাস্তবতার সঙ্গে জীবনানন্দের ঘনিষ্ঠতা যে আধুনিকতার জন্ম দেয় বাংলা কবিতায় তার ঢেউ ক্রমে বিবর্তিত হয় স্যুররিয়ালিজম থেকে হাংরি জেনারেশন, শ্রুতি আন্দোলন, ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন, প্রকল্পনা, নিওলিট মুভমেন্ট, থার্ড লিটারেচার, মালভি আন্দোলন, উত্তর-আধুনিক কাব্য আন্দোলন ইত্যাদি আরো অনেক বিবর্তনের পথে। আবার বৈদ্যুতিক মাধ্যমের প্রভাবে একালের গদ্যপদ্যের ভাষাও বদলে যাচ্ছে। আমাদের মেট্রো আর মেগাসিটির আন্তর্জাতিকতায় আর কদর্যতায় কবিতা বদলায়, নগরমুখী হয়ে পড়ে। এক অদ্ভুত আত্মকেন্দ্রিকতায় অস্তিবাদী বা আস্তিক্যবাদী হয়ে পড়ে। বার বার সেই পালাবদলের ছাপ পড়ে বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায়।"[৭]

বিলম্বে হলেও বরাক উপত্যকার (সাহিত্যে) কবিতায় তার আলো হাওয়া জল বর্ষিত হয়েছে।

বিশিষ্ট সমালোচক দীপ্তি ত্রিপাঠী আধুনিকতার লক্ষণকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন।[৮] এই ভাগ কিন্তু তিনি বিভিন্ন সমালোচক, কবি, তাত্ত্বিকদের চর্চা চাষ অনুশীলনের কথা মনে রেখেই করেছেন। এই তিনটি দিক হল —

কালের দিক থেকে আধুনিক কবিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী।

ভাবের দিক থেকে তা রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসী।

সৃষ্টির দিক থেকে তা নবতম সুরের সাধক, স্রষ্টা।

এই তিনটি প্রধান ভাগের মধ্যে, আধুনিকতা প্রকাশিত বলে আমরা ধরে নিলাম। এই ধরে নেওয়াটা কিন্তু আধুনিকতাকে নিয়ে সকল আলোচক সমালোচক তাত্ত্বিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সমর্থন করেই কিন্তু।

দীপ্তি ত্রিপাঠী 'ভাবের দিক থেকে আধুনিক' বাংলা কবিতার আরও কতটি সাধারণ লক্ষণের উল্লেখ করেছেন তার 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে —

১/ নগর-কেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত।

২/ রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নতুন সৃষ্টির পথ সন্ধান।

৩/ দেহজ কামনা, বাসনা ও এই পর্যায়ের আবেগ প্রবৃত্তি অনুভূতি অনুভবকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী

রূপকে প্রত্যক্ষ করা — প্রকাশ করা।

৪/ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে (প্রেম, সৌন্দর্য, ধর্ম, কুসংস্কার ইত্যাদি) সংশয় ও বিদ্বেষ প্রকাশ করা।

৫/ নগরকেন্দ্রিক জীবনের কুৎসিত রূপকে প্রকাশ করা সমস্ত জটিলতাসহ।

৬/ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পরম্পরা, সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান সচেতনভাবে কবিতায় প্রকাশ করা।

৭/ আত্মবিরোধ ও শেকড়হীনতার মনোভাব প্রকাশে যুগ যন্ত্রণা প্রকাশ করা।

৮/ উদ্ভট (Absurd) জীবনের রূপ প্রকাশ করা — গুরুত্ব সহকারে।

৯/ ফ্রয়েড, কার্ল মার্ক্স, ডারউইন ইত্যাদি বিজ্ঞানী চিন্তাবিদদের চিন্তা চেতনা কবিতায় প্রকাশ করা।

১০/ ভগবান এবং প্রথাগত সকল নীতিরীতি ধর্মে সন্দেহ প্রকাশ।

১১/ আইনস্টাইন, প্ল্যাঙ্ক প্রভৃতি পদার্থ বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারাকে কবিতায় গুরুত্ব দেওয়া।

১২/ শৈলী ও প্রকরণে নতুনত্বের নির্মাণ।

১৩/ পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়বস্তুকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহিত্যে প্রকাশ করা ।

উপরের এইসব লক্ষণের দ্বারা আধুনিক কবিতাকে বোঝা যায় বা যাবে। এই সব লক্ষণ কোনও কবিতায় থাকলে তাকে আধুনিক কবিতা বলা যাবে। কিন্তু আরেকটা কথাও মেনে নিতে হবে যে উপরের সব ক'টি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য কোনও একজন কবি বা একটা কবিতায় না-ও থাকতে পারে। এই সব লক্ষণ যে কবির কবিতায় যত বেশি সে কবি ও কবিতা তত বেশি আধুনিক।

মূল কথাটা হল আধুনিকতাটা একটা বিশেষ ধারণা। এই বিষয়টাকে বুঝতে হলে তার সকল বৈশিষ্ট্য ভাব লক্ষণগুলিকে বুঝে নেওয়া একান্ত দরকার। বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে কথাগুলি প্রযোজ্য। এবং সঙ্গে সঙ্গে কবিতার মর্মবস্তু, দায়বদ্ধতা, সামাজিক প্রকাশ, জীবনচেতনার প্রকাশ করা।

কিন্তু আরেকটা কথা কালের দিক থেকে আধুনিক কবিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর। এই ভাববস্তু একদিকে আমরা সমর্থন করে নিতে পারি। আগে বলেছি এর আগের কবিতাও সমসাময়িককালে আধুনিক, অতি আধুনিক ছিল। আজও অনেক কবিতার ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য। এখানে একটা কথা স্পষ্ট যে রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতায় যুগযন্ত্রণা, নাগরিক জীবনযন্ত্রণা, যান্ত্রিক জীবনের কুৎসিত রূপ, বিজ্ঞান চেতনা, যুক্তিপ্রবণতা ইত্যাদির প্রাধান্য খুব বেশি। এই দিক দিয়ে প্রথম যুদ্ধ পরবর্তী কবিতা অন্যরকম আধুনিক — আরও আধুনিক। তবে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত এই কথাটি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। কারণ জীবনানন্দ দাশ খুব ভালোভাবে দেখিয়েছেন রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতা রবীন্দ্রনাথকেই সশ্রদ্ধায় প্রণাম জানিয়ে বিশ্বের অন্যান্য কবিদের কাছে গেছিলেন নতুন পথের সন্ধানে — নতুনত্বের খুঁজে। তবে কী এরা রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হতে পেরেছিলেন পুরোপুরি? এইসব কবিরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার আগে তাকে নমস্কার জানিয়েছিলেন।

এই জায়গায় আধুনিকতা সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু স্মরণ করতে পারি তার ইতিহাস। ইউরোপে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল মূলত নবজাগরণ, শিল্পবিপ্লব, গৌরবময় বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকা-ফ্রান্স ইত্যাদির স্বাধীনতা লাভ থেকে। আঠারো শতকে ইউরোপে গদ্যে তুমুল একটা গতি আসে। এবং আঠারো-উনিশ শতকে বিজ্ঞানে বিভিন্ন দিকে বৈচিত্রপূর্ণ আধুনিকতা দেখা দেয়। এবং তার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পায় বিশ শতকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষের

বোধ ভাব আবেগ চিন্তাচেতনা অনেকটা পরিবর্তন হয়। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানুষের সমস্ত চিন্তাচেতনা আমূল পালটে গেল। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিতায় তার রূপ প্রকাশিত হয়েছে এবং বরাক উপত্যকায় ষাটের দশক থেকে তার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হতে শুরু করল।

এই ইতিহাসটাকে আরও একটু সুস্পষ্ট করে বোঝার জন্য সংক্ষেপে একটা বর্ণনামূলক আলোচনার দরকার। এই বর্ণনাকে চারটা ভাগে ভাগ করা যায় আলোচনার সুবিধার্থে। যেমন —

১/ বিজ্ঞানের অবদান ঃ— বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনবোধ, জীবনচেতনা, জীবন ধারণ, জীবন চর্চা চর্যা আরও প্রগতিশীল হয়ে ওঠল। প্রথমেই বলতে হয় কপারনিকাস, গ্যালিলিও ও নিউটনের কথা। কপারনিকাস Heliocentric Theory-র (১৫৪৩) সূচনা করে কিছু চর্চা করলেন। গ্যালিলিও বস্তুর ভর সম্পর্কে এরিস্টটলের সিদ্ধান্তকে ভুল বলে প্রমাণ করে নয়া তথ্যজ্ঞান দিলেন এবং সৌরজগৎ মহাকাশ সম্পর্কে কপারনিকাসের সূত্রকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন (১৬০৯)। নিউটন ১৬৮৭ সালে 'Principia Mathematica' প্রকাশ করলেন। এখানে বস্তুর গতিসূত্র সম্পর্কে ও পৃথিবীর বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করলেন। পৃথিবীর গতিপ্রকৃতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সৌরজগৎ সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্যচিন্তার ধ্যানধারণার আবিষ্কারের দ্বারা তাঁরা মানুষের চেতনাজগতে এক তুমুল পরিবর্তন আনলেন।[৯]

তারপর শুরু হল বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের বিদ্যুৎ সম্পর্কে চিন্তা, রণ্ট্জেন-এর 'এক্স-রে' (১৮৯৫)-এর আবিষ্কার, ম্যাক্স প্লাঙ্ক-এর কোয়ান্টাম তত্ত্বের চর্চা, মার্কনির রেডিও তরঙ্গ নিয়ে চর্চা, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, স্টিফেন্সনের রেল ইঞ্জিন, উইলবার রাইট ও অরবিল রাইটের এরোপ্লেন (১৯০৩) আবিষ্কার, সারণি আইজেনস্টাইন প্রভৃতির সিনেমা/ ফিল্ম জগতের অগ্রগতি, জন বেয়ার্ডের টেলিভিশন আবিষ্কার, কম্পিউটারের বিকাশ, লিউয়েনহুক ও লুই পাস্তুরের জীবাণু আবিষ্কার ওয়াটসন ও ক্রিকের DNA পর্যায়ক্রম প্রক্রিয়ার আবিষ্কার, নিকোলাস অটোর পেট্রোল ইঞ্জিন আবিষ্কার, টি.এ. এডিসনের ফটোগ্রাফ, ফনোগ্রাম, বৈদ্যুতিক বাল্ব ইত্যাদির আবিষ্কার উদ্ভব বিকাশ প্রয়োগ বিস্তার। তারপর সবচেয়ে বড় সার্থকতা চাঁদকে জয় করা (১৯৬৯)। মানবিক চিন্তা এক বিশাল বাঁকে পরিবর্তিত বিবর্তিত হয়ে নতুন জীবনচেতনার শুরু হল। এবং রোশো, মেকিয়াভেলী, হব্স্, হেগেল, কান্ট, স্টুয়ার্ট মিল, এডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ড, ম্যক্স-উইবার, হার্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি চিন্তাবিদদের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক চিন্তাচেতনার দ্বারা বিশ্বের মানুষ ব্যাপকভাবে উর্বরতা পেলেন চেতনাজগতে।

মানুষের চেতনাজগৎ উন্নততর হওয়ার গভীরে শেকড়ে এইসব সফলতা, সার্থকতা, জয় বিজয়, আবিষ্কার কত সুগভীর আলো জল সার যোগান দিয়েছে! তা বাক্যে প্রকাশ করা কঠিন। আর সাহিত্য তো সমাজের আয়না। তাতে তো তার প্রভাব অনস্বীকার্য। বলা ভালো সাহিত্যের রক্তে মাংসে হাড়ে মজ্জায় তার উর্বরতা বৃদ্ধি পেল — সমৃদ্ধিও।

২/ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের অবদান ঃ— জাঁক দেরিদার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'Of Grammatology' (১৯৭৭) গ্রন্থের ভূমিকায় গায়ত্রী স্পিভক চক্রবর্তী বলেছেন — "The text has no stable identity, stable origin ... each act of reading 'the text' is a preface to the next."[2] এই বয়ানের অনেক গভীর অর্থ মানে আছে। তবে আমরা উত্তরসূরীর রক্তমাংসহাড়ে পূর্বসূরীর প্রভাব দান অবদান অর্থেই গ্রহণ করছি এখানে।

এই বয়ানের মর্মবস্তুকে কখনো কেউ কোনোদিন কোথাও অস্বীকার করতে পারবে না। এখানে প্রথমেই স্মরণ করতে হবে বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ, গীলগমেশ, ইলিয়াদ, অডিসি, ইণিড, গ্রীক নাটক, ভারতীয় সংস্কৃত নাটক, বিওয়াল্ফ ইত্যাদির কথা। কোরাণ, বাইবেল অবশ্যই সাহিত্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এইসব থেকেই পৃথিবীর মানুষ প্রথম আলো, জল, জ্ঞান, চিন্তা, চেতনা পেয়েছিল। আজও যা অব্যাহত সেই সবের অনুষঙ্গ প্রসঙ্গ চর্চা চর্যা

অন্বেষণ গবেষণা পথহাঁটা।

তারপর পৃথিবীর গল্পরচনার কথায় আসে আরব্যরজনী, কথাসরিৎসাগর, দশকুমার চরিত, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি ও চসার, র‍্যাবলাই, বোকাচ্চো ইত্যাদির রচনা। ঐ সমসাময়িক একটা অতুলনীয় দার্শনিক কাব্য দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়া'-কে আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয়। ভারতবর্ষের সাহিত্যের জন্য জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের উল্লেখ করতে হয় দান্তের কাব্যের মতো মর্যাদা দিয়ে। তারপর প্রেত্রার্কার সনেটের কথা। এবং পরবর্তী ডানের কাব্য, আলেকজাণ্ডার পোপের কাব্য, স্পেনসারের কাব্য, ড্রাইডেনের কাব্য, শেক্সপিয়ারের নাটকগুলির কথা, মিলটনের মহাকাব্যের কথা, থমাস মুরের কাব্যের কথা তার সঙ্গে মারলো, ওয়েবষ্টার, জনসন, এদের নাটকের কথা এবং গ্যোয়েটে, শীলার, প্রমুখ স্রষ্টার সাহিত্যের কথা। ইবসেন, ওস্কার ওয়াইল্ড, বার্ণার্ড শো, সারিডান, ব্রেখ্ট, বেকেট, ব্রিয়ান ফ্রিল, হেরল্ড পিন্টার, স্টপার্ড, ওউল সায়িনকা এবং আমেরিকার নাট্যকার, এউজিন ও'নিল, আর্থার মিলার, টেনেসিস উইলিয়াম প্রভৃতির কথা।

কিন্তু উনিশ শতকে সাহিত্যের একটা বিশাল বাঁক পরিবর্তিত হয় রোমান্টিক কবিতা আন্দোলন দ্বারা। এর আগে একটা কথা বাংলা সাহিত্যের জন্য মধ্যযুগীয় কাব্য এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব কবিতার কথা বলতে হয়। রোমান্টিক ভিক্টোরিয়া যুগের কয়জন শ্রেষ্ঠ কবি ব্ল্যাক, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোলরিজ, বায়রণ, শেলী, কীট্স, টেনিসন, আর্নল্ড, হপ্কিনস্, ব্রাউনিং, আমেরিকার ওয়াল্টার হুইটম্যান, এডগার এলান পো, এমিলি ডিকিনশন ইত্যাদির কবিতা কাব্য পরবর্তী কাব্যকবিতাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। এখানে বাংলার দিকে ফিরে দেখলে পাই মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল ইত্যাদি আধুনিকতার উন্মেষ পর্বের কবিদেরকে —নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে।

কিন্তু বিশ শতকে এসে কবিতা কাব্য একেবারে আধুনিকতার সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষণকে সুসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করল নবতর বাঁকে। ইয়েটস, এলিয়ট, পাউন্ড, হিউম, অডেন, রবার্ট ফ্রস্ট ইত্যাদি কবিরা কবিতাকে নিয়ে গেলেন সার্থকতার চূড়ান্ত শিখরে। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি কবিরা প্রথমদিকে এক বাঁকে কবিতা কাব্য রচনা করলেন — যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যুগোত্তীর্ণ কবি। এই 'এক বাঁকে' বলছি কারণ পরবর্তী কবিরা রবীন্দ্রনাথের মেজাজ ভাব ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আরও এগিয়ে গেলেন নতুন অগ্রসর সূর্যালোকের খুঁজে।

এই জায়গায় পাশ্চাত্য কবি বোদলেয়ার, ব্যাঁবো, মালার্মে, পল ভারলেন, রসার, রিলকে, নেরুদা, হাইনে, লোরকা, কামিংস, সুইনবার্ণ প্রভৃতির চিন্তাচেতনা গভীরভাবে রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিল — আলো জল সহকারে। এই বয়ানের প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি কবির কথা। তাদের লেখা পড়লেই তা চোখে ভেসে ওঠে। আর এ উপত্যকার রণজিৎ দাশ, তপোধীর ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, উদয়ন ঘোষ, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিমল চৌধুরী প্রভৃতির কবিতা পড়লেও একই পূর্বসূরীর গন্ধ পাওয়া যায় — হোক না বিলম্বে বা মাত্রায় কম। এখানে আরও ক'জন কবির নাম উল্লেখ করতে হবে— এলেন গিন্সবার্গ, ফিলিপ লারকিন, এ. কে. রামানুজন, টম গান, দেরেক ওয়ালকট, টেড হগ্স, সিমাস হেনি, প্রভৃতি কবির কবিতাও বিশ শতকের শেষের দিকের কবিকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে — নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা।

আরেকটা কথা বলা দরকার সেটা হল গদ্যের কথা। এই যে বারবার কবিতার কথা বলছি তা শুধু কবিতার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস অতীতকে দেখানোর জন্য। আমাদের পথহাঁটা কবিতা নিয়ে সেজন্যই। কিন্তু একটা বিষয় উল্লেখ করা উচিত যে, ইউরোপে কবিতার চেয়ে গদ্য অনেক এগিয়ে ছিল — প্রাচুর্যতায়ও। এখানে কয়জনের নাম উল্লেখ

করতে পারি থমাস মেলোরি, কার্ভেন্টোস, ফিলিপ সিডনি, ডানিয়েল ডিফো, জনাথন সুইফ্‌ট, স্যামুয়েল রিচার্ডসন, হেনরি ফিল্ডিং, স্যামুয়েল জনসন, প্রভৃতি। এবং রোমান্টিক, ভিক্টোরিয়া ও পরবর্তী যুগের যেমন—জেন অস্টিন, ওয়াল্টার স্কট, মেরী শেলী, ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট, শার্লট ব্রন্টে, এমিলি ব্রন্টে, ওস্কার ওয়াইল্ড, কার্লাইল, থমাস হার্ডি, ম্যাথু অর্নল্ড, ডি এইচ লরেন্স, জুজেফ কনরেড, রোডইয়ার্ড কিপলিং, ই. এম. ফরস্টার, জন গোল্‌সওর্থি, আলডাস হাক্‌স্‌লি, টমাস মান, রোমা রোঁলা, কেথারিন মেনস্‌ফিল্ড, জর্জ ওরয়েল, সলমন রুশদি, চিনা এচিবি, জে. এম. কটজি, ভি. এস. নইপাল, অরুন্ধতি রায়, ডরিস লেসিং, নাডিন গার্ডিনার, ফর্ড ম্যাডক্স ফর্ড, উইলিয়াম গল্ডিং, আমেরিকার রাল্‌ফ ওয়ালডো ইমারসন, হেনরি জেমস্‌, উইলিয়াম ফক্‌নার, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, সেলি বিলেড, টনি মরিশন, জন স্টিনবেক, জেমস বেল্ডউইন, মার্ক ট্যুইন প্রভৃতি কথাসাহিত্যিক। রাশিয়ার লিও টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি, আলেকজাণ্ডার পুশকিন, এনটন চেকভ প্রভৃতির রচনা, ফ্রান্সের ভিক্টোর হুগো, বালজাক, ভল্টেয়ার, স্তাদাল,প্রুস্ত, এমিল জোলা, মোপাসা, ফ্লবের ইত্যাদি। আর বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় জেমস্‌ জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এবং ডরোথি রিচার্ডসনকে। এ ছাড়াও অসংখ্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব আছেন নিজস্ব প্রতিভায় — স্বাতন্ত্র্যে।

বাংলার দিকে দেখলে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক চড়াই উৎরাই আছে। কিন্তু কবিতার আলোচনার ক্ষেত্রে অনেক অভাব ছিল। এই অভাব রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরা বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিরা দূর করলেন। পরবর্তীকালে আরও অনেকে এই চেষ্টা চালিয়েছেন — সফলও হয়েছেন। কিন্তু বরাক উপত্যকায় গদ্য সাহিত্য অনেক পিছিয়ে ছিল কবিতার তুলনায়। আজকাল অনেকে এই জিনিসটাকে এগিয়ে এনেছেন। কয়জনের নাম বলতে পারি — রণবীর পুরকায়স্থ, শেখর দাস, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, বদরুজ্জামান চৌধুরী প্রভৃতি। কবিতার চর্চা পর্যালোচনাও ক্রমে এগিয়ে আসছে। এ অঞ্চলের কবিতা কবিতাচর্চা, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে, বাংলাদেশে, ত্রিপুরায় পাঠ চর্চা পরিচিতি সমালোচনা হচ্ছে খুব দ্রুতগতিতে — গবেষণাও।

৩/ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিভিন্ন মতবাদের অবদান ঃ— তিনটা মতবাদ পৃথিবীর মানুষের চিন্তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল। আজও করে যাচ্ছে। মানুষের চেতনার জগতকে কাঁপিয়েছিল এবং চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল। এই সম্পর্কে একটু পরিষ্কার কথা বলা যাক। যেমন—

ক। মার্ক্সীয় চিন্তাচেতনা পৃথিবীর মানুষকে অর্থনৈতিক সমতা অর্থনৈতিক চিন্তাচেতনায় তুমুলভাবে প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীর মানুষেরা খুব ভালো করে বুঝতে পারল উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মাঝখানে এক বিপুল আকারে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর /জীবনের বাস। যে জীবন সবদিক দিয়ে চাপের, চিন্তার, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের, অন্তদ্বর্ন্দ্বের, ঐ দুই বিত্তের মাঝামাঝি জীবনবোধের জীবন চর্চার জীবনধারণের টানাপোড়েনে তাদের জীবনবিত্ত। মধ্যবিত্তের তফাত-পার্থক্য-তুলনা খুব ভালো বুঝে নিলেন পৃথিবীর মানুষেরা। 'দাস কেপিটেল' (১৮৬৭), 'দ্যা কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' (১৮৪৭) গ্রন্থে খুব ভালো করে অর্থনৈতিক সমতা, ক্ষমতা, তফাত ইত্যাদি তুলে ধরে বিশ্বের মানুষের চিন্তাচেতনার আমূল পরিবর্তন করলেন মার্ক্স, এঙ্গেলস প্রভৃতি সামাজ চিন্তানায়কেরা। মার্ক্স, এঙ্গেলস প্রভৃতি চিন্তানায়কের চেতনায় রাশিয়ায় বিপ্লব দেখা দিল (১৯১৭)। এই বিপ্লব রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত ইত্যাদি দিক দিয়ে বিশেষ পরিবর্তন সাধন করল। পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যান্য দেশে তার অনুশীলন শুরু হল। এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ব্যক্তি ও সমষ্টির এক নয়া মাত্রা যোগ হল চিন্তায় চেতনায়। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন শুরু হল চারদিকে। বাংলার কবি সাহিত্যিকরাও এখান থেকে সমিধ সংগ্রহ করলেন। সমাজের সকল পদক্ষেপে নিপীড়িত মানুষের কথা আসতে শুরু হল। প্রান্তিকায়িত মানুষেরা ক্রমে কেন্দ্রের দিকে আসতে লাগল। এটা একটা বিশাল আদর্শ ও প্রত্যয়ের বিবর্তন। সাহিত্যে তার প্রভাব সবচেয়ে সংবেদনশীলভাবে পড়ল। এবং সাহিত্যে শিল্পে এই চিন্তাচেতনার ভাববস্তু উৎপাদিত হতে লাগল— বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে কৌণিকতায়।

খ। ডারউইনের জীবের বিবর্তনবাদ মানুষকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে। জীবজগতের পরিবর্তন বিবর্তন, বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি, বেঁচে থাকার সংগ্রাম, বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেন 'On the Origin of Species' (১৮৫৯) গ্রন্থে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চারদিকে এই চিন্তাচেতনায় বিপ্লবের মতো মানুষের মানসিকতায় আলোর ঝলক লাগল। পুরাতন সমস্ত ধ্যানধারণা অযৌক্তিক বিশ্বাসকে তোলপাড় করে দিল 'The Descent of Man' (১৮৭১)। মানুষ চিন্তা করতে বাধ্য হল। এই যে চিন্তার পরিবর্তন। সাহিত্যে তার প্রভাব সুগভীরভাবে পড়ল। এবং তার বিভিন্ন অনুষঙ্গ প্রসঙ্গ উপাদান বৈশিষ্ট্য বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়ে সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হতে শুরু করল। এটা শুধু ডারউইনের চিন্তা নয় আরও অনেকের এই রকম চিন্তা (লেমার্ক, মেণ্ডেল প্রভৃতি) চেতনায় তা আরও সমৃদ্ধ হল। ডারউইন দিয়েছিলেন 'Survival for the Fittest' এর মন্ত্র। এই মতবাদ, বিচিত্র চিন্তাচেতনার জন্ম দিল। এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতার চিন্তা প্রসারিত হতে লাগল। মানুষ নিজের চরিত্র আদর্শ ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা এক বিশেষ রূপ পেল মানুষের চেতনায় Laissez-faire-এর সূত্রে।

গ/ সিগমাণ্ড ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাচেতনা পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতিকে নিজের পরিচয় দিয়েছিল নতুন করে। মানুষের ভেতরে কুৎসিততম জটিলতম রূপকে তিনি সুগভীরভাবে বার করে দেখালেন বিভিন্ন রকম পরীক্ষা দ্বারা। মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কথা চিন্তা ইত্যাদিকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন যে মানুষের মনের গভীরে এক গভীর অবচেতনার রাজ্য লুকিয়ে আছে। আসলে মানুষের মন তিনটি ভাগে বিভক্ত ঃ সচেতন, অবচেতন ও অবদমন — conscious, unconscious এবং sub-conscious। মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশে আরও তিনটি স্তর আবিষ্কার করলেন Id, Ego এবং Super Ego. ('The Ego and the Id'–১৯২৩)[3]— ব্যক্তির চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে।

ফ্রয়েড দেখালেন মানুষের সকল অভিজ্ঞতা অবচেতন স্তরে লুকিয়ে থাকে এবং কষ্টদায়ক, বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জিত দোষগুণ অবদমন স্তরে লুকিয়ে থাকে। এবং সামাজিকভাবে চলার সকল ইচ্ছা চাহিদা অভিজ্ঞতা সচেতন স্তরে থাকে। মানুষ এই সচেতন স্তরের সকল অনুভব উপলব্ধি অনুভূতি প্রকাশ করে চলে সংসারে। অবদমন মানুষের দোষ নেতিবাচক দিককে ঢেকে রাখে লুকিয়ে। এই তিন ধরনের স্তরের মন নিয়ে মানুষ। তার মধ্যে সকল প্রক্রিয়া ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জটিলতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য উপাদান মানুষের চারিত্রিক বিষয়।

বিভিন্ন সাংকেতিক ভাষা, মিথ্ ইত্যাদি দিয়ে মানুষের ভেতরের অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা শারীরিক চাহিদা এই সবকে আবিষ্কার করে তিনি দেখালেন— তার সমস্ত কুৎসিত জটিল রূপসহ। সফোক্লিস এর শ্রেষ্ঠ নাটক 'ইডিপাস টাইরেনাস'-এর বিষয়বস্তুকে নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করে একটা নয়া জিনিস আবিষ্কার করলেন 'Oedipus complex' (১৯০৫)। পিতাপুত্রের চারিত্রিক দ্বন্দ্ব, মাতা সন্তানের যৌনতা, পিতার প্রতি মেয়ের আকর্ষণ, মাতার প্রতি ছেলের আকর্ষণ, উল্টোটাও ইত্যাদি বিভিন্ন সম্পর্কের গভীরে গিয়ে তাদের প্রাকৃতিক বলো আর অন্য কিছু-ই বলো এইসব কুৎসিত বিশ্রী জটিল রূপ প্রকাশ করলেন 'Three Essays on the Theory of Sexualily' (১৯০৫)। এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যার দ্বারা দেখালেন আমরা তাই স্বপ্ন দেখি যা দৈনন্দিন জীবনযাপনের অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে পাই। যা আমাদের অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকে 'Interpretation of Dreams' (১৯০০)। মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র চারিত্রিক শারীরিক চাহিদার উৎস হল লিবিডো। এই লিবিডোর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করে যৌনতা সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন। পৃথিবীর মানুষকে দেখালেন এই হল মানুষের আসল রূপ ছবি ইত্যাদি। এবং বিভিন্ন কামনা বাসনা যৌনাকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশ পায়। যা সচেতন মনে প্রকাশিত হয় না। এইভাবে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড, ইয়ুং, অ্যাডলার, লাঁকা প্রভৃতিরা মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে পৃথিবীর মানুষের সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চিন্তাচেতনাকে তোলপাড় করে আলোড়ন দিলেন। পূর্ববর্তী সকল ধ্যানধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সাহিত্যে তার

ব্যাপক আলোড়িত প্রভাব পড়ল। আধুনিক কবি সাহিত্যিকরা মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র জিনিস 'লিবিডো'চিন্তাকে বিভিন্নভাবে নিজের মতো গ্রহণ করে প্রকাশ করতে লাগলেন নিজস্বতায় স্বাতন্ত্র্যে। এইভাবে এই সময় থেকে মানুষ বিভিন্নদিকে বিভিন্নভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ উন্নতি প্রগতি সাধন করল। এবং এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতায়, ব্যক্তিত্ব সচেতনতায় মানুষ উন্নততর হয়ে উঠল জীবন জগৎ সম্পর্কে, জীবনচর্চায় চর্যায় শৈলীতে চাষে চিন্তাচেতনায়।

৪/ পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যতত্ত্ব ও মতবাদের অবদান ঃ— প্রথমেই রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনের কথা বলতে হয়। কারণ এই তত্ত্ব পৃথিবীকে একবার গভীরভাবে ভাবিয়েছিল। ১৭৯৮ সালে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কোলরিজের যৌথ উদ্যোগে 'লিরিক্যাল বালাড' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই তত্ত্বটি স্বীকৃতি পেয়ে যায়। যদিও এর আগে রবার্ট বার্ণস্, ব্লেক, কপার প্রভৃতিরা তার সলতে পাকানোর কাজ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে দ্রুত তার ব্যাপকতা, বিশালত্ব ছড়িয়ে পড়ল। বায়রণ, শেলী, কীট্স প্রভৃতি এবং শেষ রোমান্টিক ইয়েট্স পর্যন্ত একটা বড় বাঁক। বাংলার কবিরা তার থেকে সুগভীরভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। আজও এইসব কবিতার নির্যাস, মর্মবস্তু, গাম্ভীর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য ইত্যাদিকে গভীরভাবে অনুধাবন উপলব্ধি করেন। এই বিত্ত থেকে বরাক উপত্যকার কবিরাও কোনও দিক দিয়ে আলাদা নয় কিন্তু।

আর আগে দেখিয়েছি বাংলা সাহিত্যে ফরাসী সাহিত্য ও সাহিত্য তত্ত্বের দান অবদান অনস্বীকার্য। বোদলেয়ারের নির্বেদ মালার্মের শূন্যবাদী নান্দনিক চিন্তাচেতনা যে প্রতীকী চিন্তা বা আন্দোলনের জন্ম দিল তা বিশ্বের সাহিত্যে বিশেষভাবে নাড়া দিল। শেষ পর্যন্ত Imagist আন্দোলনে উত্তীর্ণ হয়ে সার্থকতা অর্জন করল। অস্তিত্ববাদীরা সাহিত্যে আলাদা একটা মাত্রা যোগ করেছিলেন অস্তিত্ব চেতনায়। কির্কেগার্দ, নিৎশে, হাইডেগার, কাফ্কা, কামু, সার্ত্র প্রভৃতি চিন্তাবিদ সাহিত্যে এক পালাবদল করেছিলেন অস্তিত্ব চিন্তায়। এই দিক দিয়ে রেনে দেকার্তের কথাও স্মরণীয়।

বালজাক প্রভৃতির রিয়েলিজম, ফ্লবেয়র ও জোলা প্রভৃতির প্রকৃতিবাদ, ডাডাইজম, পরাবাস্তববাদ প্রভৃতি বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব বিকাশ বিস্তার পৃথিবীর সাহিত্যকে আরও সুগভীরভাবে সমৃদ্ধ করল। এই সমৃদ্ধি সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় হয়েছে। আর বাংলা সাহিত্যে কল্লোল গোষ্ঠীর থেকে তার প্রয়োগ অনুশীলন বিকাশ প্রসার ব্যাপকভাবে হতে শুরু করল। আর বরাক উপত্যকাও তার থেকে উর্বরতা পেয়েছে অনেক — বিলম্বে হলেও।

আমিও বিশ্বাস করি 'A picture is a poem without words.' সাহিত্যের সবচেয়ে কাছের/প্রতিবেশী শিল্প হল চিত্রশিল্প। সাহিত্যের সঙ্গে তাই তার অনেকটা সম্পর্ক, সম্বন্ধ আছে — সখ্যতাও। সাহিত্যে তার প্রভাবও অস্বীকার করার নয়। আজও মানুষ পিরামিড, তাজমহল, চিনের ওয়াল ইত্যাদির অনুষঙ্গ প্রসঙ্গ টেনে কবিতা লেখে। এটা কেবল লেখা বলেই লেখা নয়। গভীরভাবে বুকে আর মগজে কাজ করে এইসব বোধভাব— তাই কবিতায় রূপ পায় তা।

প্রাগৈতিহাসিক/ঐতিহাসিক গ্রীস, মেসপটেমিয়া, মিশরীয় সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা প্রভৃতির সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'Art and Architecture' সাহিত্যের পাশাপাশি চলে এসেছে — আজকের আমল পর্যন্তও সমানে চলছে । মানুষ যখন লিখতে শুরু করল তখন থেকেই চিত্রশিল্প আলাদা একটা মর্যাদা পেয়ে গেল। চিত্রশিল্পের ইতিহাসে (মধ্যযুগে) নবজাগরণের সময়ে একটা যুগ পরিবর্তন করে যুগান্তর এনে দেয় লিওনার্দ দ্যা ভিঞ্চির 'Mona Lisa' (1503-05), 'The Last Supper' (1495-98), মাইকেলেঞ্জেলোর 'Pieta' (1498-1500), 'David' (1501-04), রাফেলের 'Madona of the Medow' (1505), গিওর্গিওনের 'Tempesta' (1505-10), টাইটানের 'Assumption of the Virgin' (1516-18) প্রভৃতি শিল্পী এবং শিল্প। চিত্রশিল্পে উচ্চ উন্নত নবজাগরণ এসে গেল। এবং পৃথিবীর চিত্রশিল্পে এই জাগরণ বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করল সাহিত্যেও তার ছাপ পড়ল কোথাও প্রত্যক্ষভাবে কোথাও পরোক্ষভাবে।

তারপর রোমান্টিক, ভিক্টোরিয়া যুগ হয়ে আধুনিক যুগ এসে গেল। এর মধ্যে চিত্রশিল্প নিয়ে অনেক চর্চা চাষ হয়ে গেছে পৃথিবীর ঘাটে মাঠে। বিশ শতকের প্রথমদিকে পাবলো পিকাসোর 'Les Demoiselles D' Avignon'

(1907) ; জর্জ ব্র্যাকোর 'Violin and Pitcher' (1909-10) ; ফ্রেঙ্ক লিওড রাইটের 'Robie House' (1909) প্রভৃতি শিল্প ও শিল্পী পৃথিবীর চিত্রশিল্পকে আরেকবার কাঁপিয়ে তুলল— অন্তর্জগতে বহির্জগতে ভাবজগতে। একটা গভীর Turning Point এসে গেল এখান থেকে— প্রকরণ, শৈলী, বিষয়, ভাব, মেজাজ ইত্যাদি দিক দিয়ে তুমুল নতুনত্ব নিয়ে উপস্থিত হল পৃথিবীর দরবারে। সাহিত্যে তার প্রভাব হুবহুভাবে পড়ল। এখানে বলতে হয় বিশ্বের আধুনিক সাহিত্য এই Turning Point থেকে অনেক উর্বরতা লাভ করে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলল। তারপর চিত্রশিল্প নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চাষ, গবেষণা, আন্দোলনঃ— Mannerism, Neo-classicism, Impressionism, Post-Impressionism, Fauivism, Expressionism, Cubism, Futurism, Dadaism, Surrealism, Abstract Expressionism, Minimalism এবং Conceptualism ইত্যাদি নিয়ে বিশ্বায়নের সমুদ্রে এসে মোহনায় মিশল।[4]

এই আন্দোলন চিন্তা চেতনা প্রকাশ প্রকরণ শৈলী থেকে পৃথিবীর সাহিত্য নিজেকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যও তার থেকে দূরে নয় — এমন কী বরাক উপত্যকাও নয়। তাই তো বরাক উপত্যকার ভাষা শহিদ কমলার মূর্তি দেখে কোনও কবির মনে হয় —

‘কমলা, তুমি মরে যাও নি আজও
তোমার মুখের হাসিতে
আমার মা-কে খুঁজে পাই
তোমার চোখে আমাকে।’[১০]

(কমলার হাসি)

কিন্তু নারীচেতনাবাদের কথা আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে বলতে হয়। মেরী ওউলস্টন ক্রাধ -এর ‘The Vindication of the Rights of Women’ (১৭৯৫) দিয়ে নারীচেতনাবাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। তারপর ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ‘A Room of One's Own’ (১৯২৯), সিমোন দ্য বোভোয়ার ‘The Second Sex’ (১৯৪৯), এলেন শোয়ালটের ‘A Literature of their own’ (১৯৭৭), ডেল স্পেন্ডালের ‘Man Made Language’ (১৯৮০), কেট মিলেট ‘Sexual Politics’ (১৯৬৯), হেলেন সিক্সাস ‘The Laugh of the Medusa’ (১৯৭৬), তোরিল মোই ‘The Sexual/Texual Politics’ (১৯৮৫), জুলিয়া ক্রিস্টেভার ‘The Revolution in Poetic Language’ (১৯৭৪), লুইস ইরিগেরে ‘Spectrum of the Other Woman’ (১৯৭৪) প্রভৃতি নারীমুক্তিবাদীরা বিভিন্নভাবে নিজস্ব প্রতিভা চিন্তাচেতনা অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে নারীর মুক্তিচেতনার কথা বলেছেন। কেউ মার্ক্সীয়, কেউ মনস্তাত্ত্বিক, কেউ সামাজিক, কেউ অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন পথে আলোচনা বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করে নারীর অবস্থা অবস্থানকে তুলে ধরেছেন পুরুষতান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক মায়াজালকে ভেঙে মুক্তি পাবার জন্য।[5]

বাংলায় স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, বেগম রোকেয়া পরবর্তীকালে আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, আরও পরবর্তী তসলিমা নাসরিন, মল্লিকা সেনগুপ্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিরা বাংলার নারীকে ঐ মায়াজাল থেকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করেছেন। এবং বর্তমান প্রজন্মে নারীমুক্তিবাদীরা এই পথে কাজ করে যাচ্ছেন। বরাক উপত্যকাও তার ব্যতিক্রম নয় কোনও ক্ষেত্রে। কারণ আজকের বরাক উপত্যকাও প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের একটা সচেতন ভূখণ্ড—সাহিত্যের মাঠ।

ভারতবর্ষের নারীচেতনার কথা বলতে গিয়ে গৌরবসহ বলতে হয় এখানে পুরুষেরাই আগে এগিয়ে এসেছিলেন। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির কথা মনে করতে পারি। আজও বৌদ্ধিক পুরুষের সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা আছে এই চিন্তাজগতে।

বিশ্বের সাহিত্যে উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বচিন্তা। মানুষের মনন থেকে উপনিবেশ নির্মূল করাই তার কাজ। থমাস বেবিংটন মেকলে 'History of England' (১৮৪৯-১৮৫৫) গ্রন্থে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ইংরেজেরা কী চেয়েছিলেন বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে ভারতীয়রা রক্তে বর্ণে হোক ভারতীয়— কিন্তু তাদের মনন হোক ইংলিশ। এটাই হল আসল উপনিবেশ। আর দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য 'মননে স্বরাজ' প্রবন্ধে বলেছেন 'আমাদের অন্তরাত্মায় দাসত্ব প্রবেশ করেছে।' এই উপনিবেশ বা দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রয়াসই হল উপনিবেশোত্তর চেতনা।

বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, সমাজে আধুনিকতা এল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অঞ্চল স্বাধীন হল। মানুষ বুঝতে পারল আমরা শাসিত ও শোষিত হচ্ছি। এই মায়াজালকে ভেঙে মুক্তি খুঁজছে। প্রথমদিকের চিন্তা চেতনা থেকে এখন আরও অন্যরকম গভীরভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে। কারণ সমাজে, সংস্কৃতিতে, ফিল্মে, বিজ্ঞাপনে উপনিবেশ রক্তের কণায় কণায় মিশে গেছে। টেরি ঈগলটন, ফ্রেডরিক জেমসন, এডওয়ার্ড সাইড 'Nationalism, Colonialism and Literature' ১৯৯০, ফ্রানৎস ফ্যাননের বহুচর্চিত পাঠকৃতি 'The Wretched of the Earth' (১৯৬১), আরও অন্যান্যরা এই চিন্তাচেতনাকে মানুষের দরবারে পৌঁছে দিলেন। এখানে লেটিন আমেরিকার গারসিয়া মারকেজ প্রভৃতির আগে আরও তিনজনের নাম নিতে হয় রোডইয়ার্ড কিপলিং, জোসেফ কনরেড ও ই. এম. ফরস্টার। এদের সাহিত্যে এই চিন্তা অনেক আগেই জন্ম নিয়েছিল সুগভীরভাবে।[6]

তার সঙ্গে আমাদের বাংলার আঞ্চলিক বিভিন্ন উপন্যাসের কথা মনে করতে পারি। আর কবিতায় এই চিন্তা তো চর্যাপদ থেকে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন হয়ে আছে। নজরুল ইসলামের কাব্যকবিতা তো তার উজ্জ্বল উদাহরণ। আধুনিক কবিতায়ও তার উদাহরণ অসংখ্য। বরাক উপত্যকার কবিতায় উপনিবেশোত্তর চিন্তাচেতনা নিবিড়ভাবে আছে রামেন্দ্র দেশমুখ্য, অনুরূপা বিশ্বাস, তপোধীর ভট্টাচার্য, আবুল হোসেন মজুমদার, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেকের কথা মনে পড়ে।

ভাষা সাহিত্য শব্দ ও বস্তু বিচারের ক্ষেত্রে আরও বেশি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে চর্চা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেন ফার্দিনান দ্যা সসোর, তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত 'The Course in General Linguistics' (১৯১৫) গ্রন্থে। এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁর চিন্তাধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন অগ্রগতির পথে। 'Langue', 'Parole', 'Sign', 'Signifier', 'Signified' প্রভৃতির ধারণা সাহিত্যতত্ত্বের দিগন্ত খুলে দিল। মিখায়েল বাখতিন, লেভিস্ট্রাউস, আলথুজের, ঈগলটন, পল দ্যা মেন, কুলের, রোলা বার্ত, জাঁক দেরিদা, মিশেল ফুঁকো, ফ্রান্‌ৎস ফ্যানন্ প্রভৃতি চিন্তানায়কেরা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তাচেতনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন। বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব অপরিসীম। বরাক উপত্যকার সাহিত্যও তার থেকে ব্যতিক্রম নয় কিন্তু আজ আর।

বাংলা সাহিত্যও উত্তরাধুনিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে বেশি। সে জন্য উত্তরাধুনিক তত্ত্ব চিন্তা সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। 'The Postmodern Condition' (১৯৭৯) গ্রন্থে জাঁ ফ্রাসোঁয়া লিওতার উত্তর আধুনিকতার লক্ষণ বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এবং এই পথের আরও অন্যান্য বদ্রিলার 'Simulations' (১৯৮২), হাবারমাস 'The Structural Transformation of the Public Sphere' (১৯৮৮), জুলিয়া ক্রিস্টেভা 'Strangers to Ourselves' (১৯৯১), লিন্ডা হাচিয়ণ 'A Poetics of Postmodernism : History, Theory, Fiction' (১৯৮৮), আইহাব হাসান 'POSTmodernISM : A Paracritical Bibliograph' (১৯৭১), ফ্রেডরিক জেমসন 'Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitatism' (১৯৮৪) প্রভৃতিরা আধুনিকতাকে 'Aged' বুঝে সরে এলেন। এই উত্তরাধুনিকতার শেকড়ে, মাঠে আরও দুটা জিনিস খুব গভীরভাবে কাজ করেছে — কম্পিউটার এবং ফিল্মজগতের বিকাশ, বিস্তার, প্রয়োগ,

ব্যবহার ইত্যাদি। এবং আধুনিকতার সকল অবক্ষয়ী নেতিবাচক দিককে তুলে ধরে উত্তরাধুনিক তত্ত্বকে উন্নত করতে লাগলেন। এই বয়ানের সমর্থন পাওয়া যায় Nail Lucy-র 'Postmodern Literary Theory' (১৯৯৭ সাল) গ্রন্থে। এই গ্রন্থের মধ্যে একটা সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায় উত্তরাধুনিক তত্ত্ব সম্পর্কে। এই গ্রন্থের ভূমিকা থেকে দুটি উদ্ধৃতি সামনে রাখতে পারি —

> *"In a Postmodern world, literature is just another text. You can forget all that stuff truth and value – and other alienating lies perpetuated by a deliberately selective version of history controlled by crazy power freaks and their lackey dupes. 'Truth' is only what circulates as such; hence the importance of technology and the media to an understanding of 'our' world today. 'Values' are only effects of cultural traditions; hence the importance of becoming cynical today, in order not to be suppressed under the suffocating weight of 'culture' and 'tradition'."*[7]

এবং দ্বিতীয়টি —

> *"The idea that everything is text, which denies any special value to literary texts, is taken usually for a central tenet of postmodernism. One should probably add immediately, of course, whether enthusiastically or sardonically, that the very notion of a 'central tenet' is precisely the kind of thing that the postmodern idea of text rejects! In a postmodern world, nothing is central and anything is a paradox."*[8]

এবং তৃতীয় একটি মন্তব্য তুলে ধরতে পারি Ronald Carter and John McRae-এর 'The Routledge History of Literature in English, Britain and Ireland' গ্রন্থ থেকে —

> *"Post-Modernism almost defics definition. Rather, it celebrates diversity, eclectism, and parody in all forms of art, from architecture to cinema, from music to literature. All the forms which represent experience are mediated, transformed, and the 'truth' of experience thus becomes even more varied than it has ever been before."*[9]

এই তিনটি বয়ানের মধ্য দিয়ে উত্তরাধুনিকতাবাদের একটা সাহিত্যিক ধারণা পাচ্ছি।

কিন্তু বাংলায় উত্তরাধুনিক আধুনিকতার অন্যরকম উত্তরণ। পূর্বে বলেছি ভারতবর্ষের আধুনিকতা অন্যরকম ছিল। এবং বাংলার আধুনিকতা অন্যরকম তো হবেই। ঠিক সে রকম বাংলার উত্তর আধুনিকতাও অন্যরকম। তবে এখানে একটা কথা দুঃখের সঙ্গে উচ্চারণ করতে হচ্ছে আমরা বাঙালি জীবনে আধুনিকতাও ভালো করে আসেনি। এসেছে বিকৃত আধুনিকতা, নেতিবাচক আধুনিকতা, অবক্ষয়ী আধুনিকতা, নাগরিক বিলাসীতা, বিচ্ছিন্নতা-বিপন্নতা (এখানে মনে করতে পারি বাবু বৃত্তান্তের কথা) যার ফলে আমাদের জীবনে কোনও উত্তরণ নেই। আর ঠিক সে-রকমই উত্তরাধুনিকতাও বিকৃত, বিপন্ন, বিশৃঙ্খল, অবক্ষয়ী, বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যার মূলমন্ত্র 'আমি ভোগ করি তাই আমি বেঁচে আছি'। তাই কোথাও ছায়া নেই, কেবলি দহন, পীড়া, জ্বালা...। তবুও মহানাগরিক, নাগরিক, বিশ্বায়নের অনুষঙ্গে

প্রসঙ্গে লালিত জীবনের স্পর্শে আমরা আজকাল ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শেকড়প্রিয় কয়েকজন উত্তরাধুনিক কবিকে পেয়েছি। আধুনিক কবিরা যেরকমই হোন না কেন — আজকের কবিরা তাদেরই উত্তরসূরী। এখানে অনেকটা উত্তরাধুনিক কবিতা পাচ্ছি তাদের কাছে। এদের মধ্যে বরাক উপত্যকার উল্লেখযোগ্য কবি রণজিৎ দাশ, তপোধীর ভট্টাচার্য, শান্তনু ঘোষ, দেবাশিস তরফদার, শঙ্করজ্যোতি দেব, অমিতাভ দেব চৌধুরী প্রভৃতি। এদের কবিতা পাঠে চর্চায় উত্তরাধুনিক যে লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তার বয়ান তুলে ধরছি সমালোচক কবি সমীর চট্টোপাধ্যায়ের বয়ানে —

> *"বাংলা কবিতা বা শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমে যে উত্তর আধুনিকতা এসেছে, তা ইউরোপের পোস্টমডার্ণ থেকে অনেকটা আলাদা। বাংলার উত্তর আধুনিক চেতনায় বিশ্বাসী প্রবক্তাগণ পাশ্চাত্যের অনুকরণের দিকে না গিয়ে নিজের দেশ, মাটি, লোককথা, পুরাণ ও ঐতিহ্যের শেকড়ের দিকে বাংলা কবিতার মুখ ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন। উগ্র আধুনিকতাকে তাঁরা 'অবক্ষয়' রূপেই দেখলেন।"*[১১]

সমালোচকের এই বয়ানের গভীরে বিভ্রান্ত পথিকের মতো এক মিথ্যে পথে হাঁটার বেদনা কাজ করছে — পথ হারানোরও। আধুনিকতার পর্বে আমরা বাংলা সাহিত্য, সমাজ জীবন ইত্যাদিতে একেবারে পাশ্চাত্য আধুনিকতায় নির্ভরশীল হয়ে গেছিলাম নিজের মাটি, শেকড়, জল, আলো, আকাশকে ভুলে গিয়ে। কিন্তু পরে বুঝেছি আসলে আমরা কতটুকু 'ঔপনিবেশিক আধুনিক'। তাই উত্তর আধুনিক পর্বে সেই সবকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন বাংলার কবিকুল। আবার যাতে ভুল পথে না যাই। এবং বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক চিন্তাবিদ তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'আধুনিকতা ঃ পর্ব থেকে পর্বান্তর' (১৯৯৫) গ্রন্থে উত্তরাধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এবং উত্তরাধুনিক সাহিত্যের (তাঁর মতে আধুনিকোত্তর বা উত্তরায়ণবাদী) ২২টি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।[১২] তার থেকে ক'টি উল্লেখ করতে পারি উত্তরাধুনিক চেতনাকে বোঝার সুবিধার্থে —

১। চেতনা মানবিক সমগ্রতায় বিশ্বাসী।

২। এই আত্মদীপ চেতনার প্রধান শক্তি ঐতিহ্যের শিকড় সন্ধান ও পুনর্নির্মাণ।

৩। লোকজীবনের স্পন্দন পুনরাবিষ্কার ও লোক-প্রকরণের আত্মীকরণ, নগরকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে প্রাকৃতায়নের প্রাধান্য।

৪। প্রাতিষ্ঠানিকতা-পুষ্ট পণ্যায়নের বিরোধিতা।

৫। সমস্ত ধরনের ঔপনিবেশিক আকল্পের প্রতিরোধ।

৬। সামাজিক ও নান্দনিক ইতিহাসের পুনঃপাঠ।

৭। বিজ্ঞানের সকল বিষয়বস্তুকে কবিতায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রয়োগ/প্রকাশ করা।

এখানে উত্তর আধুনিক চিন্তাচেতনার একটা সামগ্রিক ধারণা পেয়ে যাই। বিশ্বায়নের মায়াজালে অবক্ষয়ে হারিয়ে যাচ্ছে বা ক্ষয়িষ্ণু মুমূর্ষু আমাদের সংস্কৃতি, শেকড়, প্রাকৃত-লোককথা, লোক সংস্কৃতি, পুরাণ, পরম্পরা, ঐতিহ্য, জীবন ইত্যাদিকে উদ্ধার বিকাশ প্রসার প্রয়োগ পুনর্মূল্যায়ণ পুনর্নির্মাণ পুনরুজ্জীবিত করাই হল বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত উত্তর আধুনিকতা।

এইভাবে পৃথিবীর পরিবর্তন, বিবর্তন, উত্থান পতন, ভাবনা ভাব, চিন্তা চেতনা, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতায় আজকের শিল্পসাহিত্য। বাখতিনের মতো আমরাও বিশ্বাস করি '*There is no figure without ground and background.*' আজকের পৃথিবীর সাহিত্যের পটভূমি ইতিহাস এত দীর্ঘ অনুশীলনশীল পরম্পরা ও ঐতিহ্যশীল— বাংলারও — বরাক উপত্যকারও। আজকের বরাক উপত্যকার কবিতাও তার ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই নয় বরং তার কাছে কৃতজ্ঞ সচেতন উত্তরসূরী।

আজকের সাহিত্যশিল্প পৃথিবীর এই সুদীর্ঘতম পথহাঁটার ফসল। এই পথহাঁটা বহু বাঁকে, বহু বৈচিত্র্যময়, বহুস্বরিক,

বহুরৈখিক, বহুমাত্রিক — এবং তার সকল পদার্থ জিনিস অনুষঙ্গ প্রসঙ্গ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ইত্যাদিও। সময়ের নদীর পার ভেঙে পার গড়ে নদী কোথা থেকে কোথা গেছে সেই জিনিসটা বুঝতেই সাহিত্যশিল্পের চর্চা প্রয়োজন। তাই মনে হয় জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন —

'কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।'

আমাদের পথহাঁটাও এইসব চেতনার খুঁজে। বরাক উপত্যকার কবিতায় সেই সব চিন্তাচেতনা বিষয় প্রকরণ শৈলী অন্তরবাহির জীবনবোধ, জীবনচর্চা, জীবনচর্যা, ইত্যাদির খুঁজে। এখানকার শ্রেষ্ঠ কিছু কবিতা নিয়ে পথ হেঁটে এগিয়ে যাওয়া যাক্। এখানকার কবিতায় কীরকমভাবে আছে সেই সমস্ত তথ্য তত্ত্ব চিন্তাচেতনা কালজ্ঞান ইতিহাস চেতনা ইত্যাদি! এই অধ্যায়ে এখানকার কবিতাজগতের একটা সামগ্রিকতা ও সামগ্রিক রূপ আবিষ্কার করা মূল কাজ। আবার এই আবিষ্কারের পথ হাঁটা হবে পূর্বে বর্ণিত সকল চিন্তাচেতনার নির্যাসে বা দাঁড়িপাল্লায়।

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখব আমরা আকরণোত্তরবাদের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক রোঁলা বার্ত লিখেছিলেন 'The Death of the Author' (১৯৬৮) এবং জাঁক দেরিদা বলেছিলেন — 'There is nothing outside the text.' আর আজকের সাহিত্য পাঠ বিশ্লেষণ তো আকরণোত্তরবাদী বিনির্মাণবাদী চিন্তাচেতনায়। যদিও অনেক আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'কবিকে বুঝিতে পারিলে আরো গুরুতর লাভ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'কবিকে পাবে না তার জীবনচরিতে।' আমরা কোন্ পথে হাঁটব? সেজন্যই আমরা মধ্যম পথ অবলম্বন করব। আমরা বিশ্বাস করি শিল্পীর শিল্পীসত্তা মিশে থাকে তার শিল্পে। কবিও তার কবিতায় লুকিয়ে থাকেন। তবে সব সময় সব জায়গায় সমান না। কখনও কোথাও প্রত্যক্ষ, বেশি প্রকাশ্য আবার কখনও কোথাও পরোক্ষ, অপ্রকাশ্য, স্বল্প। কবিকে খুঁজে পেতে হলে দু'জায়গায় খুঁজতে হবে। কারণ তিনি শিল্প সৃষ্টি করেছেন জীবন চাষ করে। তাঁর এতদিনের অর্জিত অভিজ্ঞতা পথ চিন্তাচেতনা পথহাঁটা জ্ঞানবুদ্ধি সবকিছুই তো জীবন থেকে পাওয়া। আর তাঁর এই সব উপাদানে তো 'মনের মাধুরী' মিশিয়ে নির্মাণ করেছেন কবিতা। তবে দু'জায়গায় খুঁজতে হবে নিশ্চয়। কিন্তু আমরা একুশ শতকের পাঠক। বিজ্ঞান, প্রমাণ, যুক্তি, তত্ত্বকেই সর্বপ্রথম প্রাধান্য দেব। তাই আমরা আকরণোত্তরবাদী বিনির্মাণবাদী পথই গ্রহণ করব। এবং যেখানে যতটুকু প্রয়োজন কবির পরিচয় পটভূমি ইতিহাস সে জায়গার মাপ অনুযায়ী ততটুকুই আমরা গ্রহণ করব। কারণ আগে বলেছি যে আমরা কবি না কবিতা নির্বাচন করেছি। তাই কবিতা পাঠ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করেই আমাদের মূল পথহাঁটা। তার আগে এ অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে আরও কিছু বলা উচিত।

বরাক উপত্যকার ইতিহাস খুঁড়লেও বের হয় রাশি রাশি বেদনা। ১৯৬১ সালের ১৯ মে-র রক্তস্নাত দিন এ অঞ্চলের মহোত্তম দিন। অন্যান্য সকল ঘটনার দিন এই দিনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ এইদিন এ অঞ্চলের প্রধানতম মাইলস্টোন। ঐ মহত্তম দিনের সুবাদে বরাক উপত্যকার মানুষ বাংলায় কথা বলতে পারছে আজ। অফিস আদালতে সরকারি ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে বাংলা।

এই দিনের পটভূমি খুঁড়লে দেখা যায় ১৯৬০ সালের ২৪ অক্টোবর তৎকালীন বিমলাপ্রসাদ চালিহা সরকারের আমলে বিধানসভায় অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। এই নির্মম ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানিয়ে বরাক উপত্যকার বাঙালিরা মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষায় সংগ্রাম করেছিল। ১৯৬১ সালের ১৯ মে তার চূড়ান্ত রূপ ও পরিণতি স্বরূপ কমলা ভট্টাচার্য, হীতেশ বিশ্বাস, শচীন পাল, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, সত্যেন্দ্র দেব, সুনীল সরকার, বীরেন্দ্র সূত্রধর, তরণী দেবনাথ, কুমুদ দাস, কানাইলাল নিয়োগী ও সুকোমল পুরকায়স্থ এই এগারোটি তরতাজা প্রাণ আত্মাহুতি দেয়। যার ফলস্বরূপ এখানে আজও এত বাঙালি বাংলা ভাষা নিয়ে বেঁচে আছে। তা না হলে গোয়ালপাড়ার মতো কোথায় হারিয়ে যেত বাংলা ভাষা ও বাঙালির অস্তিত্ব, পরিচয়, সংস্কৃতি ইত্যাদি। অসমিয়াকরণ থেকে মুক্তি দিয়েছিল এই বলিদান। তৎকালীন সাম্প্রদায়িক মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ গোলাঘাট ছাত্র সমাবেশে ঘোষণা করে

বলেছিলেন — 'Undoubtedly Assam is for Assamese' তার আগে বলেছিলেন — 'They (i.e., Non-Assamese) should adopt the Assamese language.' (Shillong Times, 29th August 1947)[10]

ঐ সময়ে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক সাংসদ নীলমণি ফুকন বলেছেন —

> *"Regarding our language Assamese must be the state language of the province. All the languages of different communities and their culture will be adopted in Assamese culture. The state cannot nourish any other language in the province."*[11]
>
> *(Assam Assembly Proceedings, 1948, page - 585)*

এই জোর করে অসমিয়াকরণ আজও সমানে চলছে। যতই চলুক না কেন আমরা আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইতিহাসকে জানি — পটভূমিকেও। আর এলিয়টের মতো বিশ্বাসও করি গাছ যতই উপরে উঠুক না কেন শেকড় থেকেই সে জল শক্তি উর্বরতা পায়। আর শেকড় না থাকলে গাছ মরে যায়।

১৮৩০ সালে রাজা গোবিন্দচন্দ্র বর্মণের মৃত্যুর (হত্যাকাণ্ড) সঙ্গে সঙ্গে এখানে রাজার আমল ফুরিয়ে গেল। ১৮৩২ সালে ইংরেজরা কাছাড়ের শাসনভার নিল। ১৮৩৪ সালে দু'বছরের চর্চা চর্যায় ইংরেজরা অনেক তথ্য জেনেছেন গভীরভাবে। তৎকালীন সুপারিন্টেনডেন্ট T. Fisher লিখে গেছেন — *"The entire instruction in this district is to be conveyed in Bengali." (June 1834)।*[12]

নিঃসন্দেহে বোঝা যায় বরাক উপত্যকার বাঙালির প্রধানতম পরিচয় তাদের মাতৃভাষা বাংলা। রাজসভার আমল থেকে চলে আসা এখানকার বাঙালির সংস্কৃতি পরম্পরা ঐতিহ্য পরিচয় প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম বাংলা। বৃহত্তর বাংলার একটা খণ্ডিত অংশ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে মানচিত্র বারবার ভেঙেগড়ে সৃষ্টি হয়েছে আজকের বরাক উপত্যকা। সেই পটভূমি পরিচয়কে রক্ষা করার জন্য এতজন মানুষ শহিদ হয়েছিলেন। এটা কী কম গৌরবের কথা!

এই বাংলা ভাষাই ছিল কিন্তু একদিন ব্রিটিশ শাসিত আসাম রাজ্যে ১৮৩৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। এই সম্পর্কে সিদ্ধান্তটা নিশ্চিতভাবেই ছিল শাসক ও আমলাগোষ্ঠীর। কারণ আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় বাঙালিরই ছিল প্রাধান্য। সেজন্যই আসামের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্যই ছিল বেশি। আধুনিক শিক্ষায় অসমিয়ারা হাঁটতে শিখে কলকাতায়। সে সময়ে ইউরোপীয় সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অসমিয়াদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ কৌতূহল ও অনুরাগ ছিল। আবার রাজ্যে বাঙালি ও বাংলা ভাষার প্রাচুর্যতার প্রতি অন্তরে ক্ষোভ ও হিংসা জমে উঠেছিল। এই দ্বৈতমানসিকতা থেকেই জন্ম নিল আধুনিক অসমিয়া জাতীয়তাবাদ। কিন্তু হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, মণিরাম বড়কন্দর বরুয়া, যদুরাম বরুয়া প্রভৃতি স্মরণীয় অসমিয়া মনীষীবৃন্দ বাংলাভাষা ও বাঙালির সংস্কার সংস্কৃতির অনুরাগী হয়ে বাংলা ভাষায় তাদের মনোজগৎ চাষ করেছিলেন।[১৩]

১৮৩৮ সালে বীর মণিরাম দেওয়ান যে 'বুরঞ্জী' রচনা করেন তার ভাষাই ছিল বাংলা। এই 'বুরঞ্জী' অর্থাৎ ইতিহাস হল আসামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক রত্নভাণ্ডার। প্রাচীন কামরূপের ধর্ম, কর্ম, জাতি, সমাজ, সংস্কৃতি, বর্ণ, শংকরদেব ও মাধবদেবের সংস্কার আধ্যাত্মিক চিন্তাচেতনা, গোস্বামী মহন্তদের ধর্মপ্রচার, সংহতি বিভাগ, বঙ্গদেশ থেকে আগত শাক্ত গোস্বামীদের 'আগমোক্ত মার্গ' প্রচার, বিকাশ, ইত্যাদি তান্ত্রিক আচারবিধি বহুবিচিত্র বিষয় এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।[১৪]

এই দুটি বয়ান থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় আসামের মানুষের ভাব বিনিময়ের অর্থাৎ নিজেকে বা নিজের কথা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম ছিল বাংলাভাষা। এখান থেকে আরেকটা জিনিস বুঝতে পারি বাংলা আর অসমিয়া ভাষার

পারস্পরিক উজ্জ্বল সখ্যতা ছিল। ভাব-বিনিময় ও সম্প্রীতি-সৌহার্দের এক গভীর ঐতিহ্য সুদীর্ঘকাল থেকে বর্তমান ছিল।

কিন্তু অসমিয়া মানুষের মনে বাংলার প্রতি আর বাঙালির প্রতি বিষ দানা বাঁধল কখন থেকে? কোথা থেকে? তার উত্তরের জন্য ইতিহাস উজিয়ে গিয়ে দেখা যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ কূট শাসননীতি ও ষড়যন্ত্র এই সুসম্পর্কশীল ঐতিহ্যের মূলে বিষ জন্ম দিল। অন্যদিকে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের স্বার্থে অসমিয়া ভাষায় ব্যাকরণ, অভিধান লিখে, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করে ও স্কুল স্থাপন করে আধুনিক অসমিয়া জাতির গোড়াপত্তন করলেন। ১৮৫৩-৫৪ সালে এ. জে. মোয়াটে মিলস 'Report on the Province of Assam' — এই প্রতিবেদন লিখে আসামে অসমিয়া ভাষা প্রচলনের স্বপক্ষে অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন। নেথাম ব্রাউন, ব্রাউন্‌সন ও আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন প্রভৃতির চেষ্টার ফলে ১৮৭৩ কামরূপ, দরং, নগাঁও, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর জেলার বিদ্যালয়সমূহে ও আদালতে অসমিয়া ভাষা সরকারি ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

এই রকমভাবে এখান থেকেই অসমিয়া ভাষার আধিপত্য ক্রমে বৃদ্ধি পেতে শুরু করল অসমিয়াকরণে। সমগ্র রাজ্যের একমাত্র পরিচয় অসমিয়া ভাষা ও অসমিয়া সংস্কৃতি। এই কুচক্রান্তের ঝড় যখন বরাক উপত্যকার উপর চাপানো হয়েছে তখনই প্রতিবাদ শুরু হল। বাঙালিরা নরমপন্থী হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এখানে একটা কথা বলতে হচ্ছে এই সব মানুষেরাই ভাষা ও সংস্কৃতি প্রেমিক যারা নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির মতোই পৃথিবীর অন্য সকল ভাষা সংস্কৃতি পরম্পরা ঐতিহ্যকে সমানভাবে ভালোবাসে — শ্রদ্ধা করে। কিন্তু এখানকার বড় হিংস্র সুসভ্য নেতামন্ত্রীরা কী গভীর সহজে ঘোষণা করল আসামের সকল অঞ্চলের মানুষেরা (নিজের ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে ভুলে) অসমিয়া ভাষা ও সংস্কৃতিকে অর্জন (Adopt) করতে হবে।

আসামের দ্বিতীয় প্রধান ভাষাভাষী মানুষ বাঙালি। নিজের মাতৃভাষা রক্ষার্থে তারা (সে মুহূর্ত, সেদিন থেকেই) তৎপর হয়ে উঠলেন। তার জন্য তাদের কী যন্ত্রণা কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে — আজও হচ্ছে! আসামের বাইরের বাঙালিরা খুব কমই জানেন আজ তার ইতিকথা। যদিও ১৯মে'র হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, দিল্লী, লন্ডন, ধর্মনগর, কলকাতা, কোচবিহার আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে, বাংলাদেশের ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে আকাশ বাতাস মুখরিত আন্দোলন, প্রতিবাদ, মিছিল, শোকসভা, শ্রদ্ধা নিবেদন হয়। তবুও দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে— 'বরাক উপত্যকার ভাষা কি বাংলা?' 'বরাক উপত্যকার মানুষেরা কি বাঙালি?' এই প্রশ্নের জবাব আজও দিতে হয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাঙালি মানুষকে!

এই জায়গায় বাংলা সাহিত্যের অমর দুই কথাসাহিত্যিকের প্রতিক্রিয়া, প্রতিবাদ ও শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা উল্লেখ করতে হয়। তাদেরকে জানাতে হয় এই নৃশংস ঘটনা শুনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মর্মাহত হয়ে লিখেছেন —

> *''আসামে শিলচরে বাংলা ভাষা সত্যাগ্রহে যে এগারোটি বহুমূল্য প্রাণ আসাম সরকারের রোষ-বহ্নিতে বলি প্রদত্ত হইল এবং শতাধিক ব্যক্তি রক্ত ঢালিয়া আহত হইলেন ইহার পরে আমি কি করিতেছি এবং ইহাতে আমার কি কোন কর্তব্য নাই — এই প্রশ্ন করিয়া অন্তত পঁচিশ-ত্রিশখানা পত্র আমি পাইয়াছি। এবং নিঃসংশয়ে বলিতে পারি বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষীরাও অনেকে মনে মনে এই প্রশ্ন পোষণ করিতেছেন। ইহাদের সকলকেই উত্তরে কবিগুরুর কথা ও কাহিনীর বিচারক — 'পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও পেশোয়া নৃপতি বংশ' — কবিতাটি স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছি – আমি ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী নই, তাঁহার সমপর্যায়ে নিজেকে ফেলিতেছি না, তবে একজন সাধারণ ব্যক্তির মত পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভারত সরকারকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে বলিতেছি — এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাহিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। আপনাদের বিজয় রথ বিচার শেষ পর্যন্ত রোধ করুন। আজ সংবাদপত্রে হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ডে দেখিতেছি প্রধানমন্ত্রী মাননীয়*

শ্রী নেহরু বলিয়াছেন, "It is not proper to kill men and women and child because they agitated for the recognition of Bengali as a state Language in Assam."

বাংলা ভাষা সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিব না — কারণ বাংলা ভাষার গুণের এবং অবদানের দাবি মুখে স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। এবং এখানে সংখ্যালঘুর অধিকারের প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা বড়। যাই হউক, প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তির পর অপরাধের প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ। আমি শিলচরে গুলি চালনার পরই প্রধানমন্ত্রীকে তার করিয়াছি, পত্র লিখিয়াছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তার করিয়াছি। কংগ্রেস সভাপতি শ্রী রেড্ডীর নির্দেশে ব্যথিত ও বিস্মিত হইয়া পত্র লিখিয়াছি। প্রশ্ন করিয়াছি। এগুলির নকল শিলচর সংগ্রাম পরিষদের নিকট পাঠাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে সেসব পত্র পরে প্রকাশ করিব। আমি উত্তরের অপেক্ষা করিতেছি। বিচার যদি না হয়, যদি উপেক্ষা ভাবে তাঁহারা ধ্বজা পতাকা উড়াইয়া অগ্রসর হন — তবে ওই কবিতাটির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সকল সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিব — আমার গৃহে আমার স্বস্থানে — বলিয়া আসিব — এই খেলাঘরের খেলায় আর নিজেকে অবরুদ্ধ রাখিব না।"[১৫]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বয়ানকে অভিনন্দন জানিয়ে কাছাড়, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সকল বাঙালি লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা প্রকাশ করলেন অসীম কৃতজ্ঞতা। তার একটা নমুনা ২৮শে মে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এরকম —

"কাছাড়ের ভাষা সত্যাগ্রহীদের উপর হিংস্র গুলিবর্ষণ এবং এগারোজনকে হত্যা ও প্রায় শতাধিক জনকে আহত করার প্রতিবাদে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্বাত্মক সাধুবাদে সম্বর্ধিত হইবার যোগ্য। বাংলা ভাষার দাবি মুখে নিয়া যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, আর যাঁহারা দেহে নির্মম আঘাত স্বাগত করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের হইয়া শুধু দরদের অশ্রু বর্ষণ করেন নাই, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিনি ন্যায় বিচারে আহ্বান করিয়াছেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সত্যনিষ্ঠা ও পৌরুষ প্রকৃতই লক্ষ্যণীয়। আজ যখন দেশে একদল বুদ্ধিজীবী মৃত রুশ সাহিত্যিক পেস্তারনাকের বান্ধবীর প্রতি সরকারী অকরুণার প্রতিবাদে মুখর হইয়া ওঠেন, ইমরেনজের হত্যাতে বুক চাপড়াইয়া কাঁদেন, আর একদল যখন সরকারী এনাম ও খেতাব লাভকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া দিবারাত্রি উপরওয়ালাদের পায়ে পায়ে ঘোরেন, তাঁহাদের মাথায় ছত্র-চামর ধরেন, অথচ দেশের মাটিতে মানুষের এই নির্যাতন ও মাতৃভাষার এই অপমানে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র টনক নড়েনা তখন তারাশঙ্করের এই বলিষ্ঠ কর্মনীতি নিশ্চয় নৈরাশ্য পীড়িত দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করিবে। কিন্তু এই পথে তাঁহার সহযাত্রী হইবার মতো দেশে কি সাহিত্যিক, সংস্কৃতি সেবক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আর একজনও কেউ নাই?"[১৬]

তারপর বনফুল এই ভাষা শহিদদের প্রতি প্রণাম জানালেন তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে —

"মাতৃভাষার মান বাঁচাতে তোমরা যাঁরা প্রাণ দিয়েছো বীর
তোমরা যাঁরা বুঝিয়ে দিলে প্রাণের চেয়ে মানটা বহু বড়
প্রণাম লহ, প্রণাম লহ, শোকাচ্ছন্ন এ বঙ্গ কবির ;
ওরে অসাড় বঙ্গবাসী, ওদের লাগি অর্ঘ্য কর জড়ো।

ঘরের চালে জ্বলছে আগুন, অপমানে যাচ্ছে মরে সতী
গুণ্ডা তাদের নিচ্ছে টেনে দিনের আলোয় চুলের ঝুঁটি ধরে,
এই বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছো তোমরা মহারথী
আমরা তখন সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছি দূরেতে চুপ করে।

স্বাধীনতার নামে যখন সারা দেশে চলছে জুয়াচুরি
লিঙ্গুইজম নিন্দা করে লীডারিজম জাগছে দিকে দিকে
তোমরা তখন জীবন দিয়ে ভেঙে দিলে সকল জারি জুরি
রক্ত রঙে একে দিলে স্বাধীনতার মর্মকথাটিকে।

প্রমাণ করে দিয়ে গেলে মৃতের দেশে তোমরা ছিলে জিতা
প্রমাণ করে দিয়ে গেলে তোমাদেরই সত্যি ছিল প্রাণ
প্রাণের আগুন দিয়ে বন্ধু জ্বেলে দিলে অত্যাচারীর চিতা
প্রমাণ করে দিয়ে গেলে বাংলা মায়ের তোমরা সুসন্তান।

রত্ন গর্ভা মা তোমাদের, ধন্য তাঁরা বহু পুণ্যবতী
তোমরা তাঁদের অঙ্ক-শোভা বক্ষ মণি নিঃশংক বীর
অন্ধকারের দেশে আজি ফুটিয়ে দিলে কি অপূর্ব জ্যোতি
বেসুরোদের হট্টগোলে গেয়ে গেলে কি সুর গম্ভীর।[১৭]

('উনিশে মে, প্রণাম লহ' - বনফুল)

এই রকমভাবে গ্রামে শহরে দেশে বিদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ঐ সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং হত্যাকাণ্ডের প্রতি প্রতিবাদ, ঘৃণা, কষ্ট, ধিক্কার দিয়েছেন এবং অন্যদিকে এই এগারো শহিদদের প্রতি হৃদয় উজাড় করে শ্রদ্ধা প্রণাম ভালোবাসা প্রণতি জানিয়েছেন।

কিন্তু অসমিয়াকরণ আর অসমিয়াদের ভাষিক আধিপত্য বলতে পারেন ঔপনিবেশিক আগ্রাসন বন্ধ হয়নি। যার প্রতিবাদে ১৯৭২ সালে ১৭ আগস্ট বাচ্চু চক্রবর্তী, ১৯৮৬ সালে ২১ জুলাই জগন্ময় দেব ও দিব্যেন্দু দাস এই তিনজন শহিদ হলেন বাংলা ভাষার জন্য এবং ১৯৯৬ সালে ১৬ মার্চ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সুদেষ্ণা সিন্‌হা শহিদ হন বরাক উপত্যকার পাক মাটিতে। ১৯৮৩ সালে নেলী ও গোহপুরে পাশবিক অত্যাচার গণহত্যাই আবার মনে করিয়ে দেয় ১৯৬০ এর জুলাই মাসের কুখ্যাত 'বঙাল খেদা' ষড়যন্ত্রের কথা। এছাড়া আরও অন্যান্য অসংখ্য ছোট বড় (অসমিয়াদের) নৃশংস আক্রমণ দেখা যায় আজও। এইভাবে বরাক উপত্যকার বাঙালিরা নিজের অস্তিত্বকে নিয়ে বেঁচে আছে আজও।

এই ১৯ মে আসামের মতো একটা 'Assam is for Assamese' জাতীয় মানসিক রাজ্যে না-হয়ে পশ্চিমবঙ্গ অথবা অন্ধ্রপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্র বা তামিলনাড়ু বা উত্তরপ্রদেশের কোনও অঞ্চলে যদি হত তবে তাঁর উপযুক্ত মূল্যদাম পেত। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির বাংলাভাষা শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জাব্বার, শফিউর প্রভৃতির আত্মাহুতি একটা রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। গৌরবের সঙ্গে বলতে ভালো লাগে আজ বাংলাভাষার একটা স্বতন্ত্র স্বদেশ আছে পৃথিবীর ভূখণ্ডে। ১৮৮টি দেশ নিয়ে সংগঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ সংস্থা ''রাষ্ট্রসঙ্ঘ শৈক্ষিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা'' *[The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. (UNESCO)]* আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে ১৯৯৯ সালের ১৬ নভেম্বর। কিন্তু বরাক উপত্যকার ১৯৬১ সালের ১৯ মে? আজ কেবলই ইতিহাস? ইতিহাস ছাড়া কিছুই নয়?

১৯ মে আমাদের চেতনার রঙ বদলাতে পারত; কিন্তু পারে নি। এখানকার বাংলাভাষাকে এবং বাঙালিকে সমৃদ্ধ করতে পারত তার রক্তের সেই বিশেষ উর্বরতা দিয়ে — এক বিশেষ বাঁকে। জন্ম দিতে পারত উজ্জ্বল সাহিত্য — আধুনিকতায় এক Turning point, কিন্তু পারে নি। কারণ বিমাতার ঘরে অর্থাৎ সৎ-মার ঘরে থেকে কেউ আপন মায়ের সন্তানের মতো বড় হতে পারে না। সে অসুখী, অস্বাস্থ্যবান, রুগ্ন হয়ে পড়ে ঐ পৃথিবীতে। এবং অন্যরকম আরও অনেক কারণ আছে। সাহিত্যে (বিশেষ করে কবিতায়) বাঁক বদলাতে পারে নি। তার একটা বিশেষ কারণ সমালোচক

তপোধীর ভট্টাচার্যের বয়ানে তুলে ধরছি —

> *"যথাপ্রাপ্ত অবস্থানের সূত্রে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, অন্তেবাসীজনদের যে নিজস্ব আধুনিকতা গড়ে উঠতে পারত — তার বদলে আমাদের কবিরা গেলেন সরলীকৃত সমাধানের পথে। স্বাভাবিক আধুনিকতার বদলে তাঁরা যে আসলে পশ্চিমবঙ্গীয় আধুনিকতাবাদ অর্থাৎ মহানাগরিক যুক্তিশৃঙ্খলায় প্রতিফলিত ঔপনিবেশিক মননের অনুসরণ করছেন, তাঁরা সেসব তলিয়ে ভাবেন নি।"*[১৮]

এই 'তলিয়ে ভাবেননি' তাই স্রোতে কেবল ভেসে গেলেন — কবিতায় বাঁক ফেরাতে পারলেন না আর। এ ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অঞ্চলের চাষ চর্চা চর্যা ওই-রকমভাবে করার আয়োজন প্রস্তুতির সুযোগ, সুবিধা, অনুকূলও উপযুক্ত পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ছিল না।

কিন্তু ষাটের দশক থেকেই এখানকার কবিতা যথেষ্ট পরিণত আধুনিক হয়ে উঠেছিল। এই আধুনিকতায় ১৯ মে'র রক্তের তুলনায় বিশ্বের বিভিন্ন বাঁক পরিবর্তন বিবর্তন থেকে (সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ অনেক জায়গা থেকে) অনেক বেশি রসদ সমিধ উর্বরতা পেয়েছে। এই অধ্যায়ের অন্যত্র তা দেখিয়েছি।

কিন্তু তবুও ১৯মে এখানকার কবি সাহিত্যিককে সুগভীরভাবে আলোড়িত করেছে — উর্বরতা যোগান দিয়েছে তাদের প্রতিভায়, শেকড়ে। বরাক উপত্যকার প্রায় প্রত্যেক সৃষ্টিশীল ব্যক্তিকে কোনও না কোনোভাবে ভাবিয়েছে — আজও তা সমানে চলছে। করুণারঞ্জন ভট্টাচার্যের 'তেমন কোনো রবার নেই মোছে উনিশে মে', অনুরূপা বিশ্বাসের 'উনিশে মে আয়ুষ্মান হও' (১৯৯৪), শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, তপোধীর ভট্টাচার্য, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতি (উনিশে মে-র সুযোগ্য উত্তরাধিকারী) কবিরা উনিশে মে-র পতাকা মননে চিন্তায় চেতনায় নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। এই দিক দিয়ে আলাদা একটা মূল্য আছে তার।

বিশ্বায়নের অন্ধকারে, উষ্ণতায়, আগুনে পুড়ছে মানুষ। আর কোথাও একটু শান্তি তৃপ্তি আশ্রয় পাচ্ছে না। তাই আবার মানুষ 'Return to the Roots' শেকড়ে ফিরছে — ফিরে আসছে। তাই আজকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯ মে-কে অন্যরকমভাবে স্মরণ করছে—হাতে কলমে।

উপরের এই ভূমিকাকে চিন্তাচেতনার জগতে মনে রেখে নির্বাচিত কবিতা আলোচনা করে এগিয়ে যাব।

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

> *" আমার কবিতার সপক্ষে বলার মত কথা আমার কিছুই নেই বিপক্ষে বলার আছে অনেক।"*[১৯]
>
> *('সবিনয় নিবেদন'—শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর শ্রেষ্ঠ কবিতা)*

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী বরাক উপত্যকার এমন একজন কবি যার কবিতায় মাটির গন্ধ সবচেয়ে বাস্তব বা প্রাকৃত। যে কবি নিজের কবিতার বিপক্ষে অনেক কথা বলতে চান বা পারেন। তিনি অন্যান্য কবি থেকে নিশ্চয়ই আলাদা হবেন এতে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ একটা নিজস্ব পথ সন্ধান থাকবেই তাঁর কবিতায়। আমরা সেই পথান্বেষণে পথে এগিয়ে যাব তাঁর কবিতা আলোচনা করে। অতন্দ্রবৃত্তের প্রথম প্রধান কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সময় শরীর হৃদয়' (১৯৭১), তারপর 'এই পথে অন্তরা' (১৯৭৬), 'অনন্ত ভাসানে' (১৯৮৪), 'কাঠের নৌকা' (১৯৮৪), 'শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৯৫) এবং সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে 'দ্বন্দ্ব অহর্নিশ' (২০০৪) প্রকাশিত হয়। এবং ত্রিপুরার 'অক্ষর' প্রকাশনী শক্তিপদর সমস্ত কবিতা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 'কবিতা সংগ্রহ—শক্তিপদ ব্রহ্মচারী' (২০১১) প্রকাশিত করেছে।

আসলে মানুষ যেরকমভাবে তার জীবন চাষ করে (যে রকম পরিবেশে, পরিসরে, পারিপার্শ্বিকে, সমাজে, মাটিতে)

ঠিক সে রকমই তার ফল ফসল সে লাভ করে। তাই প্রতিটি মানুষই আলাদা— প্রত্যেক কবিও। শক্তিপদর কবিতার নিবিড় পাঠে সেই কথাটা সুগভীরভাবে উপলব্ধি অনুভব করা যায়। শক্তিপদর আলাদা একটা 'কবিতাবিশ্ব' তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

ভালোবাসতে দিলি না রে

'ভালোবাসতে দিলি না রে' কবিতাটি দিয়ে আলোচনা শুরু করব। কবিতাটির শুরু এ রকম করে—

''কতই দিলি, কেবল আমায় ভালোবাসতে দিলি না রে....
সন্ধে অব্দি সঙ্গ দিলি টুকরো কথার হাজার মালা
ছড়িয়ে গেলি তেপান্তরে শুকনো ঘাসে বাসি বকুল
দু-পায়ে তুই মাড়িয়ে গেলি, মাড়িয়ে গেলি হৃদয়হীনা
ঊর্দ্ধবাহু ভালবাসায় একটু মেঘের জল দিলি না....''

কবিকে তার প্রণয়িণী কত কিছু দিয়েছে কিন্তু ভালোবাসতে দেয়নি। কত ধরনের কথা হয়েছে কত ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে। আর এইসব কথা ভাব ইত্যাদি তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল। তবে কবির হৃদয় যা চায় তা খুঁজে পাচ্ছেন না প্রিয়ার কাছে। কবির হৃদয় তৃষ্ণার্ত কিন্তু তিনি ভালোবাসার একটু মেঘ পাচ্ছেন না। অর্থাৎ সময় কবিকে বন্দি করে নিয়েছে তার বৃত্তে। সময় থেকে বেরিয়ে গিয়ে কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না। যা তাঁর হৃদয় চায়।

সন্ধে অব্দি সঙ্গ অর্থাৎ প্রেমের অন্তিম সময় পর্যন্ত এক রকম সঙ্গ পেয়েছেন তিনি। কিন্তু তার পরে তাঁর প্রেমিকা সকল আবেগ ভাব স্বপ্ন কল্পনাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে গেল হৃদয়হীন হয়ে। আর একটুও উষ্ণ ছোঁয়া দিল না ভালোবাসা দিয়ে। আসলে প্রেমে ভালোবাসায় ভাঙন ধরলেই প্রেম ভালোবাসার এবং প্রেম ভালোবাসার নায়ক নায়িকার আসল রূপ সামনে আসে। যা এতদিন ভালোবাসার আড়ালে লুকিয়ে থাকে সুপ্ত অগ্নিগিরির মতন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের অর্থ মানে সংঙ্গা পাল্টাচ্ছে আধুনিকতার ছোঁয়ায় আঘাতে ও নাগরিকতা কৃত্রিমতা যান্ত্রিকতার আক্রমনে। সেই বিবর্তিত প্রেমের রূপ ফোটাতে চেয়েছেন এই কবিতায়—

''আসলে তোর বুকের তলায় ভীষণ কিছু ইঁদুর থাকে
আসলে তুই ফসল কাটার মাসেই করিস ঘোরাফেরা
আসলে তোর গোপনতার আহরণের ভাঁড়ার হতে
শস্য কিছু গড়িয়ে পড়ে সবুজ হওয়ার লগ্নকালে
অবহেলায় বিজ্ঞাপিত সর্বনাশের প্রতিশ্রুতি।''

ভালোবাসাহীন প্রেমের বিবর্তিত রূপ দেখে কবি বলছেন যে আসলে তার বুকের ভেতরে কিছু ভীষণ ইদুঁর থাকে। যে ইঁদুরগুলি মনটা বড় হতে না হতে ঘুরাফেরা শুরু করে দেয়। আর পৃথিবীর সকলকে গোপন করে যে ভাঁড়ারে শস্য আহরণ করেছে। সেগুলি সবুজ হওয়ার লগ্নকালে তার থেকে কিছু গড়িয়ে পড়ে। আর অবহেলায় বিজ্ঞাপিত হয় সর্বনাশের প্রতিশ্রুতি।

ভালোবাসা মানে একটা আশ্রয়। প্রেম মানে একটা আশ্রয়। যে আশ্রয় একটু শান্তির, আনন্দের, সুখের, ক্লান্তি দূর করার, একাকিত্ব দূর করার। আর যখন সেই আশ্রয় বা নীড়টা ভেঙে যায় তখন তার কুৎসিত রূপটা দেখা দেয়। সেই কণ্টকময় রূপ দেখে মনে হয় সকল ভালোবাসা প্রেমের গভীরে এই রূপটা এতদিনে প্রস্তুত হয়েছিল। মনের গভীরে সকল শস্য ভাঁড়ার ইত্যাদিকে চুরমার করে দেয় সেই ভয়ঙ্কর রূপ।

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী এই রকম প্রেমের কথা অনেকবার বলেছেন। কিন্তু সবচেয়ে মনোরঞ্জকভাবে প্রকাশিত হয়েছে

'ভালোবাসতে দিলি না রে' কবিতায়। কবিতাটিতে দুর্বোধ্য কোনও শব্দবন্ধ বা লাইন নেই। একটু পরোক্ষভাবে কথাগুলি বলেছেন তবে খুব সহজ সরল শব্দ ও শব্দ সংযোজন দিয়ে। যে প্রেমের ছবি কবির কাছে তাঁর প্রিয়া রেখে গেছে তা বড় নিষ্ঠুর বড় কষ্টদায়ক। কারণ কবি এই প্রেম এই ভালোবাসা কিন্তু তার কাছে চাননি। তিনি চেয়েছেন সহজ সরল ভালোবাসা যেখানে পবিত্রতা থাকবে প্রকৃতির মত। কেন না একমাত্র প্রকৃতিই মানুষকে চিরদিন ভালোবাসে—ভালোবাসা দিয়ে যায় মনের মতন—

"অথচ তুই সব দিয়েছিস যুগল ঢেউ-এ বুকের শোভা
নৃত্যপরা নটীর মত অঙ্গভরা স্বেচ্ছাচারও
এবং কিছু শুকনো হাস্য, বন্ধুবিহীন প্রগল্‌ভতায়
ঘনিষ্ঠতম স্পর্শটুকু নীরন্ধ্র কোন্ ঘরের কোণে
সবই দিলি; কেবল আমায় ভালোবাসতে দিলি না রে।"

কবিতাটির শুরু যেভাবে ঠিক সে রকমভাবেই একটা নিরাশায় মধ্য দিয়ে শেষও হয়েছে। ব্যর্থ প্রেমিকের বিরহ শোককান্না বলব না। তিনি এখানে পেয়েছেন অনেক কিছু। তাঁর প্রেমিকা তাকে দিয়েছে বুকের সৌন্দর্য স্পর্শ নৃত্যময়ী পেশাদার নটীর মতো অঙ্গভরা সুখ, আজ কবির কাছে যা মনে হচ্ছে স্বেচ্ছাচার। এবং কিছু শুষ্ক হাসি যে হাসিতে কবির কোনও লাভ হয়নি। কবি যখন একেবারে বন্ধুহীন একা ছিলেন সে সময় তাঁর প্রেমিকা তাকে দিয়েছে কোনও নির্জন ঘরের ভেতরে ঘনিষ্টতম স্পর্শ। অর্থাৎ শারীরিক মানসিক সুখ, আনন্দ সবকিছুই দিয়েছে তাকে। কিন্তু কবির কাছে এগুলি সমসাময়িক। যে প্রেম ভালোবাসা কবিকে ভালোবাসতে দেয়নি।

অবক্ষয়ী আধুনিকতা যখন ধীরে ধীরে তার মায়াজাল বিস্তার করেছে মানুষের জীবনের প্রত্যেক দিকে। সেখানে সবচেয়ে বেশি অবক্ষয় হয়েছে মানুষের প্রেম আর ভালোবাসার। প্রেমটা বেশি শরীরকেন্দ্রিক হয়েছে আজ। যেখানে তৃপ্তি নেই শান্তি নেই। শুধু এলোমেলো কিছু কষ্ট বিস্মৃতি পাওয়া যায়। সেই কথাগুলি কবি বলছেন। হয়তবা কবির জীবনেও এরকম কোনও গভীর ঘটনা ঘটেছে। তাই তিনি এরকম মর্মস্বর্শী কবিতা লিখতে পেরেছেন। কারণ শিল্পেই শিল্পী মিলে থাকেন—মিশে থাকেন তাঁর আসল রূপ। যার মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাত্রা সবচেয়ে বেশি লুকিয়ে থাকে।

সময় শরীর হৃদয়

"বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক যখন কবিতা আন্দোলনে উত্থাল, তখন আপন হৃদয়ের সত্যরূপকে কবিতার শব্দে ছন্দে প্রকাশ করতে আবির্ভাব ঘটে শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর। কবিতায় রোমান্টিকতার ঘর-বাড়ি ভাঙার প্রচেষ্টার যুগে শক্তিপদ নিজেও সামিল হলেন ইচ্ছাকৃত পরিপক্ক আস্ফালনের সঙ্গে। নারী আর সেই বনের গাথা রচনার একটু একটু এগোতে গিয়ে একদিন বরাকের অন্যতম কবি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠলেন।"[২০]

উপরের এই সব কথাগুলির প্রমাণ খুব গভীরভাবে পাওয়া যায় শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর প্রথম কাব্য 'সময় শরীর হৃদয়'-এর নাম কবিতার মধ্যে। কবিতাটির মধ্যে সময়, শরীর, হৃদয় এক আলাদা মাত্রা পেয়েছে কবির প্রকাশ মাধ্যমের দ্বারা। যেখানে প্রেম ও হৃদয়ের এক দ্বন্দ্ব ভেতরে ভেতরে গভীরভাবে কাজ করেছে। আর সময়ের যত বয়স হয়েছে কবির চিন্তা ও অভিজ্ঞতা ততই পরিবর্তন হয়েছে। কবি বলছেন—

"ভুলতে পারি হৃদয় তোকে
ভাঙতে পারি তোকে

দারুণ দাহ হৃদয় পোড়ে
গভীরতম শোকে
মুহ্যমান বৃন্ত থেকে
পাপড়ি খসায় ডানা
বুকের তলায় বিজনবহ
কোথায় বিবিয়ানা
দুকুলপ্লাবী, শৈশবের
একটুখানি আশা
সময় কাড়ে পড়শী ঘরে
অ-ফোট ভালবাসা।”

কবিতাটি ত্রিপদী শৈলীতে লেখা। এই হিসেবে দেখলে কবিতাটিতে মোট ছয়ত্রিশ লাইন আছে। এবং প্রথম আটারো লাইনে কবি সময় শরীর থেকে হৃদয়ের দোলাচলতা টানাপোড়েন অবস্থাটা বেশি করে প্রকাশ করেছেন। কবি বলছেন যে তোকে কি ভুলতে পারি হৃদয়— প্রেমের বা ভালোবাসার গভীরতম শোকে হৃদয় পোড়ে দহন হয়। এই কষ্টের বৃন্ত থেকে কুঁড়ি আবার ডানা জন্মায়। বুকের ভেতরে বিজন বয় কোথায় আছে প্রিয়ার একটু আশ্রয়। এই বয়সে হৃদয়ের যখন মনে করেন সেই শৈশবের আশা আকাঙ্ক্ষা বিস্ময় ভয় এবং প্রতিবেশী ঘরে বিনা কারণে চলাচল করে সময় কাটানো সময়টা আর যে ভালবাসা ছিল অটুট।

এই সব কথার মানে কবি আজ প্রাপ্ত বয়স্ক। শৈশবের অনেক কথা মনে পড়ে। তখনকার অনেক মানেহীন অর্থহীন কাজকর্ম ভালোবাসা পথচলা। তখন সময়ে শরীরে হৃদয়ে কোনও কষ্ট দহন ছিল না। কিন্তু এখন কবির হৃদয় পোড়ে প্রিয়ার দেওয়া কষ্টে গভীরতম শোকে। এই প্রিয়া আজকের পৃথিবীও হতে পারে। যেখানে কবি ভাবছেন ছোটবেলাকার সেই সরল সহজ বিস্ময় ভরা পৃথিবী কোথায় আজ? এ যেন আজ হৃদয় পোড়ে শোকে? মনে হয় সময়কে কবির প্রিয়া ভাবা এখানে ঠিক হবে। কারণ সময়ের চলমান স্রোতে কবির এই বিবর্তন, রূপ বদল। তবে সময় কি তার প্রিয়া না!

এই কবিতাটির প্রথম অর্ধেকে কবির সেই কেবল আশা জীবনের স্মৃতি একটু বেশি প্রকাশিত। এবং তারপরে নিজের শারীরিক অবস্থানকে বেশি প্রকাশ করেছেন। কবি বলছেন—

“অভিষেকের সময় গেছে
অবসরের মোহে
সওদাগরি নৌকা তবু
ভাসাই কালীদহে;
শরীর থেকে সময় ঝরে
সাতাশ বছর আগে
কোন সোহাগী ডাক দিয়েছে
অমল অনুরাগে
সময় থেকে সময় ঝরে
সময় হয় বড়
হৃদয় ছুঁয়ে স্পর্শকাতর
শরীর জরোজরো।”

অনেক মানুষের জীবনের অনেক সময় বেকার যায়। কাজের সময় বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ও। আর যখন সে বুঝে তখন শুধু আফসোস থেকে যায়। কারণ সব মানুষই বিশ্বাস করে যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা হল যৌবন। এই

সময়ে সে নিজেকে জীবনকে ভেঙে গড়ে নির্মাণ করে সারা জীবনের জন্য। এই বয়সটা পার হয়ে গেলে শরীর দুর্বল হয়ে যায় তখন আর কিছু করার থাকে না।

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী সেই রকম চিন্তাভাবনা দিয়ে বলেছেন যে অবসর নিতে নিতে বিনা কাজে অভিষেকের সময় চলে গেছে। তবুও একটু বাবুগিরি দাদাগিরি করে জীবনধারণ করার অভ্যাস তাঁর রয়ে গেছে সময়ের দাবিতে। যদিও তাঁর শরীরের বয়স বেড়েছে সাতাশ বছর। সাতাশ বছর আগে কোথাও এক প্রেমিকা কবিকে ডাক দিয়েছিল পরিষ্কার সরল অনুরাগে। কিন্তু আজ কবি সাতাশ বছর পরে সেইসব দিনরাতকে ভালোবাসা প্রেমকে ভাবছেন বিচার করছেন। কিন্তু কবির এখন মনে হচ্ছে বা সময় দাবি করছে অন্যকিছু। অন্য কিছু মানে আজ সময়ই সবচেয়ে বড় বিচারক। কারণ কবি দেখেছেন সময় নদীর মতো চলে যায় অনেক বাঁকে বাঁকে। সবকিছু পরেও সময়টাই একমাত্র সত্য ও বড় হয়ে থেকে যায়। হৃদয় ছুঁয়ে যায় সেসব আত্মজৈবনিক ইতিহাস। তবে শরীরটার সময় হয়ে যায়। ঠিক সেই সময় মানুষের অতীত এসে বারবার হাতছানি দেয়। এই কবিতাটির মধ্যে কবি সেই চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরেছেন তাঁর নিপুণ হাতে। এই জায়গায় কবি জীবনানন্দ দাশের 'লোকেন বোসের জার্নাল' কবিতাটির কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে জীবনানন্দ বলছেন—

> ''সুজাতাকে ভালোবাসতাম আমি—
> এখনো কি ভালোবাসি?
> সেটা অবসরে ভাববার কথা,
> অবসর তবু নেই।''[২১]

কবি শক্তিপদও এই কবিতার ভেতরের ভাববস্তুর কথা অন্য রকম ভাবে নিজের মতো করে প্রকাশ করেছেন। একদিকে অতীত, ইতিহাসের পটভূমি, অন্যদিকে বর্তমান অবস্থান এবং এই অবস্থান নির্দেশিত ভবিষ্যত এই দ্বিবাচনিক জীবনবোধে মিলে মিশে কবির সম্পূর্ণ সামগ্রিক রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। এটা শুধু কবির না আমাদের প্রত্যেকের জীবনেও কী এরকম কোনও সময়ের পথহাঁটা নেই? যেখানে আজ হয়তবা লজ্জাবতী লতায় অথবা ঘাসে অথবা অন্যকোনও বাঁকে সেই সব পথ ঢেকে গেছে—অন্যকোনও নিয়মে। সেই প্রগাঢ় সত্যের কথাই কবি বলছেন এই কবিতার গভীরে।

যখন ব্যক্তিগত কারণে চিন্তাগ্রস্ত

> *''প্রকৃতপক্ষে মানুষের সুখ-দুঃখ যাপিত জীবনের খন্ডিত বিস্বস্ত রূপ, অভিমান, প্রেম ও প্রেমহীনতার বাণীই এক মহতী যন্ত্রণার রূপ পরিগ্রহ করেছে কবিতায়। তাই কবিতা আনন্দও দেয় বটে, বিষাদও বটে—শান্তি আবার সংগ্রামও। কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কাব্য ভূবনে এক উদাসী বাউল আনমনে গান গেয়ে ওঠে। সেই গানের সুরে কখনও বেজে ওঠে কারুণ্য, কখনও বিষাদ, কখনও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কষাঘাতে প্রতিবাদের অনন্যা ভাষা।''*[২২]

শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক এই কথাগুলি বলেছেন। এই কথাগুলির একটা বড় প্রমাণ পাওয়া যায় 'যখন ব্যক্তিগত কারণে চিন্তাগ্রস্ত' কবিতায়। কবিতাটির নামকে ছাপিয়ে গেছে তার ভেতরের বিষয় ভাববস্তু ইত্যাদি। মন্তব্যটি তুলে ধরলাম এই কবিতা বিশ্লেষণের স্বপক্ষে। কবি বলছেন—

> ''তোমাতে নই, আমাতে নই, বিষয়ে আছি লিপ্ত
> নাগামছেঁড়া তিনটে ঘোড়া ভীষণ রকম ক্ষিপ্ত
> বিজন মাঠ বধ্যভূমি
> ধরতে গেলাম, তখন তুমি
> সরে দাঁড়াও অশ্ববাহন, এবং বলদৃপ্ত
> রক্তে নাচও মাতাল ঘোড়া তিনটে সমান ক্ষিপ্ত।''

ব্যক্তিগত কারণে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কবি ব্যক্তিকে ছেড়ে অনেককিছু চিন্তা করে নিয়েছেন। মানুষ যখন নিজের মুখোমুখি হয় নিজেকে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করে তখন মানুষ নিজেকে খুঁজে আগে খুঁজে তার অস্তিত্বকে। কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ঠিক সে রকমই নিজেকে খুঁজছেন এই কবিতায়। নিজের আত্ম-আবিষ্কার করছেন চিন্তা করে।

কিন্তু কবি নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন কিভাবে কোথায়? তাই তিনি বলছেন তোমার মধ্যেও নই আমার মধ্যেও নই শুধু বিষয়ে ব্যস্ত আছেন। এই বিষয় হল জীবনের সমস্ত সম্পর্ক জটিলতা জীবনের জন্য ক্রিয়াকলাপ। তার মধ্যে লাগাম ছেঁড়া তিনটা ঘোড়া চলছে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে। বিজন মাঠ বধ্যভূমিকে জীবনে ধরে রাখতে চাইলেন ঠিক তখন সেই অশ্ববাহন সরে দাঁড়ায়। সে আর ধরা দেয় না। আসলে এই তিনটা ঘোড়া হল মানুষের জীবনের সময়ের তিনটা রূপ অতীত বর্তমান ভবিষ্যত। এই তিনটা ঘোড়া এক হয়ে কবির রক্তে নাচায় এক ক্ষিপ্ত ঘোড়ার বেগ। কবি নিজেকে আবিস্কার করেন এক নয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে। আসলে সে 'চরৈবেতি' শেখায়। মানুষ কখনও সময়কে ধরে রাখতে পারে না— পারে না সময়কে অতিক্রম করতে। সময়ের সাথেই চলতে হয়। তা না হলে সময় থেকে পিছিয়ে যাবে সে স্বাভাবিকভাবেই। আর কবি চান সময়ের সঙ্গেই চলতে। তাই তাঁর ঘোড়া এত ক্ষিপ্ত।

''তোমাতে নই, আমাতে নই, সময়ে আছি লিপ্ত
গুটিকয়েক ইচ্ছে ছিল; উড়ায়ে পরিতৃপ্ত
হয়েছ না কি! সময় যায়
আকণ্ঠ শীত মত্ততায়
ধরতে গেলে হাত পোড়ালে এমন ভীষণ দীপ্ত
অশ্ববাহন মন্দগতি হলে না পরিতৃপ্ত।''

এইখানে কবি আবার আরও পরিস্কার করে বলছেন যে তোমার মধ্যেও নই আমি আমার মধ্যেও নই সময়ের মধ্যে আছি আমি। যে সময়ের মাধ্যমে কবি এগিয়ে চলছেন। কয়েকটা ইচ্ছে ছিল তাঁর। এগুলি সময় উড়িয়ে দিয়েছে। তাই সময়কে প্রশ্ন করছেন সকল স্বপ্ন ইচ্ছা উড়িয়ে সে কি পরিতৃপ্ত হয়েছে? এই সময় যায় বয়ে আকণ্ঠ শীতের মত্ততায়। ধরতে চান এই সময়কে কিন্তু সময় যে এত দীপ্ত কবির হাত পুড়ে যায়। এই সময়ের অশ্ববাহন তবুও তার বেগ কমাল না পরিতৃপ্তও হল না।

কবি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন সময়ের মধ্যে। কবির প্রিয়ার কাছেও তাঁর অস্তিত্ব পাননি নিজের মধ্যেও না। যে সব ইচ্ছা স্বপ্ন সংকল্প ছিল তাঁর এগুলি কিন্তু তাঁর সময়ের উপযোগী নয়। তাই তিনি জীবনের জটিলতা দেখে কষ্ট পাচ্ছেন। সময় চলেছে অশ্ববাহনে। তিনি ধরতে চেয়েছেন কিন্তু পারেননি শুধু তাঁর হাত পুড়ে যায়। মানুষের জীবনকে যান্ত্রিকতা কৃত্রিমতা জটিলতা যখন আবৃত করে ধীরে ধীরে তখন তার সময় প্রতিকূল হয়ে যায়। সেই নিগূঢ় সত্যকে এখানে তুলে ধরেছেন।

''তোমাতে নই, আমাতে নই, অসুখে আছি লিপ্ত
লাগামছেঁড়া তিনটে ঘোড়া জরার অধিক ক্ষিপ্ত
অশ্ববাহন, অশ্ববাহন
হাত বাড়ালে কেবল দাহন
বধ্যভূমি পেরিয়ে এলে, তবুও এত দৃপ্ত!
বিষয়ে আছি, সময়ে আছি, অসুখে অনুলিপ্ত।''

তৃতীয় স্তবকে এসে কবি আবার আবিষ্কার করেছেন যে তিনি তাঁর প্রিয়ার মধ্যেও নেই নিজের মধ্যেও নেই— আছেন শুধু অসুখে। এই অসুখটা কি? জীবন যখন বিষয়ের সময়ের বিপরীত হয়ে যায় তখন সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়—অসুখে ধরে তাকে। ওই লাগাম ছেঁড়া তিনটা ঘোড়া জরার থেকেও বেশি ক্ষিপ্ত। সময়ের এই তিন রকম অবস্থান

রূপ কবির কাছে জরার চেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত। কারণ মানুষ যখন অসুস্থ হয় কোনও রোগে বা অন্য কোনও কারণে তখন এই সময়টা মনে হয় সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত। তার মধ্যেও কবি হাত বাড়াচ্ছেন জীবনকে নিয়ে এগিয়ে যেতে—জীবনের মুখোমুখি হতে। কিন্তু সময়ের অশ্ববাহন তাঁর হাতকে পোড়ায়— দহন করে। এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষের জীবন এক বধ্যভূমি। জন্মের পর থেকে এই বধ্যভূমি আর বিজনমাঠ কেবল বড় হতে থাকে। কবি তাঁর সময়ের অশ্ববাহন থেকে প্রশ্ন করছেন যে এই বিজনমাঠ বধ্যভূমি পার হয়ে এসেও তুমি এত দৃপ্ত। তোমার দৃপ্ততা একটুও কমেনি। অর্থাৎ কবি এতদিনের অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানে আবিস্কার করেছেন যে সময়ের সাথে এই ব্যস্ততা, অসুস্থতা ইত্যাদি আরও বাড়ছে দিনদিন।

কবিতাটির প্রতি স্তবকের শেষ লাইনে তিনি উপসংহার স্বরূপ বলছেন যে তিনি আছেন বিষয়ে সময়ে অসুখে। বিষয় সময় অসুখ এই ত্রিধারা ছাড়া জীবন মূর্ত। কবি খুব ভালো করে জানেন জীবনের সঙ্গে বিষয় আর অসুখ কত গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। আর সময় ক্রমে পরিবর্তন করে তাদেরকে বিভিন্ন রূপ দান করে। বিষয়ের মধ্যে ব্যস্ত থাকতে থাকতে একদিন অনেক দূরে চলে গেছেন। নিজের অজান্তেই সময় তাকে নিয়ে গেছে সেখানে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা চাহিদা কি কখনও কমে? কবি সেই গভীর সত্যকে প্রকাশ করেছেন নিজের নেপথ্যে।

এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবি আবার আমাদেরকে জানান দেন যে জীবন মানে বিষয় সময় অসুখ প্রেম সংগ্রাম ভালোবাসা জীবনের অন্বেষণ। আর এই সবকে ছাপিয়ে গিয়ে যে বাঁচতে পারে সে-ই Survival for the fittest । আরও এগিয়ে যেতে চান তিনি জীবনকে চাষ করে জীবনের সকল সরঞ্জাম দিয়ে।

তুমি আমার

প্রায় প্রত্যেক কবিই তাদের কবিতায় 'তুমি' 'তুমি' শব্দটা বারবার উচ্চারণ করেন। অনেক সময় এই তুমি প্রেমিকা, নিজের একান্ত ব্যক্তিগত সত্তা বা সত্তার দ্বিতীয় রূপ, কখনও ঈশ্বর, কখনও প্রকৃতি আবার কখনও জীবনের অনুসঙ্গ কিছু। কিন্তু কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর একটি কবিতায় 'তুমি' শব্দটি পৌনপুনিকভাবে উচ্চারন হয়েছে বারবার। এই কবিতার সেই 'তুমির' খুঁজে পথ হেঁটে দেখি কি বার হয়ে আসে। কবি উচ্চারণ করছেন কবিতাটির শুরুতেই—

> ''তুমি আমার শূন্য বুকে নৃত্যময়ী
> তুমি আমার অচল সিকি
> ঠাকুর ঘরের ভোগের থালা তুমি আমার ঘণ্টাধ্বনি
> ছারপোকাসার নেড়া তোষক বগল চেঁড়া গায়ের জামা
> তুমি আমার মরণকালে গীতার মতো শিয়রশায়ী।''

প্রথম লাইনেই মনে হয় এই 'তুমি' কবির প্রেমিকা। যে কবির শূন্য বুকে শুধু নাচতে থাকে। যে অচল সিকির মত। যাকে ফেলাও যায় সহজে। নিজের কাছে রাখতে হয় অনিচ্ছায়। কোনও ধরনের বিনিময় করা যায় না তা দিয়ে। যে ঠাকুর ঘরে ভোগের থালার মতো, ঘণ্টা ধ্বনির মতো। যাকে বাজাতে হয়। ঠাকুর ঘরের ভোগের থালার মতো অথচ ভোগ করা যায় না। বগলছেঁড়া জামার মতো যাকে লুকিয়ে রাখতে হয় একান্ত নিজস্ব জিনিস মনে করে—অন্যের থেকে গোপন করে। মরণকালে তাঁর শিয়রে গীতার মতো রাখতে হয় যাকে সে হল কবির সেই 'তুমি'।

এখানে মনে হয় কবির বাইরের কেউ না এই 'তুমি'। ভেতরেরই একজন। যাকে সবখানে বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। কবি তাঁর প্রেমিকাকে এভাবে উজ্জ্বল করে একটা নয়া মাত্রা যোগ করেছেন। বাইরের সত্তার সঙ্গে ভেতরের সত্তার এক তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ লক্ষ করা যায় এখানে।

> ''তুমি আমার ঘুম-ভাঙা-ভোর বাউল কণ্ঠে 'রাই জাগো' গান

তুমি আমার খয়রাতি দান রেশন-চালের পাথরকুচি
দূর বিদেশে তুমি আমার খাল পেরোতে ভাঙা শাঁকো
তুমি আমার ঘুষঘুষে জ্বর নতুন জুতোর দুঃখ ও সুখ
ওপরঅলার খুশি মেজাজ তুমি আমার তুমি আমার।"

দ্বিতীয় স্তবকে বলছেন যে তুমি তাঁর ঘুমভাঙা ভোর ও বাউল কণ্ঠে জাগানো 'রাই জাগো' গান। দান করা খররাতি চালের ভিড়ে লুকিয়ে থাকা পাথরকুচির মতো। দূর বিদেশে যাবার সময়ে খাল পার হওয়ার ভাঙা সাঁকোর মতো। আবার কখনও ঘুষঘুষে জ্বরের মতো। যে জ্বর সেরেও সারে না। ভেতরে ভেতরে লুকিয়ে থাকে। কখনও বা নয়া জুতার মতো কষ্টের আর আনন্দের। আবার কখন ওপরঅলার খুশ মেজাজ। অর্থাৎ কবি তাঁর অনুভূতির দীপ্তিতে সেই 'তুমি' সত্তাকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রূপে পেয়েছেন।

''তুমি আমার ভূর্ভুবস্বঃ হাঁচি-পাওয়া সুখের মতন
তুমি আমার খেলার মাঠের বাজিজেতা ঘোড়ার টিকেট
ফ্রক-ছাড় ছাড় বয়সকালের বালিকাটির লোভের আঠা
তুমি আমার লজ্জা-নিথর নারীর প্রথম ভীরু প্রণয়
জন্মলগ্নে ভাগ্য-নাচান তুমি আমার শনিগ্রহ।

তৃতীয় স্তবকে কবির সেই 'তুমি' অন্যরকম মাত্রা পেয়েছে। কবি বলছেন যে, যে হাঁচি অনেক কষ্টে বের হয় কিন্তু বার হওয়ার পরমুহূর্তে এক গভীর সুখ পাওয়া যায় ঠিক সে রকমই কবির 'তুমি'। কখনও খেলার মাঠে বাজি জেতা ঘোড়ার টিকেটের মতো। কখনও ফ্রক-ছাড়-ছাড় বয়সকালের বালিকার লোভের আঠার মতো। আবার কখনও লজ্জশীলা নারীর প্রথম ভীরু প্রেমের মতো। এইভাবে বিচিত্র রূপে পেয়েছেন তাঁর 'তুমি' সত্তাতে। কিন্তু কবিতাটির শেষ লাইনের উচ্চারণে পাঠককে থমকে দেয় যখন তিনি 'তুমি'-কে আবিস্কার করেন শনিগ্রহ রূপে।

পনেরো লাইনের এই কবিতাটিতে চৌদ্দবার 'তুমি আমার' এই শব্দ বন্ধটি আছে। প্রতিবারই তুমি সত্তাকে এক নতুন রূপ দিয়েছেন। একদিকে কষ্ট, যন্ত্রণা, না পাওয়া, বেদনা ইত্যাদি অন্যদিকে সুখ, আনন্দ, পাওয়া ইত্যাদি। সব মিলিয়ে কবির 'তুমি' সত্তাতে সব কিছু মিশে আছে। অর্থাৎ জীবনের চর্চা চর্যার একটা সহযোগী সত্তা হল কবির 'তুমি'। আর সেখান থেকেই তো মানুষ জীবনকে নতুন করে শুরু করে এইসব 'তুমি আমার'কে ভেঙে গড়ে।

এই কবিতায় যদি 'তুমি' কে কবির প্রিয়া ভাবি। যদিও এখানে সব 'তুমি' প্রেমিকা না তাঁর। তবুও যদি ভাবি। তবে আমরা পাই এক নয়া প্রেম ভাবনার অনুভব অনুভূতি। যা অন্যান্য কবির থেকে পাইনি এর আগে। এই দিক দিয়ে কবিতাটি বেশি মনোযোগের দাবি রাখে। তাই বলতে পারি এই চিন্তাভাবনায় কবিতাটি অনন্য।

সন্ন্যাসের আগে পরে

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর 'সন্ন্যাসের আগে পরে' কবিতাটি তাঁর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে একটু অন্য রকম। কবিতা কবির একান্ত নিজস্ব আত্মজীবনী। যেখানে তিনি নিজেকে দিনলিপি অথবা আত্মজীবনীর মতো নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করেন না। কিন্তু কবিতা অন্য রকম আত্মজীবনী। যেখানে পরোক্ষভাবে নেপথ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন কবি তাঁর কবিতার রক্ত মাংস হাড়ে জোড়ায়। পাঠক গবেষক সমালোচকেরা এক্সরে করে বার করেন তাঁর সেই রূপ। আর এই রকম একটা মেজাজের কবিতা হল 'সন্ন্যাসের আগে পরে'।

এই কবিতাটি দীর্ঘ হলেও পাঠককে মনোরঞ্জন দিয়ে ধরে রাখে ধৈর্যশীল করে। শুধু মনোরঞ্জন নয় আরও অনেক কিছু। যা অনেক ছোট কবিতায় কিংবা দীর্ঘ কবিতায় পাওয়া যায় না। কবিতাটির শুরু এভাবে—

''আমার সুখ দুঃখ এবং কিছু অবশিষ্ট স্বপ্ন তোমার বুকের সিন্দুকে
জমা রেখে সন্যেসীর মতো বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। তুমি হাত বাড়িয়ে
আমার সুখ স্পর্শ করনি; আমার দুঃখের জন্য একটু কাতর হতে
শিখলে না, আমার স্বপ্ন তোমার গর্ভে ভ্রূণবদ্ধ শিশুর অবয়ব পেল না।''

কবির সুখ ও দুঃখ আর কিছু অবশিষ্ট স্বপ্ন রেখেছিলেন তাঁর প্রিয়ার বুকের সিন্দুকে জমা। তারপর সন্ন্যাসীর মতো বাইরে বেরিয়ে পড়লেন কিন্তু দেখেছেন তাঁর সুখ স্পর্শ করেনি তাঁর প্রিয়া এবং দুঃখের জন্য কাতরও হয়নি। প্রিয়ার গর্ভে ভ্রূণবদ্ধ শরীর পেল তাঁর স্বপ্ন। অর্থাৎ নিজের থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার একটা আশ্রয় খুঁজেছেন তাঁর সহযোগী সত্তার কাছে। কারণ বাখতিনের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন 'প্রত্যেক সত্তাই সহযোগী সত্তা'। কোনও সত্তাই একা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না কখনও কোনদিন।

কবি তাঁর সেই সত্তার কাছে তাঁর দুঃখ সুখ স্বপ্ন ইত্যাদিকে পরিপূর্ণ রূপে পেতে চান। প্রিয়ার কাছে এতকিছু চান তিনি জীবনকে একটু অন্য রকম করে পথ চলার জন্য। সন্ন্যেসীর মতো কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে না। তার অর্থ একেবারে একনিষ্ঠ হয়ে। কিন্তু যে রকম তিনি স্বপ্ন দেখেছেন তা পূর্ণ হল না। স্বপ্নকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করতে চেয়েছেন সুখ দুঃখের সেতুবন্ধন দিয়ে। তবে প্রিয়ার কাছে সেই আশ্রয়টুকু পাননি।

''আমি কত বছর তামাম হিন্দুস্থানের শহরে শহরে, তীর্থে তীর্থে
গ্রামে বন্দরে কেবল আমার চুলদাড়ি—আমার চুল দাড়ির বয়স বাড়াতে
লাগালাম। কেউ ভিক্ষে দিলে না, কেউ আমার প্রাচীন ঠিকানা হাতে
তুলে বললে না, 'সন্যেসী ঘরে ফেরো।''

জীবনের সকল জটিলতাকে ত্যাগ করে জীবনের সরল সহজ মানে অর্থে জীবনকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। সন্ন্যেসীর মত জীবনচর্চা করে দেখেছেন কিছুই হয়নি। শুধু বয়স বেড়েছে। তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সকল শহরে তীর্থে গ্রামে বন্দরে ঘুরেছেন আর তাঁর কেবলই দাড়ি চুল বেড়েছে জীবনের ভিক্ষে চেয়েছেন। জীবনের ভিক্ষে মানে বাইরের জটিলতা যান্ত্রিকতা ইত্যাদি নেতিবাচক দিক থেকে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদ—চেষ্টাও। কিন্তু কবিকে তাঁর প্রাচীন ঠিকানা অর্থাৎ শুদ্ধ প্রাকৃত জীবনের দিকে কেউ ফিরিয়ে দিতে চায়নি। বলেনি 'সন্ন্যাসী ঘরে ফেরো!' এ কোন সন্ন্যাসী? কি রকম? বৈরাগ্য প্রিয় সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই নয়। জীবনের মুখোমুখি হওয়ার সন্ন্যাসী। জীবন থেকে তিনি পালাতে চাননি। বরং জীবনযুদ্ধে লিপ্ত হতে চান। কিন্তু তিনি যে রকম ভাবে বাঁচতে চান। কেউ তাকে আহ্বান জানায়নি সেই পথে। তিনি প্রাকৃত জীবনের সন্ন্যাসী হতে চান।

''একবার একজন শিথিলস্তনী বৃদ্ধা বলেছিলেন, ''বাবা, আমার বুকের
দুধ শুকিয়ে গেছে।' এই বলে তিনি তাঁর হাতের কমণ্ডলু শূন্য দেখাবার
ভঙ্গিতে উল্টে দিলেন। সেদিন আমার পুর্বাশ্রমের কথা মনে পড়ল।
কত বৎসর আগে জন্মেছিলেন আমার মনে নেই; আমার ভালবাসার
বয়স সম্পর্কে আমি অজ্ঞান, অধুনা আমার বৈরাগাকে নির্লজ্জের মতো
ভুলে যাচ্ছি। আমি ভবঘুরে এবং ভবঘুরের মতো ঠিকনাহীন।''

কবিরও অনেক বয়স হয়ে গেছে। ওই শিথিলস্তনী বৃদ্ধা তাঁর ছোটকালের সময় ছাড়া অন্য কিছুই নয়। সেই শৈশব বাল্য কৈশোর কালের রূপ আজ শিথিলস্তনী বৃদ্ধা। এখানে আর আজ কিছু নেই সবকিছু লুকিয়ে গেছে। মনে পড়ে গেল তাঁর আগেকার জীবন ধারণের অনেক ছবি। কত আগে জন্মেছিলেন তাঁর মনে নেই আজ। তাঁর ভালোবাসা প্রেম বৈরাগ্যের মতো ধারণা সব ভুলে যাচ্ছেন তিনি। কারণ সময় এগুলিকে মুছে দিচ্ছে তাঁর মন থেকে। তাই নিজেকে নিজে ভাবছেন ভবঘুরের মতো ঠিকনাহীন। কোনও ঠিকানা আজ আর খুঁজে পাচ্ছেন না। কারণ তাঁর আশ্রম ভেঙে গেছে,

বদলে গেছে তাঁর রূপ। তাই এখানে ঠিকানাহীন হয়ে শুধু বেঁচে আছেন।

> ''আর একবার একটা দেহাতী মেয়ে সারা শরীরে ঢেউ তুলে হঠাৎ
> পাথরে পা ঠেকিয়ে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমি স্পষ্ট
> শুনতে পেলাম, ওর আর্তনাদের মধ্যে কোনো প্রার্থনা ছিল না। ওর
> শরীরের ঢেউ ঢেউ গন্ধ বিদ্যুতের মতো বিস্তার লাভ করে আমাকে
> স্পর্শ করল। আমি সাহায্যের ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।
> আসলে আমারই সাহায্যের প্রয়োজন। আমি কত নিঃসহায়। ও উঠে
> বসে আমাকে প্রণাম করলে, আমি আশীর্বাদের জন্য ঠোঁট নাড়তে গিয়ে
> টের পেলাম, অনড় শিলা।''

একবার সময় শিথিলস্তনী বৃদ্ধার মতো কবির কাছে ধরা দিয়েছিল। কিন্তু এই স্তবকে কবির কাছে একটা দেহাতী মেয়ের মতো ধরা দিয়েছে। কবিকে একেবারে আবৃত করে নিয়েছিল। তিনি শুনতে পেলেন মেয়ে রূপী ঐ সময়ের আর্তনাদকে কোনও প্রার্থনা ছিল না। সময়ের জাদু তাকে বিদ্যুতের মতো স্পর্শ করল। তিনিও এগিয়ে গেলেন। আসলে কবিও চান সময়ের তালে বাঁকে চলতে। তিনি বুঝেছেন একেবারে নিঃস্ব— কত একা তিনি। ওই সময় কবিকে প্রমাণ করল। তিনি সময়কে আশীর্বাদ করার জন্য এগোলেন। কিন্তু সে যে পাথরের মতো কঠিন। এই সত্যের মুখোমুখি হলেন তিনি।

এখানে যৌবনের মদমত্ত সময়ের কথাই বলা হয়েছে। সেই প্রেম ভালোবাসা শারীরিক মানসিক সম্পর্ক সময়কেও কখনও কখনও ছাপিয়ে যায়—গেছেও। কারণ যৌবনের বৈশিষ্ট্যই তো সকল বাধা বিঘ্নকে চুরমার করে এগিয়ে যাওয়া।

আমরা যদি ভাবি কবির যৌবনের শরীরের গন্ধ মাখা কোনও প্রেমের কথা। মনে হয় অনুচিত হবে না। কবি দেখেছেন সেই মেয়েটির আর্তনাদের কোনও বিনম্রতা মেনে নেওয়ার কথা বা ভাব ছিল না। কবিও নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য এগিয়ে গেছেন তার কাছে। আসলে তিনি সময়ের উপযোগী হয়ে বাঁচতে বাধ্য। কারণ সময়ও সেইসব কিন্তু দাবি করে তার কাছে। এখানে মনে পড়ে জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতার কথা। দু'টা লাইন না উল্লেখ করে পাচ্ছি না—

> ''তাদের মতন নই আমিও কি
> কোনো এক বসন্তের রাতে
> জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
> আমাকেও ডাকেনি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
> ওই ঘাই হরিণীর মতো?''[২৩]

এখানে সেই বসন্তের কথা বলছেন শক্তিপদ ব্রহ্মচারী।

> ''হঠাৎ একদিন তোমার বাড়ির উঠোনের ডালিম গাছের কথা মনে পড়ল।
> অথচ আশ্চর্য, আমার কোনো ক্ষুৎপিপাসা ছিল না। আমি তখন
> অন্ধকারেও পথ চলতে পারি। আমার অন্ধত্ব দিন-রাত্রির সীমানা
> তুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। পথের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে
> কুকুরের মতো পথে পথে—জানি না সেই শিথিলস্তনী বৃদ্ধার
> শূন্য কমণ্ডলুতে ফোঁটা কয়েক জল অবশিষ্ট আছে কি না,
> জানি না সে যুবতী এখনো ঢেউ এর মতো হাঁটতে পারে কি না,
> জানি না সে...।''

জীবনের পথে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে পেছনে ফিরে দেখে নিজে নিজে ভাবছেন এইসব কথা। প্রিয়ার উঠানের সেই

ডালিম গাছের কথা মনে পড়ে। কিন্তু এখন তাঁর কোনও ক্ষুধাপিপাসা নেই। সেই সময় অর্থাৎ প্রিয়ার অস্তিত্বে সঙ্গ ভরা জীবনে কবি অন্ধকারেও পথ চলতে পারতেন। তখন দিন আর রাত্রির কোনও সীমানা ছিল না। সেই বিস্ময়ের রাত আর দিনের কথা ভাবছেন কবি আজ আজকের বয়সে দাঁড়িয়ে।

কবির কাজ তো পথ হাঁটা। তাই তিনি সব শেষেও এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত। পথের গন্ধ শুঁকে শুঁকে শুধু এগিয়ে চলছেন। এখন তিনি ভাবছেন সেই শিথিলস্তনী বৃদ্ধা সময়ের কাছে অবশিষ্ট কয়েক ফোঁটা জল আজও কি আছে? জানেন না তিনি আজ সেই দেহাতী যুবতী সময়টা এখনোও কি ঢেউ-এর মতো হাঁটতে কি পারে? তিনি আজ জানেন না সেই সব কত রকম সময় কি রকম রূপ ধরে বদলে বদলে চলে গেছে কোথায় কবে কেমন করে!

এই চলে যাওয়াটাই কিন্তু চূড়ান্ত সত্য— চরম সত্য। কারণ পথহাঁটা কোনও দিন আটকে থাকে না। তাঁর ধর্মই হল এগিয়ে যাওয়া। দেখতে দেখতে মানুষের বয়স হয়ে যায়। আর তার ফাঁক দিয়ে সময় বিভিন্ন বাঁক দিয়ে বিভিন্ন পথে চলে যায় বিভিন্ন অবয়ব নির্মাণ করে দেশ কাল সমাজ পরিবেশ ইত্যাদির ও উপযোগী হয়ে। সময় কখনও কোনও বন্ধন বাঁধাই মানে না। সমস্ত বাধানিষেধ ভেঙে চুরমার করে এগিয়ে যায়। আর মানুষ পথিক হয়ে রয়ে যায়—যাত্রী হয়ে রয়ে যায় পথে। flash back এ গিয়ে শুধু ভাবতে থাকে আমি এই ছিলাম, ওই ছিলাম! আমাদের জীবনে এই ছিল। ছিল হয়ে থেকে যায় চিরকালের জন্য—শুধু ক্ষণকালের জন্য সময় তার কাছে থাকে।

> ‘‘এখন আমার চুলদাড়ির গন্ধ স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। এখন আমার
> সারা শরীরে নিজেকে অনুভব করি। ঈশ্বরহীন, নারীহীন, সুরাহীন,
> কবিতাহীন সাম্রাজ্যর সুখী সম্রাটের মতো আমি যখন
> যথেচ্ছচারী, তখন তোমার ডালিম গাছের স্মৃতি আমাকে
> পুনর্বার দুঃখের অনুভব শেখাল। একটা পাখির অনুষঙ্গ
> মানে পড়তে পারত, পড়ল না। বরং তলায় অনেক চঞ্চুবিদ্ধ
> আহত ফলের যন্ত্রণা—আমি আমার বুক, আমার হৃদয়, আমার
> সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করলাম। আমি আমার দুঃখকে
> ফিরে পেলাম।’’

এই স্তবকে কবি নিজেকে সবচেয়ে বাস্তব পৃথিবীতে অনুভব করেছেন। মানুষের বয়স হয়ে গেলে তার কাছে স্বপ্নের পৃথিবী কল্পনার পৃথিবীটা আর থাকে না। তারা বাস্তবেই ফিরে আসে। কারণ স্বপ্নকল্পনার পৃথিবীটা তারা আগে অনুভব করে এসেছেন বাস্তব পৃথিবীতে। এ রকমই কবি নিজেকে বাস্তবের পাল্লায় ওজন করছেন এখন। কবি যখন একেবারে মুক্ত ছিলেন সমস্ত বন্ধন থেকে তখন তিনি সব জায়গায় চলতে পারতেন। ওই সময় কত ডালিম গাছের কথা বারবার মনে পড়েছে। এবং দুঃখের অনুভব শিখিয়েছে। কত পাখির কথা স্মৃতিকথা মনের মধ্যেই মুছে গেছে। আবার বুকের মধ্যে কত যন্ত্রণা লুকিয়ে রয়েছে। আসলে এই রকম প্রতিটা শব্দ, শব্দবন্ধন, বাক্য, বাক্যবন্ধন এক একটা সংকেত।

অবশেষে কবি বুঝতে পেরেছেন জীবন শুধু স্বপ্ন কল্পনা আর সুখ দিয়ে হয় না। সবকিছুর পরেও রয়ে যায় বাস্তবের পৃথিবী। এখানে সব কিছু পথ হেঁটে পেতে হয়। তার জন্য দুঃখের পথ অতিক্রম করা অনিবার্য। তাই তিনি বলছেন দুঃখকে পুণরায় ফিরে পেলেন। আর এই দুঃখ হল জীবনকে পুড়ে উজ্জ্বল করার একমাত্র মাধ্যম বা পথ।

মানুষের যখন বয়স হয়ে যায় তখন তার কাছে স্বপ্ন আর বাস্তব পৃথিবীর পার্থক্যটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়। কারণ সে সমস্ত স্বপ্নের পৃথিবী পার হয়ে আসছে। তাই সে এখন বাস্তবের কষ্টিপাথরে জীবনকে ঘষে মেজে বিচার করে। আর জীবন তো তা-ই শেখায়। স্বপ্ন বাস্তব দুঃখ সুখ কষ্ট আনন্দ ব্যথা আরাম ইত্যাদির রূপ সকল আবরণ খুলে খুলে দেখায়—তার মানে বোঝায়—অর্থ বোঝায়। কিন্তু কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতো তিনি দুঃখবাদী নন। তিনি

দুঃখকে পরাস্ত করে এগিয়ে যেতে চান জীবনকে জয় করার জন্য। দুঃখে হারিয়ে যাবেন না বা যেতে চান না, জীবনকে জয় করে জীবনের মুখোমুখি হতে চান। সময় এখানে যত রঙ ধরুক না কেন, যত রূপ বদলাক না কেন।

> ''দুঃখ বললে, 'সুখ আছে'। দুঃখ বললে, 'চরৈবেতি'। আমার প্রাচীন
> ঠিকানা হাতে তুলে দিয়ে দুঃখ আমার হাতে যষ্ঠী। আমি ফিরে
> এলাম। তখন আমার মনে পড়ল... আমার সুখ দুঃখ এবং কিছু
> অবশিষ্ট স্বপ্ন তোমার বুকের সিন্দুকে জমা রেখে সন্ন্যাসীর মতো
> বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তুমি হাত বাড়িয়ে আমার
> সুখ স্পর্শ করনি, ফিরিয়ে দিয়েছ। আমার দুঃখের জন্য
> একটু কাতর হতে শিখলে না, ফিরিয়ে দিয়েছ। কিন্তু আমার
> স্বপ্ন। আমার স্বপ্ন, আমার স্বপ্ন, আমার স্বপ্ন...আ...মা
> ...র স্ব...প্...ন...অ...অ...ভাঙা রেকর্ড বাজাতে
> বাজাতে আমি লোলচর্ম বৃদ্ধ, দুঃখ আবার বললে, 'চরৈবেতি'।"

এই শেষ স্তবকে কবি উপসংহারের মতো বলতে চান মানুষের জীবনের মূল মন্ত্র 'চরৈবেতি'। তিনি জীবনের এপার থেকে ওপার অর্থাৎ জন্ম থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবনকে কর্ষণ করে করে দেখেছেন—সারা দুনিয়া ঘুরে পরিভ্রমণ করে দেখেছেন। জীবনে কোনও কিছুই স্থায়ী নয়। কিন্তু দুঃখ স্থায়ী যদিও তার ভেতরে সুখ আছে। কবি ফিরে পেয়েছেন তাঁর প্রাচীন ঠিকানা আর চলার যষ্ঠী। সারা পৃথিবী, হিন্দুস্থান সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। তাঁর প্রিয়ার বুকের সিন্দুকে দুঃখ সুখ অবশিষ্ট স্বপ্ন রেখে গেছিলেন কিন্তু এগুলির কোনও পরিবর্তন হয়নি কখনও কোনদিন। কবির প্রিয়াও এগুলিকে প্রগতিশীল করেনি— ধরে ছুঁয়ে এগুলি সুন্দর উজ্জ্বল করেনি। কবি বুঝতে পেরেছেন আসলে মানুষের জীবন পথ দুঃখ সুখ ইত্যাদি একান্ত নিজস্ব তার। এখানে কেউ কিছুই করতে পারে না। এগুলিকে নিয়েই জীবন পৃথিবী মানুষ।

কিন্তু কবি কষ্ট পাচ্ছেন তাঁর সকল স্বপ্নের কথা ভেবে ভেবে। তাঁর কোনও স্বপ্নই পূর্ণ হয়নি। আজ তাঁর কাছে সেইসব স্বপ্ন শুধু কষ্টের আর দুঃখের সামগ্রী। সেই সব স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে আর চিন্তা করতে করতে তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে এসেও তাঁর সেই সব দুঃখ জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন। কারণ জীবন মানে তো থেমে থাকা নয়—চরৈবেতি।

'সন্ন্যাসের আগে পরে' কবিতাটিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবন খুঁজের একটা পদধ্বনি শুনা যায়। এই পদধ্বনি জীবনের মুখোমুখি হওয়ার। ঘর বাঁধা আর ঘর না-বাঁধা, সন্ন্যাসীভাব আর অসন্ন্যাসীভাব ইত্যাদির টানাপোড়েনে জীবনযুদ্ধই হল এই কবিতার মূল কথা। থেমে থাকা নয়, ভেসে যাওয়া নয়, বসে থাকা নয়—চরৈবেতি হল জীবনের মূল মন্ত্র। আর তা না হলে জীবনযুদ্ধ হবে না। আর জীবনের মুখোমুখি না হলে মানুষ নিজেকে কখনও খুঁজে পায় না। এই কথা প্রমাণ করেছেন কবি এই কবিতায়।

জমির মিঞার জবানবন্দী

শ্রীহট্ট বরাক উপত্যকার বাঙালি মুসলিমদের মাতৃভাষা যদিও বাংলা তবে তার ভেতরে সবচেয়ে বেশি বিদেশী দুই ভাষার শব্দ গৃহিত—এক আরবি দুই ফারসি। ভারতবর্ষে মোগল আমল থেকে ফারসি আরবি ভাষার চর্চা চর্যায় এই বিস্তার বিকাশ হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় ভাবাপন্নে মুসলমানেরাই তাতে বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন। তবে শ্রীহট্ট, বরাক উপত্যকায় তার বিস্তার বিকাশ আরও একটু অন্য রকম হয়েছে। কারণ শ্রীহট্ট, বরাকের মুসলিমেরা সবাই অমুসলিম ছিলেন এক সময়। সময়ের দাবি অনুসারে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, কুসংস্কারের চাপে তারা মুসলমান হয়ে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন। অর্থাৎ নিজের একটা আশ্রয় খুঁজেছিলেন। হজরত শাহজলাল ও তার

অনুচর তিনশো ষাট আউলিয়ার প্রভাবে এখানে মুসলমান হয়েছিলেন হাজার হাজার অমুসলিমেরা। আর যারা বাঙালি অমুসলিম তারা সেই সব ভাষা কথা নয়া সংযোজনকে এড়িয়ে গেছিলেন। তাই তাদের ভাষায় বেশির ভাগ বাংলা শব্দ নড়তে পারে নি নিজের জায়গা থেকে অর্থাৎ অন্যান্য নয়া শব্দ সংযোজিত হয়নি। শ্রীহট্ট থেকে আমরা বাঙালি এসেছি বরাকের পারে চরে ওপারে । এখানে এসে নয়া জীবন গ্রহণের সাথে আমাদের জীবনের সঙ্গে নয়া অনেক কিছু সংযোজন হল এখানকার।

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী সেই রকম গ্রামীণ জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন বরাকের গ্রাম বাংলার বাঙালি মুসলমানের প্রতিনিধি রূপে জমির মিঞার জীবন কাহিনিতে। একেবারে গ্রাম্য ভাষায় চিন্তা জীবনচর্চা চর্যার খাঁটি রূপ তুলে ধরেছেন জমির মিঞার জবানীতে। কবিতাটির শুরু এভাবে—

''জবর দুঃখের কথা, আফ্‌শোষে ফাটিছে কলিজা
মবলক দেড় কুড়ি, খুচরা দুই উমরের ইজা
সাকুল্যে বত্রিশ হইল বের্‌থ হইল এমন জৈবন
না আইল কামিনী ঘরে, না পাইলাম একখানা কাঞ্চন।''

জীবন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে জমির মিঞার তার থেকে সে বলছে বড় গভীর দুঃখের কথা আফশোষে ফাটছে কলিজা বয়স তার অনেক হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে বত্রিশ বছর। সে ভাবছে তার যৌবনটা ব্যর্থ গেল। জীবনে কোনও জীবনসঙ্গি এল না তার ঘরে। তাই শ্বশুরবাড়ি থেকে একটা কাঞ্চনও পায়নি বা অন্য কোনও জায়গা থেকেও। এই ভাবনাটা অশিক্ষিত গ্রাম্য পুরুষের কিন্তু—যার প্রতিনিধি জমির মিঞা।

বয়স্ক জমির মিঞার এই সব কথা চিন্তা তো বরাকের অনেক অশিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের কথা। সমাজের উপর তলার মানুষের জীবনের ফাঁকে তাদের জীবন হারিয়ে যায়। কত যে জমির মিঞা এভাবে ব্যর্থ যৌবন, তিক্ত অসহায় জীবন নিয়ে আফশোষ করছে। সামাজিক যাতাকলে তারা একেবারে পিষ্ঠ হয়ে যায় নিজের বৃত্ত থেকে বাইরে বার হতে পারে না। নিজে যে প্রান্তে থাকে তার খবরও পায় না, জানে না, বুঝে না, চিনে না। আর কেন্দ্রের কথা তো তাদের জন্য স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়।

''পীরের মুরশিদ হইয়া ভরমিলাম দেশ দেশান্তরে
যার লাইগ্যা ভুগিলাম ছয়মাস সান্নিপাতি জ্বরে
পেটে হইল বিষকামড়ি চউখে ঘোর, বেজায় হলিমা
কোমরে লেঙ্গটি আর গায়ে মাত্র ছিঁড়া-ভিড়া নিমা।''

ধর্মের উপর জমির মিয়ার গভীর বিশ্বাস। সে যতই কষ্টে থাকুক না কেন। তার জীবনে যতই দুঃখ থাকুক না কেন। তাই সে পীরের ভক্ত হয়ে ভ্রমণ করেছে দেশে দেশান্তরে। যার জন্য তার ছয়মাস কষ্টে যায় সান্নিপাতি জ্বরে ভোগে। পেটে তার রক্ত পায়খানা হয়ে যায়—সে দুর্বল হয়ে গেছে। চোখেও তার ঘোর লেগেছে। আর খুব বেশি হলিমা। তার আর কিছু অবশিষ্ট সম্পদ কোমরে লেঙ্গটি আর শরীরে মাত্র ছেঁড়া বস্ত্র খানি।

এত দুঃখ ভোগ কষ্টসহ্য তবুও নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস দর্শন বিশ্বাস থেকে কখনও একতিল সরে না। সেই সব অভিজ্ঞতা অর্জিত দোষগুণ দিয়েই তার জীবন লালিত আশ্রিত—যাপিতও। এত অসহায় নিঃস্ব অবস্থা তবুও নিজের বৃত্ত থেকে বার হতে পারে না—গ্রামের জীবনগণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারে না। গ্রামের মোল্লা পীর মৌলবী তাদেরকে অনুসরণ করে গভীর ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঈশ্বরবিশ্বাসের ভিত্তিতে। এই বিশ্বাসে কোনও অগভীরতা নেই—কোনও দুর্বলতা নেই। এই ছবি বরাক উপত্যকা তথা শ্রীহট্টের জীবন্ত চলমান জীবনের ছবি। সংস্কারে কুসংস্কারে গড়া জীবনের ছবি। একটু জাড়ফুঁক কবিরাজি ভুতছাড়ানো ইত্যাদিতে লালিত জীবনের ছবি জমির মিঞার জবানিতে ফুটে ওঠেছে। কবি শক্তিপদ

এই ছবি কি কম দেখেছেন। এখানে কবিকে কি পাই না। পরবর্তী স্তবকে কবির মূল শেকড়ের কথা তাঁর অজান্তেই বার হয়ে গেছে—

"খুরে দিয়া দণ্ডবৎ উঠিলাম আসাম-বেঙ্গলে
সবই লুইট্যা নিছে দেখি পড়িবেশী শিয়ালে হেঙ্গলে
আছিল যা নিজের কইতে, ভাঙ্গা থাল এক কাণা ঘটি
উপরে আছেন আল্লাহ, আর আছে কোমরে লেঙ্গটি।"

জমির মিঞাদের আসল শেকড় কিন্তু শ্রীহট্টের কোনও না কোনও মাটিতে ছিল। সে যেভাবে মন্বন্তরে, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে, চক্রান্তে, দেশ বিভাজনের অভিশাপে অথবা জীবিকার জন্য জমির মিঞা শ্রীহট্টের সেই Roots ছেড়ে চলে এসেছে এখানে (আসাম-বেঙ্গলে) কবি শক্তিপদও সে রকমই কোনও এক কারণে এসেছেন। কবির মনেও কি এরকম কোনও বেদনা নেই?

জমির মিয়ার সবকিছু লুটে নিয়েছে প্রতিবেশী সাম্প্রদায়িক অন্ধকারে মগ্ন পাণ্ডাগুণ্ডারা। শেয়াল কুকুরের মতো সবকিছু লুটে নিয়েছে। যদিও তার খুব একটা জীবন সামগ্রী ছিল না ভাঙা থালা আর এক কানা ঘটি। যা দিয়ে সে শুকনো ভাত একটু জল খেয়ে বাঁচত। তা-ও এখন আর নেই। এখন তার আছেন শুধু আল্লাহ্ আর লজ্জাস্থান ঢাকার একটুকরা পাতলা কাপড়।

এখানে বাস্তুহারা জীবনের জ্বলন্ত ছবি ফুটে ওঠেছে। যার বা যাদের ভিটেমাটি লুটে নিয়েছে প্রতিবেশি শেয়াল কুকুরেরা। তাদের দুঃখ বা যন্ত্রণা কে বুঝতে পারবে। কিন্তু কবি জমির মিয়ার জবানিতে কি গভীরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন সেই দেশ ভাগাভাগিতে বাস্তুভিটা হারানো মানুষের অন্তর্জ্বালানো কাহিনি। জমির মিয়া আসলে একটা প্রতীক এবং তার থেকে আরও বড় প্রতীক জমির মিঞার ভাষা। এই প্রতীক দিয়ে তুলে ধরেছেন সেই জীবনের কথা কাহিনি। যা যাযাবরের মতো হয়ে গেছিল। কোথাও আশ্রয় নেই। এখানে মনে করতে পারি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের কথা, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির কথা, ১৯৬১ সালের ১৯ মের কথা, ১৯৭১ এর দেশভাগের কথা, গোয়ালপাড়ার বাঙালির কথা। শেকড় হারানোর দুঃখ যন্ত্রণা হাড়ে নিয়ে গড়েছিল যে সব জমির মিঞার জীবন। সেই জীবনের কথাই বলছেন কবি।

"দুঃখের অবধি নাই, কী কইমু তুমারে বাপধন
বাবু ভাইয়া ভোগ করে পির্থিমীর কামিনী কাঞ্চন
খুঁজি মাগি অন্ন খাই, মাইয়া দেখলে বাইয়া পড়ে নাল
কেউ না জিগার করে, আমি এক আকাট বাঙ্গাল।"

এই শেষ স্তবকে আবার ফিরে আসল প্রথম স্তবকের কিছু মেজাজ। এবং সংযোজন হল গ্রামীণ জীবনের আরও এক নয়া দিক। প্রথম স্তবকে বলেছে দুঃখের কথা, বয়স হয়ে যাওয়ার দুঃখের কথা, ব্যর্থ হওয়া যৌবনের কথা, কাহিনি কাঞ্চনের কথা। কিন্তু শেষ স্তবকে এসে বলছে তার দুঃখ ভাষায় প্রকাশের অতীত। বাবু ভাইয়েরা পৃথিবীর কামিনী কাঞ্চন লাভ করে, সকল সুখ আনন্দ লাভ করে। অর্থাৎ সমাজের উপরতলার মানুষেরা সকল সুবিধা পায় জীবনকে নিজের মতো লালন করে। কিন্তু জমির মিঞারা কেবল আফ্‌সোস করে কষ্ট পায়। দুঃখে কষ্টে জীবনকে নিয়ে এগিয়ে যায়। তবুও তার ভেতরেও উপরতলার সেই সব মানুষের মতো তাদের মনেও কত আশা আকাঙ্ক্ষা জাগে। যদিও তাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। তাই নিজেকে নিয়ে হীনমনস্কতায় ভোগে কষ্ট পায়। 'বাঙ্গাল' শব্দটাকে বরাক উপত্যকার মুসলমানদের প্রতি একটু তাচ্ছিল্য অর্থে ব্যবহার করা হয়। জমির মিঞাও সেই রকমভাবে শোষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত সব দিক থেকে। জমিরমিঞার এই জীবন কথাও কিন্তু এক প্রকার শ্রেণি সংগ্রাম এবং শ্রেণী সংগ্রামের প্রতীক।

নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের লড়াই-এর প্রতীক।

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী গভীরভাবে বুঝতে পেরেছেন যে এই রকম জীবন কথা জমির মিঞার ভাষ্য ও ভাষা ছাড়া অন্যভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাই তিনি বরাক উপত্যকার জনজীবনের প্রতিনিধি জমির মিঞার জীবন চর্চা চর্যা জীবনশৈলী ইত্যাদি হুবহু তুলে ধরলেন পাঠকের কাছে 'জমির মিঞার জবানবন্দি'-তে যে ভাববস্তু বিষয়বস্তু অন্যদিকে অন্যভাবে অন্য ভাষায়ও প্রকাশ সম্ভব নয়। সে দিক দিয়ে এই কবিতাটি একটি স্বার্থক কবিতা—তথা আঞ্চলিক ভাষারও শ্রেষ্ঠ কবিতা।

৬ মার্চ ১৯৭১

> *"অন্তর্বয়ন কীভাবে পাঠকৃতিতে গড়ে তোলে, কীভাবেই বা নৈঃশব্দ্য লালন করে শব্দবন্ধকে—এখানে তার চমৎকার দৃষ্টান্ত পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে, কোনো আধুনিক চাতুর্য ছাড়াই নিটোল কবিতা জন্ম নিতে পারে। এই জন্যে শাব্দিক বিজ্ঞাপনেরও প্রয়োজন নেই কোনো।"*[২৪]

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর খুব ছোট কবিতা '৬ মার্চ ১৯৭১' এর চর্চা করতে গিয়ে সমালোচক এই কথাগুলি বলেছেন। কবিতাটি হল এ রকম—

"একদিন মেধা এসে নিয়ে যায় ডেকে
সামগ্রিক বিষণ্ণতা থেকে।
তৃষ্ণার্ত জিহ্বার কাছে নেমে আসে জল
জীবনানন্দের গ্রাম, স্নান বেতফল
ঝরায় সামান্য আয়ু খরার বিবেকে।"

এই প্রগাঢ় উচ্চারণের মধ্যে একটা নিটোল কবিতা দেখতে পাই। তার ভেতরে গভীর অর্থ আছে। কবিতাটি পড়তে পড়তে জীবনানন্দের দুটা কবিতার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে 'হায় চিল' ও 'অদ্ভুত আঁধার এক'। কারণ রাঙা রাজকন্যার মতো সব মেধা রূপ নিয়ে দূরে চলে যায় সামগ্রিক বিষণ্ণতা থেকে। তবুও তৃষ্ণার্ত জিহ্বা জলের জন্য কাতর। আর জীবনানন্দের গ্রাম আম জাম হিজল বট পেঁচা শালিক ঘুঘু শস্য চাষীতে ভরপুর উপাদান আজ আর নেই তাই ম্লান বেতফল কষ্ট দেয় আর ঝরায় নিজস্ব আয়ু সময় খরার বিবেকে। অদ্ভুত আঁধারের পৃথিবীতে আমাদের আয়ু ঝরছে শুধু যন্ত্রণা কষ্ট অভিশাপ ভোগ করে। এখানে মানুষেরা বেঁচে আছে কিন্তু মরে মরে। এই মৃত্যু বিষণ্ণতাবৃত।

বড় কম কথায় অনেক বেশি কথা বলে দিয়েছেন কবি। চারদিকে ধ্বংসের আহ্বান তার মধ্যে বেঁচে থাকাটা বড় কঠিন। সামগ্রিক বিষণ্ণতা কষ্ট দেয়—'রূপসী বাংলা' আর খুঁজে পাব না। কারণ আমরা অদ্ভুত আঁধারের পৃথিবীর জীব ছাড়া অন্য কিছুই না। আর তাছাড়া সমালোচকের কথাগুলি তো ভরতবাক্য হিসেবে রইল পাঠকের জন্য। এই কবিতার ভেতরে একটা রহস্যময় অর্থের সম্ভাবনা কাজ করে ভেতরে ভেতরে। এটাই তার সৌন্দর্য গাম্ভীর্য মাধুর্য।

৬ মার্চের সেই নির্মম ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ এ বাংলাদেশে। যা কবির হৃদয়ের সমস্ত দিক ছোঁয়ে গেছে। যার প্রভাবে ফলে এই কবিতার জন্ম হয়। যে 'রূপসী বাংলা' হল জীবনানন্দের দেশ—মাতৃভূমি। সেখানে এরকম পরিবর্তন কবি মেনে নিতে পারেননি। এই না-মানাটা কিন্তু একজন সমাজ সচেতন সমাজ বাস্তবতা সচেতন কবির বৈশিষ্ট্যও। এই সচেতনতা ব্যক্তিকে ছাপিয়ে গিয়ে সমষ্টিতে বিকশিত।

এই কবিতার গভীরে একটা নৈঃশব্দ্যের ছায়াঞ্চল আছে। যা বড় বেশি রহস্যময়—বিস্ময়করও। প্রতিটি শব্দের অন্তঃসারের সঙ্গে পৃথিবীর সামগ্রী সরঞ্জাম কী গভীরভাবে জড়িত। এই কবিতা অনুভবে ভিন্নমাত্রিক অবক্ষয়, অবসাদ,

গ্রাম পতনের শব্দ ইত্যাদিকে কবিতাটির শব্দে বাক্যে সংকেতের দ্বারা দেখাচ্ছেন। এই জায়গায় জীবনানন্দ দাশের 'হায়, চিল' কবিতাটির কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে জীবনানন্দ বলছেন—

"তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে;
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হার হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!"[২৫]

কবি শক্তিপদর এই কবিতাটিতে জীবনানন্দের 'হায়, চিল' কবিতাটির এই সুরের প্রাণ প্রাচুর্যও কম নয় কিন্তু। পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো একদিন ডেকে নেয় কেউ না কেউ। এবং অবশেষে পড়ে থাকে কেবল আয়ুহীন ম্লান বেতফল। এটা তো জীবনের বিবর্তনশীল বাস্তবতার গভীর বাস্তবতা। আমরা যখন রাজকন্যার মায়াজালটাকে বুঝি বা বুঝতে পারি তখন আমাদের অবশিষ্ট থাকে শুধু 'সামান্য আয়ু'। আর এই পড়ন্ত সন্ধ্যা বেলায় কিছু করা যায় না— মৃত্যুর অপেক্ষা ছাড়া। আসলে জীবনবোধকে প্রকাশ করার যে শৈলী ব্যবহার করেছেন কবি এখানে তা অনন্য। এই পাঁচ লাইনের ছোট্ট কবিতায় Melancholy বোধ সুগভীরভাবে আছে। যা একদিকে রোমান্টিক অন্যদিকে চরম বাস্তব। এই দুইয়ের দ্বিরালাপে তিনি তুলে ধরেছেন মানুষের জীবনকে—বাংলাদেশের মাটির পটভূমি ইতিহাসকেও।

একটি গ্রামীণ পদ্য

প্রতিটি কবিতাই সত্যকে প্রকাশ করে। এক এক রকম সত্যকে প্রকাশ করে। শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর 'একটি গ্রামীণ পদ্য' কবিতাটিও এ রকম সত্যকে প্রকাশ করেছে। এমন এক রকম সত্য যা আলো ও অন্ধকারের মাঝখানের সত্য, উন্নত অনুন্নত জীবনের সত্য, গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের মাঝখানের টানাপোড়েনকে গভীরভাবে প্রকাশ করেছে।

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর জন্ম পূর্ববঙ্গের হবিগঞ্জ মহকুমার সোনাইত্তা গ্রামে। কবির নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা মেশানো সত্য প্রকাশিত হয়েছে এই কবিতায়। কবিতাটির শুরু হচ্ছে এভাবে—

"আমাদের গ্রাম থেকে শহর ছিল পঁচিশ মাইল দূরে
আমরা স্বপ্নে ছাড়া ট্রেন ও মোটর গাড়ি দেখিনি বহুদিন
তিন বাঁক উজানের একজন হোমিওপ্যাথ
সাত ইঞ্চি শিশিতে করে শাদা জলের ওষুধ দিতেন আমাদের
আমাদের কোনো ডাকঘর বা ইস্কুল ছিল না
ইতিহাসের পাতায় যাকে সভ্যতা বলে
তা অনেকদিন আমাদের জানা হয়নি"

কবি বলছেন যে তাদের গ্রাম শহর থেকে পঁচিশ মাইল দূরে ছিল। কথাটার অর্থ হয়তবা এরকমও হতে পারে গ্রাম ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে কিন্তু তাদের গ্রাম এখন পঁচিশ মাইল পিছিয়ে আছে। আর এ গ্রাম পরিবর্তন অর্থাৎ নাগরিকতার হাওয়া তো শক্তিপদর সময়ে খুব কম ছিল। পঁচিশ মাইল দূরে শহর। তার হাওয়া এসে লাগতে লাগতে পথেই ফুরিয়ে যায়। তাই কবি বলছেন ট্রেন ও মোটর গাড়ি স্বপ্নে ছাড়া তারা দেখেননি বহুদিন। কবির গ্রামের তিনটা বাঁক উজান ছেড়ে একজন হোমিওপ্যাথী ডাক্তার আছেন। তার চিকিৎসায় বাঁচত তারা। এখানে কোনও ডাকঘর বা স্কুল ছিল না। আর ইতিহাসে যাকে সভ্যতা বলে তা অনেকদিন তাদের জানা হয়নি। সময় কিভাবে জীবনের মানুষের সভ্যতার পার ভাঙছে আর গড়ছে সেই বার্তা পাই এখানে।

এই ছবি তো চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের জ্বলন্ত সমস্যা— সত্যও। আজও কি এরকম গ্রাম নেই এই বাংলায় কিংবা ভারতবর্ষে? যেখানে পুরাতন চিন্তাধারাকে আজও সরাতে পারেনি নয়া চিন্তাধারা। দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয়

সামগ্রীগুলিও মানুষ ভালোভাবে পাচ্ছে না। এখানকার জীবন যেভাবে তাদেরকে নিয়ন্ত্রন করছে তারা সেভাবেই চলছে। নয়া কিছু কিন্তু সহজে যোগ হচ্ছে না। কারণ তারা চট্ করে এতদিনের লালিত জীবনধারাকে হঠাৎ করে বদলাতে পারবে না। আর বদলানোর মতো হাওয়াও এসে পৌঁছায়নি। সেই সময়ের গভীর সত্যকে তুলে ধরেছেন এখানে। গ্রামীণ জীবনের পরিসরকে দেখাতে চেয়েছেন যে আমরা কোথায় ছিলাম। তারপর কবি বলছেন—

''তবু এবং আশ্চর্য
মায়ের উপুড়-করা স্নেহের মতো আমাদের মাথার উপর আজন্ম আকাশ
দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠের মধ্যে সবুজ ও সোনালি ছিল আমাদের প্রিয় রঙ
আমরা কাকের ডাক শুনতে শুনতে টিয়া পাখির নাম মুখস্থ করতাম
এতসব অসুবিধার মধ্যেও আমাদের ত্রিসীমানায়
একটি নদী ছিল
এবং আপনারা বিশ্বাস না করলে সত্যিই দুঃখ হবে
নদীটির নাম ছিল, বিবিয়ানা''

এত পিছিয়ে পড়া গতিহীন জীবনধারায় পূর্ণ গ্রাম। তবুও কবি বিস্ময়ে বিস্মিত এখানে আকাশ মায়ের স্নেহের মতো ছায়া দেয়। মাঠ ভরা সবুজ সোনালি রঙ দিয়ে। যে রঙ গ্রামের মানুষের বড় প্রিয়। কাকের ডাক শুনে শুনে তারা টিয়াপাখির নাম মুখস্থ করতেন। অর্থাৎ বাইরের পৃথিবীর সাথে গ্রামজীবনের কোনও সম্পর্ক ছিল না। গ্রামজীবনের অর্থ মানে সংজ্ঞা দিয়ে জীবন এবং জীবনের সকল উপাদান সামগ্রীকে তারা গ্রহণ করেছেন—চর্চা চর্যাও। এত অসুবিধা সত্ত্বেও কবির গ্রামকে তিনদিক থেকে ঘিরে আছে 'বিবিয়ানা' নামক নদীটি। এই বিবিয়ানা নদীর সঙ্গে কবির শেকড়ের সম্পর্ক রয়েছে। 'সময় শরীর হৃদয়','এই পথে অন্তরা','অনন্ত ভাসানে' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের 'বুকের ভেতর বয়স হাঁকছে', 'মনসা পূজার পাঁঠা', 'যতটুকু দুঃখ দাও ', 'হে কবিতা ক্ষমা করো' ইত্যাদি কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে এই বিবিয়ানা নদীটির নাম প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ।

গ্রাম যতই পিছিয়ে থাক্ না কেন এখানের জীবন এবং প্রকৃতি সৌন্দর্যে মাধুর্যে গাম্ভীর্যে রহস্যময়। সেই রহস্যময় রূপকে তুলে ধরেছেন এই স্তবকে। দিন আর রাত, সকাল আর সন্ধ্যার বিচ্ছেদ ও মিলন-মোহনায় বা মুহূর্তে পৃথিবীকে এখানে আশ্চর্যময়ী মনে হয় যা শাহরিক বা নাগরিক জীবনে পাওয়া যায় না কোথাও। সেই মুহূর্তে গ্রামের পাশ দিয়ে ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর রূপ কলকল শব্দ পাখির কূজন ইত্যাদি প্রকৃতিকে আরও বেশি গভীর সুন্দর করে তুলে। সেই রহস্যময় ছবি তুলে ধরেছেন কবি।

''আকাশ এবং নদীকে সাক্ষী রেখে রিফিউজি লতার মতো একটি মেয়ে
অনাদরে বেড়ে উঠছিল আমাদের প্রতিবেশী বাড়িতে
আমরা 'সুন্দর' শব্দটিকে অভিজ্ঞতার মধ্যে টেনে আনছিলাম প্রতিদিন
আমাদের ঘ্রাণশক্তি সাবা লক হওয়ার মুহূর্তে টের পেয়েছিলাম
মেয়েটির শরীরে ছিল কচি ডুমুর পাতার গন্ধ''

গ্রামজীবনের আরও একটা বড় রহস্য হল এখানকার জীবনের বৈচিত্র্য। ও পাড়ার জীবনধারা এ পাড়ার জীবনধারা ও বাড়ির জীবনধারা এ বাড়ির জীবনধারা থেকে স্বতন্ত্র ব্যতিক্রম অন্যরকম। তাই তাদের বৈচিত্র্যময়তাকে অনুভব উপলব্ধি করা যায়—হৃদয়ঙ্গমও।

শহরের ভিড়ের মধ্যে কোনও মানুষ লক্ষ্য করা যায় না। আলাদাভাবে চেনাও যায় না। সেই সত্যকে তিনি অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন। মায়ের মমতায় স্নেহের ছায়ায় পূর্ণ আকাশ আর বিবিয়ানা নদীকে সাক্ষী রেখে অনাদরে একটি মেয়ে বড় হয়ে ওঠেছে রিফিউজি লতার মতো প্রতিবেশী বাড়িতে। কবির কাছে হয়তবা এই মেয়েটি গভীরভাবে দাগ

কেটেছে—মনেও। তাই মেয়েটিকে তারা সুন্দর বলেছেন। এ সৌন্দর্য প্রাকৃতিক। পাড়ার মানুষেরা বিশেষ করে যুবকেরা তাকে সুন্দর বলত। তাদের সাবালক হওয়ার বোধ বা আন্দাজ যখন পরিপক্ষ হচ্ছে তখন তারা টের পেলেন যে 'মেয়েটির শরীরে কচি ডুমুর পাতার গন্ধ'। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকেও মানসিকভাবে আলোড়িত করেছিল—মনে দোলা দিয়েছে গভীরভাবে 'পথের পাঁচালী'র দুর্গার মতো।

এরকম তো প্রত্যেক গ্রামের অনেক যুবতী কত যুবকের মনে শক্তি জাগায় প্রেম ভালোবাসায় সৌন্দর্যে। এটা তো জীবনের এক চরম সত্য। এই সত্য নিশ্চয়ই গ্রামের কোনও মেয়েকে কবির চোখে এইভাবে জাগিয়েছিল চেতনা। সেই সুন্দরের কথা বলেছেন এখানে।

> ''আমাদের নদীর নামটি যেমন উল্টোপাল্টা
> সে জন্যেই বোধ হয় মেয়েটিকে কেউ 'রঞ্জনা' ব'লে ডাকত না
> এবং উপসংহারে আমার একটিই বলার মতো কথা বাকি আছে
> আমাদের গ্রামের নামটি ছিল খুবই অকাব্যিক, অনর্থক ও বিচ্ছিরি
> এমনকী লিখতে লজ্জা করে।''

আগে উল্লেখ করেছি কবির গ্রামের নাম ছিল 'সোনাইত্তা'। তার তিনদিকে ঘেরা বিবিয়ানা নদী। কবি বলছেন যে নদীর নাম উল্টোপাল্টা বলেই ঐ মেয়েটিকে কেউ 'রঞ্জনা' বলে ডাকত না। কবি বলছেন যে তাঁর গ্রামের নামটি অকাব্যিক, অনর্থক ও বিশ্রি—এমন কী গ্রামের নামটা লিখতে লজ্জা করে।

গ্রামের মানুষের এটা একটা সমস্যা—জটিল সমস্যা। বাইরের পৃথিবীতে অনেকে নিজের পরিচয় দিতে তারা দ্বিধাবোধ করেন। নিজের গ্রামের নাম এই রকম হলে অনেকে উচ্চারণও করেন না। এখানে মনস্তাত্ত্বিক দ্বিরালাপ পাচ্ছি। এখানে সেই সত্যের কথা বলছেন কবি। গ্রামজীবন ও শাহরিক জীবনের টানাপোড়েন দ্বন্দ্ব তফাৎ পার্থক্যকে এই কবিতার আড়ালে তুলে ধরেছেন। গ্রামজীবনের কুৎসিত-সুন্দর ভালো-খারাপ দুই দিকের কথাই তুলে ধরেছেন এই কবিতার নেপথ্যে। উপসংহারে বলা যায় এই কবিতাটিতে গ্রামজীবনের পরিবর্তন বিবর্তন জীবনধারা জীবনচর্চা চর্যার রূপ তুলে ধরেছেন কবি খুব সহজ কথায়।

মনসা-মঙ্গল

> *''যা মান্যতা পায় তাইতো সমসাময়িক এবং নিরাপদ; অতএব মনস্তাত্ত্বিক তাগিদ থেকে আধুনিকতাবাদী ছাঁচ বাঙালি সংস্কৃতির প্রান্তিকায়িত ব্রাত্যজনদের মধ্যে গৃহিত হলো। কিন্তু সত্য চিরকালই দ্বিবাচনিক; তাই প্রাকৃতায়নের অনিবার্য আকর্ষণে মুখোশ থেকে বড় হয়ে ওঠে মুখ, দুর্নিবার হয় শিকড়ে জলের ঘ্রাণ। সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে তাই পুনর্ণির্মিত হয় প্রত্নকথা। 'মনসামঙ্গল' কবিতাটি এই প্রাকৃতায়নের এবং সেই সঙ্গে আরোপিত আধুনিকতাবাদের পরাজয়েরও চমৎকার দৃষ্টান্ত।''*[২৬]

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'মনসামঙ্গল' সম্পর্কে চর্চা করতে গিয়ে সমালোচক এই কথাগুলি বলেছেন। এই কবিতাটিতে এমন এক সত্যকে কবি নির্মাণ করেছেন মনসামঙ্গলের মিথকে বিনির্মাণ করে। যা বাংলাদেশের লোকসমাজ এক নয়া রূপ পেয়েছে তার সাম্প্রতিকতা দিয়ে। তাই মনে হয় কবিতাটির নাম রেখেছেন 'মনসামঙ্গল'। কবিতাটির ভেতরে বাংলার মানুষ সমাজ মাটি সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠেছে। কবিতাটি শুরু এভাবে—

> ''সপ্তডিঙা মধুকর চারিদিকে জল
> শ্রাবণের অবিশ্রাম মনসা-মঙ্গল
> পচা পাটে এঁদো ডোবা বিষধর ফণা
> ছেঁড়া কাঁথা-কাণি আর বেহুলা-যন্ত্রণা

হু হু-করা কালসন্ধ্যা ভেসে আসা গানে
সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে।"

আঞ্চলিক জীবনের রূপ লাভ করেছে এখানে। আর এই আঞ্চলিক জীবনধারা আরও বেশি প্রাকৃত হয়ে ওঠল এখানে। বাংলার মাঠ জলাশয়ে পূর্ণ শ্রাবণ মাসে আর তার মধ্যে সপ্তডিঙা মধুকর। মনসামঙ্গল এখানে এক নয়া রূপ লাভ করেছে। পাট কেটে ক্ষুদ্র জলাভূমিতে ডুবিয়ে রাখে পাট চাষীরা আর পচে যাওয়ার পর পাট উৎপাদন করে এখান থেকে। কিন্তু কখনও এই পচা পাটে বিষধর সাপ থাকে। ছেঁড়া কাঁথা তো একেবারে নিম্নবর্গীয় মানুষের শীত নিবারণের সামগ্রী। বেহুলা যন্ত্রণা অর্থাৎ বাংলার নারীরাও কিন্তু বেহুলার মতো জীবনযন্ত্রণাকে অতিক্রম করছে নতুন করে। গর্জন করে ভেসে আসছে কালসন্ধ্যা কিন্তু বেহুলা গ্রামীণ Expert House Wife হয়ে সংসারের ডিঙা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথম স্তবকের মধ্যে এরকম একটা চিন্তা কাজ করে। বাংলা দেশের শ্রমজীবী তথা জীবনের উত্তাল পতনের দেখে নারী থেকে বিবর্তিত 'বীরাঙ্গনা'-দের প্রতিনিধি হল এই বেহুলা। আধুনিকতা এবং নাগরিকতা এখানে নেই। কিন্তু প্রান্তিকায়িত জীবনের মহাসংগ্রামের বার্তা আছে। যে সংগ্রাম জীবনের মুখোমুখি হওয়ার শিক্ষা দেয়। প্রান্তিকায়িত ও আঞ্চলিক হয়েও আমরা যেতে পারি সায়ের ঝিয়ারি হয়ে অনন্ত ভাসানে।

"কোথায় নিছনি কোথা চম্পক নগর
সাতনরী শিকা ঝোলে ঘরের ভিতর
কুপিলম্পে রাতকানা নিরক্ষরা বুড়ি
লখা-র মরণে কান্দে আছুড়ি পিছুড়ি
জাল টানা ছেলে আজ রাতে গেছে জলে
রেখো মা মনসা তার সর্বাঙ্গ কুশলে।"

শুধু এখানে সমগ্র বাংলার নিম্নবর্গীয় মানুষের মায়ের মনের কথা ফুটে ওঠেছে। ঘরে এত সম্পত্তি কিন্তু লখিন্দরের মা কোথায় বেঁচে আছে তা-ও বোঝে ওঠতে পাচ্ছে না, নিছনি না চম্পক নগরে। কারণ কুপিলম্পে রাতকানা বৃদ্ধা সে এখন। ছেলের মৃত্যুতে সে আছাড় খেয়ে খেয়ে কাঁদছে। বৃদ্ধ বয়সে তার একমাত্র আশ্রয় ছেলে আজ মারা গেছে। এই মানবিক কারুণ্য তো বাংলার সমগ্র মায়ের। যাদের ছেলে এই লখার মতো চলে গেছে চলে যাচ্ছে দেশভাগের ফলে, ধ্বংসে, যুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতায়, দাঙ্গায়, মন্বন্তরের বিষধর কামড়ে।

মনসামঙ্গলের প্রত্নকথা এখানে এক নয়া মাত্রা পেয়ে যায়। বরাক উপত্যকার ১৯ মের ভয়ানক যন্ত্রণা বিদারক দিনের কথাও স্মরণ করায় কোথাও না কোথাও। বাংলা মায়ের কাছে কবি প্রার্থনা করছেন যেন আমাদেরকে রেখো মা সর্বাঙ্গ কুশলে। একাদশ শহীদের মা সহ কত বৃদ্ধা কেঁদেছে আছাড় খেয়ে খেয়ে। আর প্রার্থনা করেছে বাংলা ভাষা যেন সর্বাঙ্গ কুশলে রাখেন বঙ্গজননী।

বাংলা দেশের নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা যারা জাল টেনে জীবন ধারণ করছে। প্রত্যেকের মা হৃদয়ের গভীর থেকে মনসা দেবীর কাছে প্রার্থনা করে। তার ছেলে যেন থাকে সর্বাঙ্গ কুশলে। নিরক্ষর হলেও তাদের প্রার্থনা নিরক্ষর নয়—জীবনচর্চা চর্যাও। কারণ তারা জীবন চাষ করে করে অভিজ্ঞতা অর্জণ করেছে এবং জীবন গড়েছে। জীবনে কোনও জটিলতা নেই তাই এখানে মায়ামমতা একটু বেশি প্রগাঢ়ও। সেই নির্জন প্রান্তিকায়িত নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা তুলে ধরেছেন কবি এখানে মনসামঙ্গল প্রত্নকথার বিনির্মাণ করে। পরবর্তী স্তবকে বলছেন—

"গাঙের গর্ভিণী সেই গন্ধ ভেসে আসে
শ্রাবণীর দিগম্বরা দখিনা বাতাসে
এখনো বুকের দ্বিজ বংশীদাস কহে
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কালীদহে...

ডহরের ঘোর লাগা গহনের টানে
সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে।”

শ্রাবণ মাসে বাংলার চাষীরা শালিধান রোপণ করে একদিকে আর অন্যদিকে গাঙের গর্ভিণী রূপ জেগে ওঠে। এখানে একদিকে প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা অন্যদিকে নতুন জীবনের অন্বেষণ। এই মনোভাব কাজ করছে। গাঙের ঘোলা জল থেকে পলি বসে ক্ষেতে মাঠে। এই পলিতে গভীর উর্বরতা থাকে যা চাষীর মনে এক আশা সম্ভাবনা জাগায় এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু একটু বেশি জল বা বন্যা হয়ে গেলে তার বিপরীতটাও হয়। মাঠ ঘাট চাষ সব হাহাকারে ভরে ওঠে। কিন্তু তবুও বুকের দ্বিজ বংশীদাস গান গায় এখানে না ওখানে না আরও এগিয়ে যাও আরও এগিয়ে যাও। ‘বলাকা’ কাব্যের নাম কবিতার মতো এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র পাই এখানে। এই এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র নিম্নবর্গীয়, আঞ্চলিক প্রাকৃতজন মানুষের। আর এই ঘোর চক্রের ঘোর লাগা টানে এগিয়ে যায় জীবনের মুখোমুখি হতে প্রাকৃত মানুষের প্রতিনিধি সায়ের ঝিয়ারি অনন্ত ভাসানে।

বেহুলা লখিন্দর সনকা চাঁদসদাগরের কাহিনি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু এখানে সাম্প্রতিক রূপটাই সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে ওঠেছে। গ্রাম বাংলার যেন কোনও এক পরিবার। আর এই জীবনকাহিনি তো সমগ্র বাংলার আবহমানকাল বাংলার প্রতিনিধি। বাংলার লোকসমাজ এক বিশেষ রূপ লাভ করেছে এখানে। এখানে যান্ত্রিক জীবন কৃত্রিম জীবনের কোনও স্পর্শ নেই—সবচেয়ে বড় কথা হল জীবন সংগ্রাম এবং চরৈবেতি।

কবিতাটির আলোচনা শেষ করছি সমালোচকের ভাষায়—

> *“ওই কবিতার তাৎপর্য আরো স্পষ্ট হয় যখন মনে রাখি একে নিছক প্রত্নকথার পুনর্নির্মাণ না-বলে সাংস্কৃতিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার পুনরুত্থাপন বলাই সঙ্গত। অতীতের অনুভূতি বাচনিক কাঠামোয় প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাকে আজকের পরিপ্রেক্ষায় দ্বিবাচনিক সম্পর্কে বুঝি বলে নতুন ধরনের পাঠ তৈরি হচ্ছে।”*[২৭]

ফুল কিংবা মা বিষয়ক কবিতা

বেশি ওজনের কবিতা বা বড় মাপের কবিতা বা কোনও শ্রেষ্ঠ কবিতা-ই প্রত্যেক্ষভাবে কথা বলে না। পরোক্ষভাবে কথা বলে। তাই কথার ভেতরে কেবলই কথা বাড়ে কথা থেকে যায়—অর্থের ভেতরে অর্থ। শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর এই রকম অনেকটা কবিতার মধ্যে একটা কবিতা হল ‘ফুল কিংবা মা বিষয়ক কবিতা’। কবিতাটির শুরু হল এভাবে—

“ফুলকে পুষ্প বলে ডাকার বিলাস শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে
কুসুমের মধ্যে যারা কাঁটা ও কীটের যন্ত্রণায় অস্থির
তাদেরও বর্তমান ডাকনাম এক ধ্বস্ত কবিত্ব
এই মুহূর্তে একটি ফুলকে আমার বড় প্রয়োজন
কিন্তু তাকে কী নামে ডাকব বুঝতে পারি না বলেই
অন্যমনস্কতার মধ্যে পাপড়িগুলি ঝরে পড়ল মাটিতে, পায়ের পাতায়।”

আমরা প্রত্যেকই জানি সময় নদীর মতো বয়ে যায়। আর সময়ের এই চঞ্চলতার সাথে মানুষ এবং মানুষের জীবনও পরিষ্কার হতে থাকে। মানুষ জটিলতর জীবনধারা থেকে সরল সহজ হয়ে বাঁচতে চায়। যেখানে সময় সবচেয়ে কম লাগে। অর্থাৎ কম সময় ব্যয় করে অধিক কিছু হয় বা পাওয়া যায়। কঠিন জটিল ভাষা থেকে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য তাই। আর এটা সহজ করেছে বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির জন্য। যদিও তার ফাঁকে মানুষ ও তার জীবন জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে আরও।

সেই সব কারণে কবি বলছেন ফুলকে পুষ্প বলে ডাকার বিলাস শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সময় পুষ্পকে ছেড়ে

এসে ফুলে পৌঁছেছে। ফুলকে ছেড়ে যারা আজও কুসুম নিয়ে ব্যস্ত তারা আজ কীট আর কাঁটার যন্ত্রণায় ভোগছেন। অর্থাৎ সময় থেকে তারা পিছিয়ে আছেন পুরাতন চিন্তাধারা জীবনধারাকে নিয়ে। আর আজকের সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পরছে না—প্রতি পদে হোচট খাচ্ছে।

কিন্তু কবি বলছেন এই মুহূর্তে তাঁর একটি ফুলের বড় প্রয়োজন। ফুল ভালোবাসা প্রেম অর্থাৎ সম্পর্কের প্রতীক। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না যে কোন সম্পর্কে তাকে গ্রহণ করবেন। এই সব ভাবতে ভাবতে ফুলের সব পাপড়ি ঝড়ে পড়ল পায়ের পাতায়। অর্থাৎ তিনি এইসব সম্পর্ককে বুঝতে বুঝতে সম্পর্কও হারিয়ে গেছে। কারণ জীবনের ভাঙাগড়ায় তিনি গভীরভাবে দেখেছেন কত রকম সম্পর্ক গড়েছে আবার ভেঙেছে। যা আজ পড়ে যাওয়া পাপড়ির মত। সময়ের ঢেউয়ে আঘাতে কত রঙ দেখেছেন তার কথা বলছেন তিনি এখানে।

''মা-কে কোনোদিনই জননী বলে ডাকিনি
সে লেখা আছে বই-এর পাতায়, নয়তো,
মদমত্ত তান্ত্রিকের কর্কশ উচ্চারণে
জনন কথাটির মধ্যে যে যৌন সর্বগ্রাসিতা
তাকে শিথিল লাজুক মুঠিতে শাসন করতে করতেই
কখন যে একদিন
মায়ের শরীরের লালপাড় শাদা থান হয়ে গেছে
লক্ষ করিনি।"

উপরের স্তবকের মধ্যে একটা যৌনগন্ধ ভাব আছে। কবি বলেছেন যে মা-কে কোনদিন জননী বলে ডাকেননি। তা শুধু বইয়ের পাতায় লেখা আছে। অথবা মদ্যপ তান্ত্রিকের গদগদ কণ্ঠে কর্কশ উচ্চারণে জনন ভাবটির যৌন সর্বগ্রাসিতা আছে। তাকে মা লাজুক মুঠিতে শাসন করতে করতেই কখন যে মায়ের শরীরের আবরণ সাদা হয়ে গেছে কবি বুঝতেই পারেননি।

সময় বড় তাড়াতাড়ি বদলে যায়। এটাই তাঁর ধর্ম। আর এই বদলে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে মানুষের চিন্তাও বদলায়—বদলাতে বাধ্য। কারণ সময়ের স্পর্শ আঘাত লেগেছে এখানে। তবুও এমন অনেক জিনিস আছে যা কোনদিনই বলদায় না তার আসল বা মূল। এরকম একটা বিষয় হল সমাজে নারীর অবস্থা। কবিও গভীরভাবে দেখেছেন মা-র সারাজীবন ধরে মেনে নেওয়া শোষণ শাসন। মা সারাজীবন কিভাবে শোষিত হয়েছেন। শুধু তাঁর মা নয় সকল মায়েরা। আর একদিন এই যৌনগন্ধ শাসন শেষ হয়ে গেলেই মা সাদা আবরণে অন্য রূপ লাভ করে নিয়েছে। কবি নিজেই লক্ষ্য করেননি।

সমাজ যেভাবে নারীর আদল নির্মাণ করেছে। তার মধ্যেই কবির মা পড়েন। এবং কবির মা সকল মায়ের প্রতিনিধি রূপে ফুটে ওঠেছেন এখানে। চিরদিন থেকে মায়ের এভাবে সমাজের এই সকল শোষণ মেনে নিয়ে রঙিন থেকে সাদা কাপড়ের মানুষ হয়ে যায়। আর যখন সাদা বস্ত্র পরিধান করে নেয় সমাজের ইন্দ্রজালে যাতাকলের প্রতাপে। তখন তারা অন্যরকম জীবন যাপন করে সমাজ ধর্মের মর্জি মতো। অর্থাৎ সমাজ ধর্মের ঠিকাদারদের মন্ত্রসুত্রানুসারে। এটাই বাংলার তথা সমগ্র ভারতবাসীর মায়ের রূপ। এই গভীর কথাগুলি দেখাতে চেয়েছেন কবি এখানে।

''নিজের দুঃখের কথা সাতকাহন করে আর কত বলব
বরং আজ বড় প্রাচীন ভোরবেলার চোখ নিয়ে
চেয়ে দেখলুম
কচি পাতার আড়ালে দাঁড়িয়ে মা আমার
শিশিরের গায়ের চাদরে
শাদা ফুলের নক্‌শা এঁকে দিচ্ছেন।"

সামন্ততান্ত্রিক ইন্দ্রজালের ভেতরে আমাদের জীবন আজও লালিত আশ্রিতও। সেই সব শোষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই কবি শেষ স্তবকে বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে তিনি আর কত বলবেন নিজের দুঃখের কথা। নিজের দুঃখের কথা সাতকাহন করে আর বলতে চান না তিনি। বরং অনেক অতীতের চিন্তাধারা দিয়ে দেখলেন নতুন জীবনের নতুন প্রজন্মের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মা সাদা ফুলের ছবি আঁকছেন। অর্থাৎ নতুন প্রজন্মকে বলছেন তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা।

মা তো প্রকৃতির আরেক নাম, রূপ। তাই কবি শেষপর্যন্ত মা-কে প্রকৃতির মধ্যেই আশ্রয় দিয়েছেন। নগর জীবনের জটিলতা যান্ত্রিকতা নেই। তবে প্রান্তিকায়িত জীবনের আঞ্চলিক রূপকে বিশেষভাবে রূপ দান করেছেন। এই রূপ মানুষের জীবনের ছবি। যেখানে মায়ের জীবনের শোষণ যন্ত্রণা অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারায় পালিত জীবনের ছবি এঁকেছেন কবি। এই কবিতার মধ্যে ফুল আর মা-র মধ্যে তুলনা করে তাদের বিবর্তিত রূপ তুলে দেখিয়েছেন সময় কীরকমভাবে পরিবর্তন হয় বা হয়েছে।

শক্তিপদর কবিতার নিবিড় পাঠে একটা জিনিস খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তাঁর কবিতায় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্তা আছে তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে। এই ব্যক্তি কিন্তু সামাজিক এবং সমাজ বাস্তবতা বা সমাজ সচেতন। এই কবিতাটিও তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একদিকে ব্যক্তির সমাজবোধ অন্যদিকে সমাজের পরিবর্তন এই সংযোগ সচেতনতার সঙ্গে উপলব্ধি করা যায় এখানে। ব্যক্তি ও সমাজের সমান তালে পরিবর্তন—কোথাও উঁচু নিঁচু, কোথাও আঁকাবাঁকা, কোথাও পুরাতন নতুনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব। এই চিন্তাচেতনার বহুস্বরিক ও অনেকার্তদ্যোতনা পাওয়া যায়। এবং আমাদের অনেক দিনের পথ পথহাঁটা, শব্দ শব্দবোধ অর্থবোধ কীভাবে নতুন শব্দে অর্থে সংজ্ঞায় সময়ের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে তারও একটা আভাস পাওয়া যায় এই কবিতা পাঠে।

হে কবিতা ক্ষমা করো

> *''কবি শক্তিপদ জীবনচর্চা ও জীবনচর্যায় নির্লিপ্ত উদাসীন, নিরাসক্ত ও আত্মনিয়ন্ত্রিত। তাই তাঁর কবিতাও স্মৃতিকাতরতা, ঐতিহ্যপ্রিয়তা, বিষাদময়তা এবং চিত্রকল্পের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আধুনিকতার তারসপ্তকে বাঁধা।''*[২৮]

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতা চর্চা করতে গিয়ে সমালোচক এই কথাগুলি বলেছেন। সমালোচকের এই কথাগুলি মনে হয় সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য কবির সুদীর্ঘ আত্মজীবনীমূলক মহাকাব্যিক অনুষঙ্গে রচিত 'হে কবিতা ক্ষমা করো' কবিতাটি পর্যালোচনায়।

এই কবিতায় কবি তাঁর জীবনদর্শণকে খুব বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন জীবন অভিজ্ঞতার নির্যাস দিয়ে। কবিতাটির শুরু এভাবে—

> ''মনে হয় সুখে আছি মনে হয় সুখে বেঁচে নেই
> বেঁচে থেকে সুখ আছে বেঁচে থেকে সুখের অভাবে মরে গেছি
> আমার ঈশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরমাত্মা নেই
> স্বর্গ ও নরক নেই, পুনরায় ফিরে আসা নেই
> জন্মে গেছি এই সত্য, মরে গেলে ঘাসে ও মাটিতে
> জলে ও বায়ুতে আমি মিশে যাব, এর বেশি অভিপ্রায় নেই।''

জীবনের বারবার ভাঙাগড়া, উত্থান পতন, উন্নতি অবনতি ইত্যাদি কবি দেখেছেন বারবার। সব কিছু দেখে জীবনের নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এবং বুঝেছেন এই পৃথিবীর শেকড় বাকড় কি রকম করে আকড়ে ধরে আছে সমস্ত

সংসারকে। মানুষের জীবনবন্দনাই হল যার মূল উদ্দেশ্য।

জীবনের থেকে পাওয়া না পাওয়া, হারানোর পাল্লা দিয়ে বিচার করে বলছেন যে তিনি বেঁচে আছেন কিন্তু সুখে না দুঃখে বুঝতেই পাচ্ছেন না। আবার কখনও ভাবছেন বেঁচে থেকে সুখ পাচ্ছেন আবার কখনও ভাবছেন বেঁচে আছেন সুখের অভাবে মরে মরে। সব কিছু খুঁজে তিনি এখানে ঈশ্বরকে পান না। আত্মা পরমাত্মাও নেই। স্বর্গ নরকেও তিনি ঈশ্বরের মতো বিশ্বাস করেননি। অর্থাৎ বিশ্বাস করতে পাচ্ছেন না আর আজ। কারণ সময় তাকে আজ এখানে রেখেছে। আজ তিনি বিশ্বাস করেন 'জন্মে গেছি মরে যাব ঘাসে মাটিতে মিশে যাব একদিন'। এর চেয়ে বেশি তিনি আশা করেননি। কারণ তিনি খুব ভালো করে জানেন আজকের পৃথিবীর মানুষেরা কীরকম করে বেঁচে আছে।

আসলে কবিকে জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আর সময়ের ভাঙাগড়া আজ এত যুক্তিবাদী প্রগতিশীল করে তুলেছে। তিনি আজ সবচেয়ে বেশি বাস্তবতাবাদী ব্যক্তিত্ব। তাই তিনি যেভাবে আজ বেঁচে আছেন তার কথাই ব্যক্ত করছেন এই কবিতায়। তারপর কবি বলছেন—

''তোমাদের জন্য থাক বাসংসি জার্মাণি, ভয়, অমৃতের ভিক্ষাপাত্র, আর
অক্ষম ক্ষমতা-মোহ সক্ষমের চিৎকৃত ধিক্কার
তোমাদের জন্য থাক স্বর্ণলঙ্কা, আরব্য রজনী আর হেলেনের ট্রয়
সীতার উদ্ধার কিংবা প্রত্নের গভীর তত্ত্বে প্রোথিত সময়
তোমাদের জন্য থাক সুস্বপ্ন সম্ভব স্মৃতি কিংবা ইচ্ছা সুদূরপরাহত
আমি সিসিফাস, তবু ক্লান্ত নই প্রভুর ইচ্ছার কাছে পরাভূত নই
অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ কোনো আত্মা নয়, অনাত্মীয় একটি জীবন
ভুলিয়ে ভালিয়ে রেখে একদিন গলা টিপে ধরুক সবলে
এর চেয়ে আর কোনো গূঢ় মূঢ় দর্শনের প্রত্যাশীও নই
কবচে পাথরে ক্লিষ্ট কবিত্বের দ্রোহ থেকে দূরে
নিজেকে রেখেছি
অলৌকিক লোকনৃত্যে আমার চরণ থাকে চিরকাল স্থির
নিজেকে দেখেছি
উদাসী বাউল এসে মাঝে মাঝে ঘর নষ্ট করে দিয়ে যায়
এই স্থির জানি
তোমাদের জন্য থাক রাতুল চরণ-চিহ্ন, চর্ব্য-চোষা, আমি পেয়ে গেছি
ভিক্ষার আমানি
মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ে ম্লান মেঘ শূকরের মতো জেদী প্রিয় অহঙ্কার
আকাশে অনন্ত রাত্রি বিছিয়ে রেখেছি দেখি সাতনরী হার
বিস্ময়ের কণ্ঠ ছিঁড়ে পেয়ে গেছি মানুষের জয়
মানুষ আমার ভাই, শত্রু সে-ও ...''

বিবরণধর্মী এই কবিতায় নিজের জীবনের কথাই বর্ণনা দিচ্ছেন সরল গদ্যছন্দে। পৃথিবীর মানুষের উদ্দেশ্যে বলছেন কবি যে তোমার জন্য থাকুক সকল ভয়, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষমতার লড়াইয়ের জীবনকাহিনি। আর সকল সুখ সুস্বপ্ন স্মৃতি ইত্যাদি। কিন্তু কবি এই সব নিয়েই বসে থাকতে চাননি। এই সবের জয় গৌরব ইত্যাদি কবিকে দূর্বল করে দেয়। তাই তিনি সিসিফাসের মতো জীবন সংগ্রাম করে যেতে চান। স্বর্গ নরকের ঈশ্বরের বিবাদে যেতে চাননি তিনি। গীতার বাণী কর্মতেই তিনি বিশ্বাস করেন। এর চেয়ে বড় কোনও দর্শণের প্রত্যাশীও নন তিন। এই যে জীবনবোধ এটাতো আধুনিকতার চরম রূপ। প্রচলিত সকল চিন্তা রীতিনীতির মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়ে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক জীববোধে বিশ্বাসী তিনি—সমস্ত সম্পর্কের ওপরে উঠে।

সময়ের দাবি নির্দেশ কেউ অস্বীকার করতে পারে না—পারবেও না কখনও কোনদিন। কবিও পারেননি। তাই নিজের জীবনকে বারবার ভেঙে গড়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন নিজের প্রতিভার দ্বারা। আর একটা অলৌকিক নাচ কবির পায়ে থাকে। এই পথ হাঁটা তো জীবনের সন্ধান। নতুন জীবনের পদধ্বনি। আর সে জন্যই মাঝে মাঝে কবির ভেতরে আলোড়ন সৃষ্টি করে এক 'উদাসী বাউল'। এই উদাসী বাউল কিন্তু কবিরই অন্তর্সত্তা। বাইরের জটিল যান্ত্রিক জীবনের অনুশীলন না করে ফিরে যেতে চান আধ্যাত্মিক সত্তার কাছে। যেখানে দুদণ্ড শান্তি পাওয়া যায়। উশৃংঙ্খল নাগরিক জীবনের মানুষের জন্য বিলাসীতা, ভোগ, কামনা, চর্ব্য-চোষ্য ইত্যাদি। এই যে জীবনচর্চা তার একদিকে প্রাকৃতজীবন অন্যদিকে নাগরিক জীবন এই দুইয়ের টানাপোড়েনে চালিত। কিন্তু কবি চান অশান্তির জীবন থেকে দূরে সরে নির্জনে নিজেকে নিয়ে বাঁচতে। তবুও সবকিছুর ওপরে গিয়ে খুঁজে পান মানুষের জয়। যে মানুষ কবির ভাই, প্রিয়, আত্মীয় এবং তার বিপরীতে আবার শত্রুও। এই দুইয়ের বৈচিত্র্যময় সম্পর্ক সম্বন্ধের দ্বারা আমাদের জীবন চালিত। জীবনের একটা সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায় এখানে। এই রূপটার নক্সা দিয়ে আমাদের জীবনও কী বিচার করা যায় না?

'' মানুষটা এই রকম
গোড়া থেকেই পাঁক-পাণী ধূলোবালির মধ্যে জীবন
এখনও ঘোলা জল দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে
ঈশ্বর জানেন, জলের বুকে কোনো মালিন্য নেই
শরীরের কোন্ গহ্বরে জানি না রোদ পোহাচ্ছে কয়েকটি মুখ
একজন ভিখিরি, একটি পাগলি ও স্বপ্নে পাওয়া একটি চোর
ওরা তিনজনেই আমায় শিখিয়ে রেখেছে
ভয়ের আরেক নাম ভালবাসা
ভিতরে ভিতরে গুমরে কাঁদে ভরা ভাদ্রের যুবতী বিবিয়ানা
পাটখেতের সবুত বলিহারি, ডহরের ঘোর-লাগা টান
গায়ে খুস্কি হাটুরে মানুষ
মাঝে মাঝে নদীর চরে পড়ে থাকে মাটির ভাঙা কলসী
আর গরীবের নেংটির মতো ধ্বজ-পতাকার নিঃশব্দ হাহাকার
আর তখনি কলজে ছিঁড়ে গেয়ে উঠত কাঙাল হরিনাথ
হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল...''

মানুষের অভ্যাসজনিত কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তার অনুশীলনের অবস্থানটা যদি কোথাও ফিরে পায়। তবে উৎলে উঠে তা। কবিও প্রাকৃত জীবন লোকজীবনে বড় হয়েছেন পাঁক পানী ধূলোবালির মধ্যে জীবন ও বড় হওয়ার কথা বলছেন। প্রথম স্তবকে বলেছেন তাঁর কোনও ঈশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরমাত্মা নেই, স্বর্গনরকও নেই পূর্বজন্মেও বিশ্বাসী নন তিনি। কিন্তু এই স্তবকে বলছেন যে ঈশ্বর জানেন জলের মধ্যে কোনও কালিমা মালিণ্য নেই। এই যে দ্বৈত সত্তা। এটা আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্য। এবং এই বৈশিষ্ট্যে গড়ে ওঠা কবির ভেতরের সত্তা কোথাও ভিখিরি, কোথাও পাগল, কোথাওবা স্বপ্নে পাওয়া চোর। এই তিন রকম সত্তা কবিকে গড়ে তুলেছে। এবং শিখিয়েছে 'ভয়ের আরেক নাম ভালোবাসা'। কবির জন্মভূমি সোনাইত্তা গ্রামের পথহাঁটার সঙ্গিনী আজও তাঁর বুকে কাঁদে গুমরে গুমরে সেই ভরা ভাদ্রের যুবতীর মতো সুন্দর নদী বিরিয়ানা। এখানে মনে পড়ে মধুসূদন দত্তের 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটির কথা। মধুসূদনের মতো তিনিও একদেশ ছেড়ে অন্য দেশে এসেছিল। যদিও মধুসূদন বিদেশে অন্য কারণে গেছিলেন। কিন্তু শক্তিপদ একেবারে চিরতরে সব ছেড়ে চলে এসেছিলেন। তাই তাঁর বিবিয়ানা নদীর কান্নাটাও কম হৃদয়বিদারক নয়।

কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখা দরকার যে এই পথহাঁটা নদীর অনুষঙ্গ ইত্যাদি কিন্তু কবির নিজের জীবনের এক একটা বাঁক পথচলা। কোথায় কী পেয়েছিলেন? কী রকম হেঁটেছিলেন? পাটখেত, ডহর, হাটুরে মানুষ, ভাঙা কলসী

এগুলি তো কবির জীবনে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল একদিন। তাই অতীত থেকে খুঁড়ে এনে সেই সবকিছু আজকের জীবনের সঙ্গে ওজন করছেন যে সময় কোথায় আজ! এই যে আত্মজীবনী তা কবির একেবারে নিজস্ব—একান্ত ব্যক্তিগত। এবং এই একান্ত ব্যক্তিগত জীবনকাহিনি বাংলার অসংখ্য মানুষেরও। কারণ এই জীবনবোধ চর্চা চর্যা পথহাঁটা তো বাংলারই। তাই পরবর্তী স্তবকে কবি বর্ণনাকে আরও সহজ সরল করে প্রকাশ করেছেন—

''সাদা মার্কিনের থান কেটে আমাদের ফতুয়া বানিয়ে দিত কার্তিক দরজি
এক বাঁক ঘুরে গেলেই রবি বিষ্ণুদের যে রমরমা বাজার
তার মনোহারি দোকানে নানা রঙের রবীন্দ্রনাথের মতো রঞ্জক সাবান
লোহার কড়ায়ের বারোয়ারি সেদ্ধ জলে মাঝে মাঝে
আদি-সাম্যবাদী প্রথায় আমাদের সমবেত পোশাক রঙিন হয়ে উঠত
বড় গাঙের পারের মানুষ আমরা
পঁয়ত্রিশ বছর আগেও আমাদের তার চেয়ে বেশি বিলাসিতা ছিল না
কিংবদন্তীর গোবর্ধনের বটগাছের তলায়
অঘ্রাণ-পৌষের বিক্ষত-হৃদয়, মানে গোক্ষুর চিহ্নিত গোচারণ ভূমিতে
আমাদের জাম্বুরা, মানে বাতাবিলেবুর অনায়াস ফুটবল
এদিকে ওদিকে অবলীলায় দশ-বিশটা 'গোল' করে বসত
ব্রজেন্দ্রর ঠাকুর জ্যাঠা, আমাদের পাড়াতুতো রজনীদাদী
যখন তখন রৈ রৈ করে খেলার মাঠে শাসিয়ে যেত
আমাদের নজির বিহীন দৌরাত্ম্যে
গরুর মুখে তোলার মতো ঘাস থাকছে না''

এখানে অতীতের কথা ভাবছেন স্ববিস্ময়ে। একেবারে মুক্ত স্বাধীন জীবনের কথা, যেখানে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই একমাত্র প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া। বারোয়ারি জীবনের সাম্যবাদকে মনে করছেন, যেখানে সবাই মনুষ্যত্বকে সবার উপরে রাখত—তার গুণ ওজন মর্যাদা অনুযায়ী। যদিও বাজারে বিজ্ঞাপনের জাদুতে অনেক কিছু চলে যেত গভীর অনায়াসে। কবি তা ভাবছেন পয়ত্রিশ বছর পরে। এই এত আগে কবির এই রকম বিলসীতা, সাধ ছিল—আজকেও তা রয়ে গেছে। বড় বটগাছের নিচে বসা, গোচারণ ভূমিতে বাতাবি লেবুর ফুটবল খেলা, ইত্যাদি তো একেবারে প্রান্তিকায়িত লোকজীবনের উপকরণ। পাড়ার রজনীদাদীর শাসন, তাঁর অবাক লাগছে আজ যে জীবন এত মাটির কাছাকাছি ছিল তা আজ কোথায়। সময় কী রকম করে বদলে যাচ্ছে তার দুই পার ভেঙে গড়ে—গড়ে ভেঙে। এটার একটা বড় ইঙ্গিত পাচ্ছি কিন্তু এখানে ভেতরে ভেতরে।

কিন্তু একটা জিনিস, এই পরিবর্তন কবিকে গবীরভাবে আলোড়িত করেছে। আজ যা মনে হয় 'এই তো কাল' তার ভেতরে লক্ষকোটি সংকেতের পরিবর্তন হয়ে যায় মানুষ এত সহজে বুঝে না—বুঝে ওঠতে পারে। এখানে অভ্যাসজনিত একটা ব্যাপার লুকিয়ে থাকে। যা পূর্বসূরীর পদধ্বনি এত সহজে ভুলে যেতে দেয় না। কবিও এই কথা বলছেন অন্যরকম করে। আমাদের অতীতই তো বর্তমানকে নির্মাণ করে। মানুষের শৈশব-কৈশোর যৌবনের স্মৃতিও বড় হয়ে ওঠছে এখানে অন্যদিকে। এখানে কী নিজেকে পাই না আমরা!

প্রচলিত জীবনধারার একটা বিবরণ পাচ্ছি কিন্তু এখানে। যে জীবন সহজ সরল প্রাকৃত লোকজীবনের উপাদানে ভরপূর। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির হারিয়ে যাওয়ার একটা মর্মান্তিক বেদনাও আছে। কিন্তু এই ব্যথা থেকে স্মৃতিমধুরতা বড় হয়ে ওঠেছে এই কবিতায়। এটা কী কম বড় বাস্তবতা! যেখানে মুখোশ নেই—আছে আসল মুখ।

''ক্ষেত্রমাস্টারের জালিবেতের আস্ফালনে আমরা যথারীতি ইস্কুল কামাই
আম-কাঁঠালের গন্ধের না-পড়া ফুলের মালার দিনে
আমাদের শতকরা একশভাগ 'উপস্থিত স্যার'-এর পরেই

ঘোলা জলের ডোবায় ঝাঁপ
আমাদের জ্বর হলে
মাথার চুলে গরম কচুপাতা ঘষে দিতেন ঠাকুমা
আমাদের পা মচকালে আখ্‌ড়ার বোষ্টমী দিদির রহস্যময় জড়িবুঁটি ফুঁ
গা-ছমছম ওলাউঠার দিনে
হাহাকারের মতো নগর-সংকীর্তন ও রক্ষাকালী
আমাদের জাতের দেমাক, জাতির রজ্জাতি সব, সবকিছু নিয়েই আমরা
আমাদের সময়ে যে বুড়ো ছিল সে এখন ঘাস
আমাদের সময়ে যে রাজা ছিল সে এখন ফকির
আমাদের সময়ে যে নৌকা ঠেলত তার নাতি এখন
পান-সিগারেটের দোকানী
আমাদের সময়ে যে ছোট ছিল সে এখন বড়
আমাদের সময়ে যে ছিলই না সে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে
সেই সময়ের আগের সময়ের কথা শোনা আছে পণ্ডিতের শাস্ত্রগ্রন্থে
মানুষ যখন ছিলই না সেই সময়কেও জেনে ফেলেছে মানুষ
আমরা সেদিনের ছেলে ছোকরারা
কেমন সামন্ততান্ত্রিক ধুলোবালি গায়ে মেখে
পুঁজিবাদের জলসাঘরে নাচ দেখতে লেগে গেছি
আমরা সকল রহস্যের দ্রৌপদীর শাড়ি আলগা করে দিয়েছি এখন
আমরা অনেক দুরারোগা ব্যাধির উৎস জেনে ফেলেছি
জেনে নিয়েছি নারী-পুরুষ, কামনা বাসনা, যুদ্ধ এবং শান্তি
আমরা এখন অনেক সাবালক হয়ে গেছি”

সময়ের টানাপোড়েন ও বিবর্তনে সব সময় জীবন সমৃদ্ধ হয়। আর এই পরিবর্তন বিবর্তনকে যারা অনুভব উপলব্ধি করতে পারেন তারা জীবনের স্বাদ পান খুব গভীরভাবে। কড়া শাসনে কবির শৈশব কেটেছে। এত শতর্কতা পরেও কত যে ছোটখাট দুষ্টুমি করতেন তা ভাবছেন। এবং এই সব কর্মের ফলে যে সব রোগ ব্যাধি হত সব গ্রামের কবিরাজি আর ঘষামাজা ফুৎকারে ভালো হত। এই বিশ্বাস ছিল। ওলাওঠার দিনে শীতলী মায়ের রক্ষাকালীর নাম সংকীর্তন করতেন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে সংস্কার কুসংস্কার আচ্ছন্ন জীবনধারায় লালিত ছিল সেই সময়। যখন যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা পৌঁছায়নি। কবি বলছেন সব মিলিয়ে নিয়েই আমরা।

কিন্তু কবি এখন যে সময়ে আছেন সেখানে সেই পুরোনো সময়ের কথা বলে একটু অন্য ধরনের মেজাজ পান। তুলনা করে দেখছেন যে সময় কত দ্রুত কত তাড়াতাড়ি রূপ বদলায় বাঁক নেয়। কবির সময়ে যে রাজা ছিল সে আজ ফকির, যে বুড়ো ছিল সে মাটিতে মিলে গেছে। যারা নৌকা ঠেলত তারা ব্যবসায়ী। এইভাবে সময় আমাদের পরিবর্তন করে আজ এখানে এসে পৌঁছিয়েছে। এখানে আসার আগে কবি দেখেছেন বিশ্বযুদ্ধ, নারীপুরুষের সম্পর্ক কত যুদ্ধ ভাঙাগড়া। এই সব অভিজ্ঞতা লাভ করে করে আজ আমরা অনেক সাবালক হয়েছি। অর্থাৎ এই সময় ও জীবন লাভ করতে আমাদের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সময়ের যুদ্ধ যন্ত্রণা ধ্বংস পতন ইত্যাদি পার হয়ে আসতে হয়েছে আমাদের। এখন সময় জটিল মানুষ আরও জটিল। কারণ সময় আর পৃথিবীর মানুষই আমাদেরকে এরকম করেছে আজ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুগে সময়ের এই জটিল রূপকে তুলে ধরেছেন এখানে।

‘‘তবু মাঝে মাঝে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে দিয়ে
চিৎকার করে ওঠে এক দামাল
আমাদের সকল বসন্তকে ঢেকে দিয়ে যায় এক বিষণ্ণ শীতকাল
এক ভূতুড়ে সন্ধ্যার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে

আমরা টের পাই
আমাদের গলায় এক স্নেষ্মাপিণ্ড আটকে আছে
তখন ভরা ভাদ্রমাস
ইংরাজি 'ইউ' অক্ষরের মতো নদীর দীঘল বাঁককে
সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে আলীপুরের ঢালা
ঢালা মানে খাল
তবে শান্ত নয়, ভীষণ গোঁয়ার মস্তান স্বভাব
কয়েক লক্ষ বায়েনের হাতে খোলে বোল তোলার শব্দ করে
দু-পায়ের সবুজ পাটখেতের মাথা কাঁপিয়ে
ছুটছে গতরে যৌবনের ঢল-নামা জোয়ান
এই দ্যাখো, করিমপুরের মাহ্জন বাড়ির ছোট রায়
জামার গাঁও-এর ইরফান আলি
কৈ-খাইয়ের পুটু মিঞা
ইলিমপুরের কর্তার বাড়ির দেড় মালাই
তাবৎ নৌকা ঠেলে পাড়ি দিচ্ছে নদী
কান পাতলেই শুনতে পাবে পাশাপাশি নৌকায়
ভাব-ভালোবাসার গল্প জমে উঠেছে"

সময়ের এই বাঁক পরিবর্তন তো পৃথিবীর পরিবর্তন—সময় সমাজ মানুষের চিন্তাচেতনার বাঁক। এবং এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি নিজের জীবনের পথ পথচলা ইত্যাদিকে সুগভীরভাবে তুলে ধরেছেন। আজ কবি সাবালক হয়ে গেছেন তবুও তাঁর পৃথিবীকে কাঁপিয়ে চিৎকার করে ওঠে দামাল। অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক নেতিবাচক সকল দিক। আর কবির সঙ্গে অনেকের সকল বসন্ত অর্থাৎ যৌবন ঢেকে নিচ্ছে এই ধ্বংসাত্মক অন্ধকার। অন্ধকারে ঘেরা সন্ধ্যার দিকে ঝুঁকে গেছি। তাই আমরাও কিছুই জানি না। অর্থাৎ অবক্ষয়ী আধুনিকতার দ্বারা চালিত জীবনবোধ জীবনচর্চা শৈলী অর্জন করে করে আজ আমরা 'ভুতুড়ে সন্ধ্যার' পথযাত্রী হয়ে গেছি। তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারি না—গলা বসে গেছে সেদিকে। এবং কবির বয়স অনেকটা হয়ে গেছে আর কবির এই সময়টা একেবারে ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের মতো বাঁক ফিরিয়েছে। যে সব জায়গায় কবির পথহাঁটা হয়েছে আজ সেই সব বাঁক বেয়ে সময় ঝরে যাচ্ছে বড় দ্রুত। আলীপুর, করিমপুর, ইলিমপুর প্রভৃতি অঞ্চল মাটির থেকে সংকেত কিন্তু। আমরাও কী এরকম পথ হাঁটি নাই! আমাদের কারুর কেউ ঝরে যায়নি মাটির পথ বেয়ে—নদীর স্রোত বেয়ে! এবং সবকিছু বা সব রকম জীবনের অঞ্চলের মধ্যে একটা সুগভীর সংগতি আছে—ভাব ভালোবাসার গল্পও।

কিন্তু একটা জিনিস মনে রখা প্রয়োজন কবি নিজের জীবন ইতিহাসকে নতুন করে বিচার করেছেন 'নব্য ইতিহাস' চেতনায়। ভাটিয়ালী সময়ে কবির মনে পড়ছে নদী, অঞ্চল, পথ পথহাঁটা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে কবি কীরকমভাবে হেঁটেছিলেন নিজের অবস্থানসহ। এবং এই পরিসরের আকার আর স্থান বদল কীভাবে হয়েছিল তারও কথা পাচ্ছি কিন্তু এই জিনিসটা এক দিকে ঐতিহ্য ও পরম্পরা অন্যদিকে ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার পথচলার মধ্য দিয়ে গ্রহণ বর্জনের কথকতাও।

তারপর কবি আঞ্চলিক ভাষাকে আরও স্পষ্টভাবে প্রয়োগ করলেন পরবর্তী স্তবকে। অন্তর্বয়নের গভীরে কীভাবে বহুস্বরিকতা লুকিয়ে থাকে তার রহস্যময়তাসহ তার আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেছে কবির প্রগাঢ় উচ্চারণে—

"রমণদাসের গাভীন গাইটা শেষ পর্যন্ত বেইচাই ফ্যালাইল
তোমার ছোট পোলাটা নাকি বড় ইশ্কুল পাশ করল বাঃ বাঃ
তার বেশি কথা নেই, তার বেশি আকাঙ্ক্ষা নেই

ততক্ষণে গাঙের পুরো বাঁক শেষ
কয়েক মিনিট ভাঁটিতে ভাসলেই
সাপ্তাহিক তীর্থ, ইনাথগঞ্জের বাজার
দু-আনার কলা, ছ-পয়সার পান আর বড়জোর এক সিকির মাছ
তার বেশি সওদা বড় একটা করে না কেউ
কিন্তুক, না দেখলে পেত্যয় যাবে না
তার জন্য অ্যাত্তো, মানে অ্যাতো অ্যাতো নাও-নৌকা
তার দশগুণ সওয়ার মনিষ্যি
হা-আ-আ-আ-আ-ম্
স্মৃতির বাত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে এই 'হাম' শব্দটি
ওঙ্কারের মতো কানে বাজতে থাকে
অকুস্থলে পৌঁছে দ্যাখো
নিচে নৌকাগুলিকে পায়ে বেঁধে
হাজার হাজার মাটিতে পোঁতা লগি
সন্দিগ্ধমনা কুঁচুটের মতো গলা টান করে
হাটুরে মনিষ্যিগুলির উপর নজর রাখছে"

উপভাষা আশ্রিত এই কবিতায় কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর জীবন দর্শন তথা এই অঞ্চলের জীবনধারা জীবনচর্চা চর্যা এক জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। গৃহস্থী জীবনের টানাপোড়েন অভাব জীবনযন্ত্রণা সব মিলিয়েই এই কবিতা।

রমন দাস তার গর্ভবতী গাভীটি আর রাখতে পারেনি সংসারের অভাব অনটনে। বরাক উপত্যকা তখনও বাজারে গঞ্জে শাহরিক জীবন গড়ে ওঠেনি। টাকাপয়সা কম ছিল। রোজগারের পথ ছিল না। তাই রমন দাসেরা ছেলেমেয়েকে পড়ানোর জন্য গর্ভবতী গাভীও বিক্রি করে দিতেন। সংসারের কর্তব্যে তারা বদ্ধ। আর আরেকটা জিনিস একান্নবর্তী পরিবারের মানুষ সব সময় সবকে নিয়ে চিন্তা করে। তাই এখানে ভালোবাসা স্নেহ শ্রদ্ধা একটু বেশি থাকে। এই সব জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে পারেনি।

কিন্তু শক্তিপদর কবিতায় আরেকটা জিনিস বিশেষ করে বারবার উচ্চারণ হয়—ফিরে ফিরে আসে কলমের মুখে। তা হল নদী। এই নদী যতখানি সময়ের প্রতীক, জীবনের প্রতীক তার চেয়ে বেশি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা। কারণ নদীমাতৃক বাংলাদেশে কবির জন্ম। তাই তিনি বারবার নদী, নৌকা, নাও, লগি, জাল ইত্যাদি অনুষঙ্গ কবিতায় ব্যবহার করেছেন। তবে স্বাধীনতার পরে শ্রীহট্টসহ অনেক জায়গায় প্রথম নাগরিকতা এসে গেছে— বরাক উপত্যকায়ও। তাই কৃষিচিন্তা কৃষিশ্রম কমে যাচ্ছে দিন দিন। কারণ 'ততক্ষণে গাঙের পুরো বাঁক' বদলে যায়। এতদিন পরের চিন্তাধারায় মানুষ চলেছে চিন্তা করছে ভাবছে আজ তারা (সাধারণ মানুষেরা) বুঝছে তাই সন্ন্যাসীদেরকে সন্দেহ করে নিজের মাথায় চিন্তা করছে। অর্থাৎ মানুষ অনেকটা উন্নতি করেছে তাদের নিজস্ব জীবনবোধ, জীবনচেতনা, জীবনধারায়।

"এখন ভরা ভাদ্র মাস
প্রথম কৈশোরের খানা খন্দে মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে
এক একটা নদী এমন বেয়াড়া রকমের
বাঁক দেখলেই ইচ্ছে করে পাড়ি দেই
আর পাড়ি দিতে গেলেই টের পাই
সময় সামন্তের নাও-এ উজান ঠেলার মাঝি নেই"

কবির এখন অনেক বয়স হয়ে গেছে। জীবনের অনেক ধরনের বাঁকের কথা মনে পড়ছে। এক একটা সময় কিভাবে কবির জীবনের মাঠকে ছোঁয়েছে। সেইসব কথা ভাবছেন তিনি আজ। তাঁর জীবনের বাঁক দেখলেই আবার

পাড়ি দিতে চান। আর সে সময়েই টের পান যে 'সময় সামন্তের নাও-এ উজান ঠেলার মাঝি নেই।' পুণরায় তিনি আর ফিরে যেতে পারবেন না সেই বাঁকে, সময়ে। কৈশোরের সেই মাঠে আবার খেলা করতে চান কিন্তু তা কি সম্ভব আর! তাই জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইছেন যে জীবনের প্রতিটি বাঁক ও সময় একবারই আসে। তাকে ঠিক করে যাপন করতে পারলে ভালো। নইলে—

''হে শৈশব ক্ষমা করো
হে কৈশোর আমাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায় থেকে মুক্তি দাও
বলেছিলাম, দেখে নিও
বলেছিলাম সকল ব্যর্থতার মধ্যে জ্বালিয়ে রাখব আলো
বলেছিলাম নিরন্নের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমিও চেয়ে দেখব স্বপ্নময় পৃথিবী
বলেছিলাম সকল পরাধীনতার কাঁটাকে উপড়ে ফেলব দু-হাতে
বলেছিলাম শত্তুরের মুখে ছাই পড়ুক
বলেছিলাম ভালবাসার বংশবৃদ্ধি হোক
বলেছিলাম অনন্ত সম্ভাবনার দিকে মুখ করে হাঁটার নাম জীবনযাপন
বলেছিলাম গাভীগুলি দুগ্ধবতী হোক
বলেছিলাম পৃথিবী হোক শস্যশালিনী
বলেছিলাম আকাশ মধুময় বাতাস মধুময়
বলেছিলাম সমুদ্রের বুক উপচে পড়ুক মধু''

আবারও শৈশবের স্মৃতির কথা মনে করে বলছেন যেন শৈশব তাকে ক্ষমা করে দেয়। এবং কৈশোর যেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায় থেকে তাকে যেন মুক্তি দেয়। কারণ এখন তিনি এই বয়স্ক বেলায় ভাবছেন তাঁর অতীত স্মৃতিকথা। জীবনের মুখোমুখি হয়েছিলেন মানুষকে পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করে। আর ভেবেছিলেন সকল ব্যর্থতার মধ্যেও জীবনে আলো জ্বালাবেন, পৃথিবীকে স্বপ্নময় করে তুলবেন, পরাধীনতার কাঁটাকে উপড়ে ফেলবেন। বলেছিলেন কবি শত্রুর মুখে ছাই পড়ুক ভালোবাসা বৃদ্ধি হোক প্রকৃতি যেন মানুষের বাসযোগ্য হয়। এই রকম পৃথিবী জীবন প্রকৃতি তিনি কল্পনা করেছিলেন।

প্রত্যেক সৃষ্টিশীল প্রতিভাশালী ব্যক্তিই সম্ভাবনার কথা বলেন। জীবনের শুরু থেকে কবি জীবনকে ভালো করে দেখেছেন—দেখেছেন তার বিচিত্র রঙ রূপ বাঁক। এই সব দেখে তিনি অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তিত্ব আজ। তিনি চেয়েছিলেন এক সম্ভাবনাময় পৃথিবী জীবন। যেখানে তিনি জীবনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে 'অনন্ত সম্ভাবনার দিকে মুখ করে হাঁটার নাম জীবনযাপন।' কিন্তু সময় তাকে কি দিয়েছে তার নিজের মাপ অনুযায়ী। তিনি উচ্চারণ করেছেন প্রগাঢ় বাক্য—

''আজ এই নিশুতি রাতে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে
হাইফেনের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি
না জীবন, না মৃত্যু, না সংগ্রাম, না শান্তি
ওই সাড়ে তিন হাত শরীরের কোন সঞ্চরে লুকিয়ে আছে
এক চিল্‌তে অগ্নিকাণ্ড
এই অনীশ্বর অন্ধকারের বুকে দ্রিমি দ্রিম বাজছে
কার ডমরু!
হে মানুষ ক্ষমা করো
হে আমার বিমূঢ় বিস্ময় ক্ষমা করো
এই হওয়া না হওয়ার মাঝখানে সফল চাষীর কপালের ঘামের মতো
আজ আমাকে অবলীলায় মুছে ফেলতে দাও
হে কবিতা তোমাকেও''

এখন পৃথিবীতে 'অদ্ভুত আঁধার এক' এ ছেয়ে গেছে। এখানে কবি নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন না। এখন তিনি অতীত আর বর্তমান, জীবনের ব্যর্থতা আর স্বপ্ন সম্ভাবনা ইত্যাদির মাঝখানে হাইফেনের মতো দাঁড়িয়ে আছেন না জীবন না মৃত্যু, না সংগ্রাম না শান্তি এইভাবে। এইসব টানাপোড়েনের মাঝখানে আগুনের স্ফুলিঙ্গ লুকিয়ে আছে। ভেতরের ভেতরে তা জ্বলছে এবং বুকের ভেতরে অনীশ্বর অন্ধকার ডমরু বাজাচ্ছে।

কবি জীবনে নিজেকে তাঁর মনের মতো করে দাঁড় করাতে পারেননি। জীবনে যা স্বপ্ন দেখেছিলেন তা পূর্ণ হয়নি। অর্থাৎ যেভাবে এই প্রকৃতি পরিবেশ জীবন পৃথিবীর কল্পনা করেছিলেন তার কিছুই হয়নি। তাই তিনি এই 'সময় সামন্ত বেলায়' এসে পৃথিবীর মানুষের কাছে ক্ষমা চাইছেন—নিজের বিমূঢ় বিস্ময়ের কাছেও অর্থাৎ জীবনের। সকল 'বোঁকা বিস্ময়ের' জন্য বিস্মত হয়েছিলেন। সেই সব আজ তাঁর কাছে অর্থহীন আজ—আজ পরিস্কার হয়েছে তার মুখোশ তাই তিনি ক্ষমা চাইছেন তার কাছে।

তারপর শেক্সপিয়ারের Hamlet নাটকের প্রধানতম প্রশ্নের মতোই তিনি বলছেন এই সব হওয়া আর না হওয়ার মানে বিফল নয়, সফল চাষীর কপালের ঘামের মতো নিজেকে মুছে নিতে চান। কারণ সকল বয়ে যাওয়ার মধ্যেও একটা স্বার্থকতা আছে। রবীন্দ্রনাথের (পনেরো আনা) মতো তিনিও বিশ্বাস করেন তা। এবং কবিতাকেও মুছে ফেলতে চান। কারণ তিনি Hamlet এর মতো জীবনের হওয়া না হওয়ার টানাপোড়েনে ভোগছেন। জীবন সায়াহ্নে তাই সকল দুর্বলতা বিফলতাকে মুছে যেতে চান সফল চাষীর কপালের ঘামের মতো। এই কবিতাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা স্মৃতিচারণ স্মৃতিমন্থন আছে। কবি এই স্মৃতি জীবন্ত করে তুলে আজকের সময়ের মাপে ওজনে বিচার করছেন। সময় কীভাবে কীরকমভাবে পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন বাঁকে এবং তা আগে কীরকম ছিল তার দ্বিবাচনিক রূপ তুলে ধরেছেন তাঁর ভাষায়। আর একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে এই কবিতায় কবি শক্তিপদ অসংখ্য আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন—গভীর থেকে গভীরতর করে বিষয়টা ভাববস্তুটাকে ফুটে তুলার জন্য। শক্তিপদ শুধু এই কবিতায় নয় এরকম অসংখ্য কবিতায় এই আঞ্চলিক ভাষা সংস্কৃতি Rootnees কে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন—মর্যাদাও। আর উত্তর আধুনিক চিন্তাচেতনায় এই জিনিসটা বিশেষ স্থান জুড়ে আছে আজ। যা একটা সমাজ সংস্কৃতির পরিচায়ক।

কিন্তু আরও একটা জিনিস কবির আত্মজীবনীমূলক এই কবিতার গভীরে একটা স্বীকারোক্তি আছে। এই স্বীকারোক্তি সত্যের, বাস্তবের, সময়ের। যা সবাই এরকম করে প্রকাশ করে দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করতে পারে না এত সহজে। কবি আজ যে রকমই থাকুন না কেন তাঁর একটা উজ্জ্বল সুগভীর অতীত ছিল—ইতিহাসও। যদি এই কথাটাকে অন্যরকম করে বলি তবে তা দাঁড়াবে এরকম— কবি শক্তিপদর মহাকাব্যিক আধারে রচিত আত্মজীবনীমূলক দীর্ঘ কবিতা 'হে কবিতা ক্ষমা করো'তে নিজের জীবনদর্শন, জীবনচর্চা, জীবনচর্যা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা বলেছেন নিবিড়ভাবে। এই কবিতায় কবিকে সবচেয়ে গভীরভাবে পাওয়া যায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে বরাক উপত্যকার জীবনধারা চর্চা চর্যা চাষ শৈলী আলো হাওয়া জল মাটি আকাশ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এইখানে শক্তিপদ মাটির এবং প্রকৃতির সবচেয়ে কাছের—ব্যক্তি ও সমাজের তো বটেই।

বিমল চৌধুরী

কবি বিমল চৌধুরী উত্তরপূর্বাঞ্চলের আধুনিক কবিতা আন্দোলনের মুখপত্র 'অতন্দ্র' পত্রিকার দ্বিতীয় প্রধান কবি। কবির ভাষায়—'অতন্দ্র করার সময়টাতে উদয়ন ঘোষের ভাষায় ঃ আমরা ছিলাম কাব্য আন্দোলনের ভলান্টিয়ার।' খুব অল্প সংখ্যক শব্দ আর বাক্য দিয়ে নির্মিত তাঁর বেশির ভাগ কবিতা। কিন্তু এই অল্প সংখ্যক শব্দসংযোজন ও বাক্যের মধ্যে সময়টা তার সকল ছবি নিয়ে বহুস্বরে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। এবং এই সময়টার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে—সমাজ

পরম্পরা ঐতিহ্য জীবনচর্চা ও চর্যা বিশেষ রূপে প্রকাশিত তাঁর কবিতায়। খুব অল্প সংখ্যক কবিতা রচনা করেছেন জীবনে। কিন্তু এই অল্প সংখ্যক কবিতাই একেবারে নিয়েট সময় উপযোগী আধুনিক আর মার্জিত।

'কেবল খেলা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। এটি তাঁর প্রথম কাব্য। এই কাব্যগ্রন্থটিই পঁচিশ বছর পর ২০০৪ সালে 'কেবল খেলা' নামেই পরিবর্ধিত সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ছড়াগ্রন্থ 'নির্ভুল' এবং 'আউলা ঝাউলা' নামে একটা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিমল চৌধুরীর সম্পূর্ণ কবি ব্যক্তিত্ব এই 'কেবল খেলা' গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে কবির সকল দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা—বহুমাত্রিক মননে। বরাক উপত্যকার সংস্কৃতি জীবনচর্চা চর্যা ইত্যাদি তাঁর কবিতায় আলাদা মাত্রা নিয়ে প্রকাশিত—নিজস্ব অস্তিত্ব সহকারে। নির্বাচিত কিছু কবিতা নিয়ে তাঁর কবিতা আলোচনা করে এইসব মাত্রা, স্বর, সুর খোঁজা যাক্।

আত্মকথন

> *''বিমল চৌধুরীর 'আত্মকথন' থেকে আধুনিক বিদ্রোহের কোনো প্রমাণই পাই না; বরং প্রান্তিকায়িত অবস্থানে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ভাববিশ্বের সীমাবদ্ধতা এতে প্রকট। এর মধ্যে যে সরল ও আন্তরিক স্বীকারোক্তি রয়েছে, তা যতটা ব্যক্তিগত তার চেয়ে ঢের বেশি বর্গগত ও সামাজিক ।''*[২৯]

সমালোচক 'আত্মকথন' কবিতাটি সম্পর্কে এই কথাটি বা মন্তব্যটা করেছেন। আর ঠিক এই কবিতাটি কবির একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা যেখানে মধ্যবিত্ত জীবনের কথা এবং বেঁচে থাকাটা বড় হয়ে উঠেছে। কবিতাটি শুরু এভাবে—

> ''আমার দুয়ার থেকে সরে গেলে সকালের রোদ
> হৃদয়ের যাদুঘরে সুরক্ষিত যত অক্ষমতা
> ব্যর্থতার কালশিটে দাগ পড়া হৃদ্য নীরবতা
> আরো বেশি তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে অশালীন বোধ।''

মানুষের প্রথম জীবনের আলো সুযোগ একবার দুয়ার থেকে সরে গেলে মনের যাদুঘরে সুরক্ষিত হয় কত অক্ষমতা। আর ব্যর্থতার আগুন আরও বেশি করে তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে—আর বোধ হয় আশালীন। নিজের মধ্যে কবি এই জিনিসটা আবিষ্কার করেছেন। ফ্ল্যাসব্যাকে গিয়ে দেখেন কেবলই সময় কাটিয়েছেন। আর জীবনটা ক্রমে নিরুজ্জ্বল হয়েছে। এই কথাটি সামগ্রিকভাবে অসংখ্য মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে। কারণ জীবনসকালের রোদ একবার দুয়ার থেকে সরে গেলে 'অক্ষমতা' 'ব্যর্থতা'-র রোগে সারাজীবন সে ভোগতে থাকে। অষ্টকের দ্বিতীয় চতুর্থ লাইনে বলছেন—

> ''মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ভীষণ চেঁচিয়ে কথা বলি,
> স্বীকরণে মুছে যাক আমার অনিচ্ছাকৃত পাপ
> মনে হয়, শুধু মনে মনে, তারপর নিরুত্তাপ
> ভেজা কাক চেয়ে থাকে, নির্লিপ্ততামগ্ন কানাগলি।''

এইসব ব্যর্থতা অক্ষমতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সময় চলে যাওয়া সত্ত্বেও চিৎকার করে বলতে চান কবি 'স্বীকরণে' যাতে মুছে যায় সকল অনিচ্ছাকৃত পাপ। যা কবি করেননি। সময় আর পারিপার্শ্ব তাকে করিয়েছে। তারপর আবার এই গরম হয়ে যাওয়া ছেঁচিয়ে ওঠা বোধটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কারণ কবি জানেন সময় একবার চলে গেলে কখনও কোনদিন ফিরে আসে না একটা মুহূর্তও। তাই আজ দেখেন ভেজা কাক নিরুপায় হয়ে ভিজতে থাকে। আর কানাগালিও নির্লিপ্ততামগ্ন হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যর্থতা ও অক্ষমতা সমস্ত সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে এখানে। এবং এইসব পরাজয়, হয়ে না ওঠার স্বীকারোক্তি কিন্তু খুব সহজ সরল। কারণ তখন আর মানুষের কোনও ধরনের লুকোচুরি বোধ থাকে না।

কিন্তু পরবর্তী স্তবকে অর্থাৎ ষষ্টকে কবি বলছেন—

"অথচ নিজের বুক বিশ্লেষণে ধরা পড়ে বেশ
আমার এ আত্মরতি অহেতুক অস্তিত্ব রক্ষণ
কখনো অক্লান্ত নয়, পত্রপুষ্পে নির্বিঘ্ন অক্লেশ—
বেঁচে আছি অতএব খুঁজে নিতে হবে প্রকরণ,
গাছপালা নদীজল পাহাড়ের স্নিগ্ধতা অশেষ
সকালের সোনারঙে আজো যার ব্যর্থ অন্বেষণ।"

এই ব্যর্থতা অক্ষমতার জন্য কী জীবন থেমে থাকে? না কখনও না। তাই কবি এগিয়ে গেছেন। নিজের বুক অর্থাৎ ভেতরের 'আমি' কে বিচার করেও সমর্থনকারী নিজের জীবন নতুন করে শুরু করতে চেয়েছেন। নিজের এই অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এবং বলছেন যে বেঁচে আছেন তাই খুঁজে নিতে বেঁচে থাকার স্টাইল। কারণ বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন বেঁচে থাকার শৈলী চান অর্জন।

কবিতাটার শেষ দুটি লাইনে প্রকৃতির ঐশ্বর্যকে আবার নতুন করে প্রকাশ করছেন যে গাছপালা নদীজল পাহাড় ইত্যাদির স্নিগ্ধতা অশেষ। তবুও কিন্তু সকালের সোনার রঙে সেই সকালবেলার রূপ খোঁজা আজ বৃথা অন্বেষণ। কারণ কবি জানেন অতীত কোনদিন বর্তমান বা আগামী হয় না। তাই তার খোঁজও বৃথা অন্বেষণ ছাড়া কিছুই নয়।

এই কবিতাটির মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সামাজিক হয়ে ওঠেছে বড় সহজে। প্রান্তিকায়িত জীবনবৃত্ত কিভাবে বৃত্তাকারে ঘুরে— মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে। তার ছবি ফুটে ওঠেছে। এবং এই জীবনের না পাওয়া, ব্যর্থতা, বিফলতা, অক্ষমতা, পাপবোধ সবকিছুই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে ভেসে ওঠেছে। এটা তো এক প্রকার অস্তিত্ব সংকট— মধ্যবিত্তের ভয়ঙ্কর সমস্যা। সেই চৈতন্যকে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন কবি আমাদের ভেতরগত আসল রূপ। কবি রণজিৎ দাশ বিমল চৌধুরীর কবি চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন—

"বিমল চৌধুরী—এমন এক নিশ্চিদ্র বাস্তবজ্ঞানী, অস্থির রোমান্টিকতা যাঁর বশীভূত।"[৩০]

চতুর্দশপদী

বিমল চৌধুরীর 'চতুর্দশপদী' কবিতাটি প্রাকৃত জীবনের অন্যরকম একটা বোধ প্রকাশ করেছে। জীবনযাপনের শৈলী ধরা পড়েছে এখানে। যে জীবন মধ্যবিত্ত বৃত্তবন্দি। যার চারপাশ খুব রক্ষণশীল ভোতা। অথচ অন্যদিকে দিয়ে খুব বেশি যান্ত্রিক কৃত্রিম—রঙমাখা। কবিতাটির শুরু এভাবে—

"উদ্যান মধুপগীত মঞ্চসাজ আলোক সম্পাত
সবই তো নিখুঁত ছিল, হে আমার অতিথি প্রধানা।
তবুও তোমার মন, মাননীয়া, গেল না যে জানা
হাউই আতসবাজি পুড়ে ছাই, ক্লান্ত জোড় হাত।"

কবিতাটির শুরুই তৎসম শব্দের দ্বারা। এই শুরুটা কিন্তু আলাদা একটা মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে। উদ্যানের সৌন্দর্যে ভরপুর ছিল সবকিছু—নিঁখুতও। তবুও কবি তাঁর প্রিয়ার মন বুঝতে পারলেন না। সব আতসবাজি অর্থাৎ বিস্ফোরণ জ্বলেছে—কত কিছু পুড়ে ছাই হয়েছে। এখন হাত দুটি ক্লান্ত—হাত জোড় করে ক্ষমা চায় অতীতের কৃতকর্মের জন্য।

নেতিবাচক সমাজের উপর আঘাত হানার মতো এমন কিছু নেই এতে। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের ভাগাদর্শকে আঘাত করার ধাতু এখানে পাওয়া যায়। তার ভেতরে কোথাও ফেলে আসা অতীতের ব্যর্থতার একটা সুর শুনা যায়। তারপর কবি বলছেন—

''ইচ্ছে ছিল পরাভবে ঈর্ষাতুর কুশীলবগণ
হেঁটে যাবে নতশির আমাদের চোখের উপর
কিন্তু কিসে কি যে হয়, খুঁজে ফিরি হতাশ উত্তর
রঙালি বিহুর সুরে পৃথিবীর বিবস্ত্র যৌবন।''

এখানে কবি নিজের একটা ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে 'ঈর্ষাতুর কুশীলবগণ' নত শিরে চলে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। কারণ এই পৃথিবীটাকে যদি একজন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে বিচার করে বা হিসেব করে। তবে সবই ভুল হয়ে যাবে। নিজের সাথে মিলবে না। তাই কবি যা ভাবেন বা চিন্তা করেন তার উল্টাটাই হয়। এবং কবি নিরাশ হন। আর দেখেন রঙিন মানুষেরা মিথ্যা উৎসবে নেচে দেখায় 'পৃথিবীর বিবস্ত্র যৌবন'। রঙালি বিহুর মতো আনন্দ উল্লাস। কারণ কবিও জানেন খুব ভালো করে 'অদ্ভুত আঁধার এক'-এ পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন। ভেতরগত অর্থ এই কথাই প্রকাশ করে এখানে শব্দের আড়ালে যে মেকি জীবনচর্চা চর্যা প্রাকৃত জীবনকে কিভাবে ঢেকে নিচ্ছে ক্রমে। তারপর ষষ্টকে এসে কবি সুর বদলে নিলেন—

''দিন গেল মিছে কাজে কলরোলে বুকের উত্তাপ
শেষ হয় রক্তপাতে স্নিগ্ধতায় বিশ্বস্ত রজনী
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর প্রার্থনার মৃদু ঘণ্টাধ্বনি
সময় সুন্দর সৃষ্টি, হেরে গেলে এতো অপলাপ।''

মানুষের সময় কীভাবে কেটে যায় টেরও পাওয়া যায় না। ব্যর্থ যৌবনটা বারবার চিৎকার করে। তখন মনে হয় যে দিনগুলি কেটেছে সবই ছিল মিছে কাজের দিন। আর ব্যস্ততার ভিড়ে সংসারি জীবনে দিন যেমন তেমন কেটে যায়। কিন্তু রাত কাটে না—হতাশায় জেগে কাটাতে হয় রক্তপাতে। 'বিশ্বস্ত রজনী' আর বিশ্বস্ত থাকে না। তখন প্রকাশ কখনও কখনও মনে মনে শুনা যায় প্রার্থনা ধ্বনি যে সময় সুন্দর হোক, সৃষ্টি হোক সুন্দর সময়। যেখানে বাঁচা যায় মাথা তুলে।

কিন্তু মানুষ জীবন সংগ্রামে হেরে গেলে এতো অপলাপ করে। তার কারণ সে হেরে যেতে চায়নি। তবুও তাকে অনেক জায়গায় হেরে যেতে হয় প্রকৃতির নিয়মে নিয়তির বালুচরে। মানুষ গভীর স্বার্থবাদী সুবিধাবাদী। যে দিকে সে সুবিধা আর স্বার্থ পায় সে সুযোগ নিয়ে নেয়। তবে হেরে যাবার জন্য নয়—জয়ের জন্য।

শেষ দুটি লাইনে প্রাকৃত জীবনের উপলব্ধিটা আরও প্রগাঢ় হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কবি যখন উচ্চারণ করেন—

''উজ্জ্বল নক্ষত্রাবলী ক্ষোভহীন গভীর আকাশ
ভেসে আসে স্মরণের মৃগমদ চন্দন সুবাস।''

ব্যক্তিগত স্মরণ অতীত বারবার এসে দেখা দেয় চোখের সামনে মনে। আজকের উজ্জ্বল নক্ষত্রাবলী, পৃথিবী আকাশ ইত্যাদি ফিরে আনে অতীতের সেইসব স্মৃতি। যা এক সময় কবির বড় কাছে ছিল। হয়তবা তিনি সেইসব পথ দিয়ে অতিক্রম করেছেন কাল— এটা কি কবিরই শুধু। নয়া উপলব্ধি পেয়ে যায় এখানে। সব মিলিয়ে কবিতাটি বিমল চৌধুরীর একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।

স্বীকারোক্তি

বিমল চৌধুরী 'অতন্দ্র' বৃত্তের দ্বিতীয় প্রধান কবি। তাঁর কবিতা খুব একটা দীর্ঘ নয়। আটোসাটো দৈর্ঘপ্রস্থ বিন্যস্ত করে কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন। কিন্তু এই শৈলীটা ছিল কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিক। যা হয়ে উঠল বিশেষ এক প্রকার কবিতা। যা বিমল চৌধুরীকে পরিচয় করিয়ে দিতে বিশেষ সাহায্য করে। এই রকম একটা কবিতার উদাহরণ হল 'স্বীকারোক্তি'। কবিতাটির শুরু এভাবে—

''নিরাসক্ত সার্কাসের কর্মহীন নিঃসঙ্গ ক্লাউন

নটনটী দর্শকের করতল সশব্দ সহাস—
যেন নৈশ শবযাত্রী ছোঁড়াদের উত্যাক্ত উল্লাস—
চোখে নিয়ে সমাসীন বুক জুড়ে ভীরু সুনিপুণ।"

'স্বীকারোক্তি' কবিতাটির প্রথম স্তবকে স্বীকার করে নিলেন শেক্সপিয়ারের মতো

"All the world's a stage"
"And all the men and women merely players"[13]
(As you like it)

আর শব যাত্রা করে ছেলেরা উত্যক্ত উল্লাস করছে। এবং তাদের চোখে সমাসীনতা বুক জুড়ে আছে ভীরুতার সুনিপুণ। কেন যেন এক রকম বেদনার কর্মহীনতার মনোভাব ভেতরে ভেতরে কাজ করে। একদিকে সার্কাসের কর্মহীন উল্লাস দর্শক নটনটী আর অন্যদিকে শবযাত্রা বুকে চোখে অন্ধকারাচ্ছন্নতা। তারপর দ্বিতীয় স্তবকে বলিষ্ঠ উচ্চারণ—

"গ্রাম্য কুমারীর বুকে টপলেস পরানোর মতো
ধুমায়িত নাগরিক ব্যথা সহ ট্যানিনের রস
গলাধঃকরণ শেষে শিলচরে বসে নিরলস
সন্ধ্যার আসর জমে, ঘেমে উঠে অশান্ত আহত"

এখানে শব্দের মধ্যে খুঁজে নেন কবি ব্যতিক্রমী জীবনবোধ। অনেক দিন ধরে চলে আসা জীবনধারাকে হঠাৎ নতুন করে নির্মাণ করার জীবনবোধ ও সমসাময়িকতার অনুভব পাওয়া যায় এখানে। বড় স্বাভাবিকভাবে বলছেন গ্রাম্যকুমারীর সাধারণ পোশাকের মতো নাগরিক ব্যথাও সাধারণ হয়ে গেছে আজ। আর গলায় অসুখ নিয়ে শহরে বসে নিরলসভাবে সন্ধ্যাবেলা আসর জমে একেবারে বৃথা, স্বার্থকতাহীন আড্ডা। আর তখন পুরাতন, অতীতের সমস্ত আহতগুলি ঘেমে ওঠে। অর্থাৎ বাইরে থেকে সকল দোষখুঁত দেখা যায়। যদিও তারা মনে করেন বড় বেশি আধুনিক, উপরে। তারপর কবি এই নাগরিকতাকে একেবারে খুলে দেখালেন—

"বিবস্ত্র নিষ্প্রেম পরিহাস, দৃপ্ত পাথুরে চোয়াল
বোধগম্য পরিচিত সকালের রোদ্দুরের মত
প্রাণবান ভীতিটাকে স্পর্ধিত চেষ্টায় আরো কত
অনির্দেশ অন্ধকারে ঠেলে দিতে হবে কতকাল।"

আধা-নাগরিক আর নাগরিক বিবস্ত্র নিষ্প্রেম কেবল পরিহাস করে। এবং পুরাতন আহতগুলি তাজা করে নতুন করে। উজ্জ্বল পাথরের মধ্যে পড়া সকালের রোদের মতো প্রাণশীল জীনববোধটা আজ আরো গভীর অন্ধকারের দিকে টেলে দিচ্ছে। আর এই রকম চক্রব্যূহ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের ভেতরে এতদিনের প্রাণবান অন্ধকারকে ঠেলে সরাতে হবে। কারণ কুসংস্কার একদিকে আর অন্যদিকে বিজ্ঞান প্রযুক্তির টানাপোড়েনে আজ মানুষের জীবন আধা যন্ত্র হয়ে গেছে। এই আধাযন্ত্র জীবনকে বাঁচাতে হলে ভেতরের এই যান্ত্রিক সত্তাটাকে খুলে ফেলতে হবে। আমাদের এতদিনের অভ্যাস ও সংস্কারহীনতার দুয়ার ভেঙে এখানে সকালের রোদ দিতে হবে। যাতে ওই গোপন জায়গা থেকে অন্ধকার সরে গিয়ে আলোকিত হয়।

এই চতুর্দশপদী কবিতার শেষ দুটি লাইনে বলছেন আমাদের অভ্যাসজনিত এতদিনের ধারাবাহিকতা। সেই ধারাবাহিকতা কী রকম? কবি বলছেন—

মাঝে মাঝে সাতাশের সোচ্চার বমনলিপ্ত স্রোতে
মনে হয় শুয়ে আছি চোখ বুজে মায়ের উরুতে।"

এতদিন ধরে নির্মিত আমাদের আচ্ছন্নতার কেন্দ্রকে আমরা বুঝতেই পারি না। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে এখানেই ফিরে

আসি সকল কাজ শেষে— আসতেই হয় বলে। আর মাঝে মাঝে মনে হয় সাতাশ বছরের সোচ্চার তীব্র স্রোতে শুয়ে আছে—গভীর আরামে মায়ের কোলে। কিন্তু এটা যে মায়ের উরু না তা আমাদের মধ্যবিত্তের একঘেয়েমি জীবনে সহজে ধরা পড়ে না। যদিও মাঝে মাঝে ভাবি এটা না ওটা না। এই সব প্রখর সত্য বাস্তবকে কবি স্বীকার করে তুলে ধরেছেন 'স্বীকারোক্তি' কবিতার শরীরে।

সুখ

"বিমল চৌধুরীর 'সুখ' কবিতাটি, 'Socially specific envinonment' আর 'Living dialogic threads woren by socioideological consciouses'-এর প্রাসঙ্গিকতাকে বুঝিয়ে দেয়। এর প্রতিবেদনে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, শাব্দিক ও নিঃশব্দ আয়তনের দ্বিবাচনিকতায়, ওই সমাজ-নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত ও ভাবাদর্শ-সমপৃক্ত চেতনার বয়ন চমৎকার ফুটে উঠেছে।"[৩১]

সমালোচকের এই মন্তব্যটা একবার স্মরণ করে নিয়ে কবি বিমল চৌধুরীর 'সুখ' কবিতাটি চর্চা করা যাক। কারণ এই কটা লাইনের মধ্যে সমালোচক অনেক কথা বলে দিয়েছেন। কবিতাটি শুরু কিন্তু একটু অস্বাভাবিকভাবেই—

"মফঃস্বল শহরের মন্থর হাওয়ায়
চোখ বুজে অবলীঢ় সুখ—"

আমাদের গণ্ডিবদ্ধ জীবনের সুখ দিয়েই কবিতাটির আরম্ভ হয়েছে। মফঃস্বল শহরের ধীর লয়ের জীবনে বলতে পারেন গতিহীন জীবনের মধ্যে আমরা ডুবে আছি আস্বাদিত সুখে। এই কথাটি কিন্তু আমাদের জীবনধারণের অনেকটা সংকেত পাওয়া যায়। তারপর দ্বিতীয় স্তবকে গতিহীন জীবনের রূপ আরও সুস্পষ্ট—

"ঘুম ভেঙে টুথব্রাশ, বাজার অফিস
করণীয় অভ্যস্ততা, বিকেলের পার্ক
বিনোদিনী টকিঘর
ইদানীং অনিদ্রার বড্ড বাড়াবাড়ি,
মসৃণ তলপেটে পুরু হয়ে জমে আছে
ইঞ্চিকয় সুখ।"

দৈনন্দিন কাজকর্মে অভ্যাসে আমাদের জীবন একটা বৃত্তাকার হয়ে গেছে। এখান থেকে মুক্তি নেই কিন্তু। আর এই জীবনকে কেবল রোমন্থন করে দিন কাটছে। এটাই সত্য। বাজার, অফিস, পার্কভ্রমণ, বিনোদন ইত্যাদির বাইরে কিন্তু আমাদের জীবনযাপনটা প্রসারিত হচ্ছে না। আর তার মধ্যে পেট ভরে সুখ নিয়ে ঘুমাতে চাই। যদিও ঘুম নেই আজ আর মানুষের চোখে। এসব উল্টোভাবে বলছেন এটাই কী সুখ?

তৃতীয় স্তবকে কবিতার ভাষায় মাত্রান্তর তো ঘটেছে আর সাংস্কৃতিক চিন্তাচেতনার সংকেতও দিচ্ছে। এখানে নিজস্বতার বহুস্বরের আভাস পাচ্ছি। জীবন এখানে আর এক বাচনিক হয়ে থাকে না। কবি বলছেন—

"শেষ মাঘে বর্ষে মেঘ
হরি হরি পুণ্য দেশ
ঝিরঝির হঠাৎ বাতাসে ঃ
চুপ চুপ চুপ।
বেহায়া গাঁদার ঝোপে হোলি হ্যায়
ভিড় খুঁজে সুখ।"

এইখানে অন্যরকমভাবে বলা যায় প্রাকৃত জীবনের একটু অনুষঙ্গ আছে। এবং অস্তিত্বের উপস্থিতি প্রকটভাবে

পাওয়া যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য এতে কাজ করছে গভীরে। তবুও আজ পৃথিবীতে মানুষ নির্জনতাকে পছন্দ করে না। যদিও প্রত্যেকটা মানুষ বড় নির্জন—একা। তারা চায় সাময়িক হলেও উৎসব অনুষ্ঠানে ভিড়ের সুখকে উপভোগ করতে। কারণ মানুষ যতই একা হোক না কেন—তারা সবচেয়ে বেশি সামাজিক জীব। এটাও কিন্তু সাম্প্রতিকতার পরিসরকে পরিচয় করিয়ে দেয়। এখানে সাধারণ মানুষ আর বুদ্ধিজীবী সবই এক সারিতে বসে আছেন।

চতুর্থ স্তবকে কবি আবার ফিরে এলেন দৈনন্দিন জীবনের অনুষঙ্গে—

"সাময়িক টুকিটাকি, রেডিয়োর নব
ধুলো ঝাড়া গ্রন্থাবলী, ছাইদান কানায় কানায়
রবিবার দুপুরের অলস শয্যায়
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সুখ।"

বৃত্তবন্দি জীবনে সাময়িক-ই সব কাজ, সব সুখ, সব পথহাঁটা। কারণ এই বৃত্ত না ভাঙলে সাময়িককে পার হওয়া যায় না। কিন্তু কবি বিমল চৌধুরী দেখিয়ে দিচ্ছেন সাময়িক টুকিটাকি আর রেডিয়োর খবর, অলসভাবে গ্রন্থপাঠ, সিগারেটের ছাইদানি আর রবিবারে অর্থাৎ ছুটির দিনে অলসভাবে শয্যায় শুয়ে সুখ লাভ করা, এই সব তো আমাদের অভ্যাসজনিত ধারাবাহিকতায় নিয়মমাফিক চলছে। এখানে কোনও পরিবর্তন নেই। বরং একঘেয়েমি আর গাঢ়—গভীর। এই যে মধ্যবিত্ত মানুষের বৃত্তবন্দি জীবন। তাতে পরিবর্তন নেই। কবি চান এখানে পরিবর্তন এনে জীবনকে ধারালো গতিশীল করতে। তা হলে এই বৃত্তবন্দি জীবনে আরও গতি আসবে। উল্টোভাবে কবি বলছেন এটা কী আধুনিকতা—উন্নত জীবন যাপন? সংস্কারহীন জীবনের প্রতিটা পরতে পরতে পিছু টান আর মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা। যেখানে কোনও জিজ্ঞাসা নেই। আছে শুধু ভেসে চলা সময়ের স্রোতে।

তারপর কবি সুর বদলে নিলেন। অর্থাৎ কবিতায় একটা বাঁক ফেরালেন এখানে। যেখানে টিকে থাকাটাই বড় কথা—

"সবার উপরে সত্য, বেঁচে থাকা বড়ো সুখ,
মাসান্তে বেতন গুনে জোড়হাতে কৃতার্থ হে সুখ,"

এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, বাস্তব ও সত্য। কারণ বেঁচে থাকতে না পারলে আর কিছুই থাকে না। সব কিছু শূন্য হয়ে যায়। তাই কবি বলছেন মানুষ সর্বপ্রথম বাঁচত। বেঁচে থাকলেই তবে সুখ। আর কবি মূলত বলতে চান ভালোভাবে বেঁচে থাকার কথা। মাসের শেষে শুধু বেতন গোনাটাই শেষ কথা নয়। এই টাকা গোনা, বাজার করা, খাওয়া, ঘুমানো এগুলিই একমাত্র সুখ? পৃথিবীকে বাঁচার উপযোগী করে কী বাঁচব না? এই কথাটি কিন্তু নেপথ্যে বলে দিচ্ছেন। কাজের শেষে মজুরি, বেতন নিয়ে জোড়হাতে কৃতার্থ হয়ে গেলেই কী চূড়ান্ত সুখ? সমস্ত কবিতার ভেতরে ছয়বার 'সুখ' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে—বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনুষঙ্গে। এবং তিনি জিজ্ঞাসা করছেন এই সব জিনিসেই কী সুখ? এরকম জীবনবোধে, জীবনচর্চায়, চর্যার, জীবনশৈলীতেই কেবল সুখ? তিনি সুখকে ভালোভাবে প্রকাশ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

এবং কবিতাটির শেষ স্তবকে অন্যরকম একটা উপহাসের মধ্য দিয়ে শেষ করেছেন। একটা তির্যক পরিহাস—

"আসুন,
পথের পাশের নেড়ি কুকুরের পেটে
কষে দুটো লাথি মারা যাক।"

আমাদের মধ্যবিত্ত মানুষের অভ্যাস, রুচি, জীবনচর্চা চর্যা শৈলীতে এমন এক বৃত্তবন্দি জীবন সৃষ্টি হয়েছে বলা ভালো নির্মাণ হয়েছে। এই চক্রব্যূহের শেকলে লাথি মেরে ভেঙে দিতে চাইছেন। এবং মুক্তি দিতে চাইছেন এ রকম

খাঁচায় বন্দি মানুষদের। এই মুক্তি কিন্তু চিন্তায় চেতনায় হতে হবে। তাই বৃত্তকে আগে ভাঙতে চাইছেন। তাই 'সুখ' কবিতাটি এই দিক দিয়ে এক অনবদ্য কবিতা।

আমার জন্ম

''নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বটাই ব্যক্তি মানুষের কঠিনতম সংগ্রাম।''[৩২]

('আমার কথা'— 'কেবল খেলা', বিমল চৌধুরী)

কবি বিমল চৌধুরীর 'আমার জন্ম' কবিতাটি বিশ্লেষণ পূর্বে কবির এই প্রগাঢ় উচ্চারণ একবার স্মরণ করে নিতে পারি। এই একটি মাত্র লাইনই বিমল চৌধুরীর সমস্ত কবিতার নির্যাসের চাবিকাটি কিন্তু। এই বাক্য দিয়েই তাঁর প্রায় সব কবিতাকেই বিচার করা যায়। 'আমার জন্ম' কবিতাটিতেই এই অভিব্যক্তি ফুটে ওঠেছে। কবিতাটির শুরু এভাবে—

''লিখে রাখো কৃষ্ণপক্ষ মার্ঘশীর্ষ নবম দিবস
নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর ঃ দণ্ড তিথি অক্ষাংশ দ্রাঘিমা
অন্তঃসত্তা অন্ধকার থেকে এক টুকরো আলো
শিয়রে মায়ের হাত শুয়ে আছে নিশ্চিত শয্যায়।''

এই পৃথিবীর কোনও মানুষই ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—আলাদা নয়। কারণ মানুষ তো হঠাৎ করে টপকে পড়েনি আকাশ থেকে। তার পিছে গভীর পটভূমি থাকে। এই কথাটিই কবি 'আমার জন্ম' কবিতার শীর্ষে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। 'অন্তঃসত্তা অন্ধকার' থেকে উৎসারিত আলোকের মধ্যে সৃষ্টির উৎস। এই পটভূমি, আলো, ঐতিহ্য কী মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের অর্থাৎ ব্যক্তির সঙ্গে মানুষের কঠিনতম সংগ্রাম নয়? এই সব কিছুই ছাপিয়ে ওঠে নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বটাই কিন্তু। দ্বিতীয় স্তবকে এই ঐতিহ্যোপলব্ধি আরও প্রগাঢ় হয়ে ওঠে কবি যখন উচ্চারণ করেন—

''তুলসীর মঞ্চ ঘেঁষে পুবদিকে ডালিম তলায়
রমণীয় হুলুধ্বনি সমবেত মঙ্গল মঙ্গল
হিমেল হেমন্ত সন্ধ্যা সেদ্ধ ধানে ম ম উঠোনের
মাঝখানে বিছানো শীতলপাটি টুঙ টাঙ কথা
হাতে হাতে গুয়াপান রসসিক্ত স্বাগত জীবন।''

এখানে কথা থেকে বেশি প্রকাশ পাচ্ছে সংকেত, চিহ্ন। কবির আঞ্চলিক বাচনভঙ্গি জীবনবোধকে আরও প্রাকৃত করে তুলেছে। প্রাকৃত থেকে আরও মাটির কাছাকাছি যেতে পেরেছেন কবি। নিজের পারিপার্শ্বিকতাকে মন্থন করে নির্যাস দিয়ে ব্যক্তিসত্তার কথা সামাজিকভাবে তুলে ধরেছেন। যেখানে ব্যক্তিই মূল আধার আর আধেয়। আর এই বোধ, ঐতিহ্য বহু দিনের চাষ করা মূল্যবোধ কিন্তু। যান্ত্রিক জীবনের হতাশা, যন্ত্রণা নাই এতে। আছে শুধু ব্যক্তির ভেতর আর বাইরের কথা। এই কথা মানে নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব কিন্তু। তৃতীয় স্তবকে কবির প্রকাশভঙ্গি কিন্তু আরও প্রাকৃত। কিন্তু তা বড় সুগভীর। কবি বলছেন—

''সর্ষেপোড়া তীব্রগন্ধ ওপাশে আঁতুড় ঘর ছেয়ে
কাজললতায় স্নেহ, একফালি হরিণের শিঙ
টুপটাপ ওয়াঁ ওঁয়া মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান
র‍্যাপার জড়ানো গায়ে মুনিষেরা হাসাহাসি করে।''

এই যে প্রাকৃত জীবন আর তার অনুষঙ্গ বলছি তা কত সুগভীর প্রাকৃত! তা এই স্তবকে আবার প্রমাণিত হয়। শিশু জন্মলগ্নে যে 'ওঁয়া ওঁয়া' কান্না করে পৃথিবীকে জানিয়ে দেয় আমি এসেছি তোমার বুকে। তারপর জীবনের পথ হাঁটা। এটা কী বাস্তব না? চারদিকে মানুষেরা 'মঙ্গল মঙ্গল' বলে হাসাহাসি করে না? এটা কী আঞ্চলিক ঐতিহ্যকে ছাপিয়ে

গিয়ে বিশ্বজনীনতায় পৌঁছায় না? আর এই স্তবকের 'টুপটাপ ওয়াঁ ওয়াঁ মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান' সংস্কৃত মধুর উচ্চারণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে ঐতিহ্যানুভব আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ দুটি লাইনে কবি অন্যরকমভাবে সমাপ্তি টানলেন কবিতাটিকে—

''জন্মলগ্নে সকলের উদ্ভাসিত চাঁদ ছিল, মাগো
তালপুকুরের ঢেউ মৃদুদোলা, কাঁপায় স্মরণ।''

এখানে মনে হয় কবির একটা সত্তা দূরে সরে গিয়ে এতকিছু উপলব্ধি করেছে—বিচার করছে অন্যসত্তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে, সংগ্রাম করে। সেই সব আজ ভাবলে স্মরণ কেঁপে ওঠে। সেই ঐতিহ্যকে কবি খুঁজছেন এখানে। আজ কী হয় তার মানে অর্থ সংজ্ঞা? এখানে এই জিজ্ঞাসার কথা ফুটে ওঠছে। 'বাইরের আমি' আর 'ভেতরের আমি' লিপ্ত থাকে যুদ্ধে সর্বদা বিমল চৌধুরীর কবিতায়। এখানে দ্বন্দ্ব থাকবে—থাকবেই তো সংগ্রাম। কারণ কবির মতে কবিতা হল—

''কবির বক্তব্য তার কবিতা, যা ধরে রাখে তার বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক মানসভূমি, তার আসল পরিচয়।''[৩৩]

('আমার কথা'—'কেবল খেলা'— বিমল চৌধুরী)

ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ

কবিতার কাছে নত হব

''ব্রজেন্দ্র কুমার সিংহের কবিতার পরতে পরতে রয়েছে মানুষের প্রতি দরদ অবহেলিতদের জন্য কাতরতা। বর্তমান সময়ের মানুষ মূল্যবোধ হারিয়ে ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। অন্তঃসারশূন্য সে সময়ের ছাপ তাঁর কবিতায় সুস্পষ্ট। কবি সত্যদ্রষ্টা—যা দেখেছেন তাই কবির কণ্ঠস্বরে মুখর হয়ে ওঠেছে।''[৩৪]

মাতৃভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি হওয়া সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ বাংলা ভাষার এক প্রধান কবি বরাক উপত্যকায়। প্রথম জীবন অর্থাৎ জীবনের প্রথম থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনার এক প্রধান মননধর্মী পাঠক ছিলেন। তাই ছোট থেকেই এক প্রকার বাঙালি হয়ে গেছিলেন। যত বড় হয়েছেন তাঁর সেই সত্তা আরও পরিণত পরিপক্ষ হয়েছে। এবং বাংলা কবিতা রচনায় (চর্চায়) তার সম্পূর্ণ রূপ ফুটে ওঠেছে।

ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ বিশেষ করে রোমান্টিক মননের কবি। তাঁর 'ভিখারি বালকের গান' (১৯৯৪) পড়লে মনে হয় তিনি রোমান্টিক— কিন্তু অন্য ধরনের। সময়ের বহমানতার প্রতি উদাসীন। তাঁর সেই সত্তা প্রকট হয়ে ওঠেছে অনেক কবিতায়। এখানে রোমান্টিকবোধ থেকে বেশি সমাজ বাস্তবতা বড় হয়ে উঠেছে 'কবিতার কাছে নত হব' এই কবিতায় আমরা খুঁজব তা। কবি বলছেন—

'' এখন বন্ধুরা এসে অভিযোগ করে
স্বপ্নে ছাড়া কোথাও তেমন আর ভালবাসা নেই
স্বপ্নের ভিতরে শুধু নাম ধরে ডাকাডাকি করে, বলে, ভালো আছে।
বাইরে সবাই যেন পরস্পর পরিচিত নয়।
আরও একটা কথা, নারীরা এখন আর স্বপ্ন ছাড়া কোথাও থাকে না।''

দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমরা এক ঘেয়েমির মধ্যে পথ চলি। হঠাৎ যখন চোখে পড়ে তখন আমরা নিজেকে একটু বদলাতে চেষ্টা করি। কারণ সময়ের একমাত্র ধর্ম এগিয়ে যাওয়া বয়ে যাওয়াও। কিন্তু এখন সময় অন্যরকমভাবে বয়ে যায়। কেউ কিছুই বুঝে না। তাই সবাই নিজে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কাউকে একটু সময় দিতে পারছে না। সেখানে যারা আজও সবকে নিয়ে বাঁচতে চায় তারা অভিযোগ করে যে আজকাল স্বপ্ন ছাড়া কোথাও যেন ভালবাসা পাওয়া যাচ্ছে না। স্বপ্নের ভেতরে আমাদের সেই আত্মিয়তা সম্পর্ক ভালো বাসাবাসি। বাইরে কারুর সময় নেই। সবাই পথে

মাঠে বাজারে শহরে দৌড়াচ্ছে। নারীরা এখন আর বাস্তবে নেই। হয়তবা তারা বাস্তবতাহীন আজ। তার মানে যারা সৃষ্টিকে আধার করে আছে তাকেও আজ বাস্তবে পাওয়া যাচ্ছে না। কল্পনা আর স্বপ্নের আশ্রয়ে তাকে পেতে হচ্ছে। সময় আমাদেরকে এইভাবে পথ হাঁটাচ্ছে— যান্ত্রিকতাপ্রিয় পৃথিবীও। আমাদের জীবন কৃত্রিমতায় ভরে গেছে। তাই আজ আমরা এরকম।

"খুব দুঃখ করে আজ বুড়ো পাদ্রীসায়েব সকালে বললে
ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। কারণ এখন কেউ আর
গির্জেয় আসে না, সবাই স্বপ্নের মধ্যে অনুতাপ সেরে নিতে চায়।
ঘুমোলেই পাপীতাপী করুণ কাহিনি শুরু করে।"

পৃথিবীর মানুষেরা আজ ক্রমে যুক্তিবাদী হয়ে ওঠছে—ওঠেছে। যুক্তি প্রমাণ দিয়ে সবকিছু বিচার করছে। তাই মন্দির মসজিদ গির্জায় ভগবান ঈশ্বর খুঁজতে যায় না। আর আজ আগের মত ধর্মান্ধ খুব একটা মানুষ নেই। সভ্যতার প্রগতির সাথে সাথে এই প্রগতি। তাই আজকাল মানুষ এত যুক্তিবাদী প্রমাণবাদী। এখানে দুটি হিন্দি ছবির নাম বলতে চাই 'OMG' বা Oh My God এবং 'PK'। এই দুটি সিনেমায় ধর্মের সমস্ত কুসংস্কারকে তুলপাড় করে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ আজ ওই রকম চায়। আর তার মধ্যে স্বার্থবাদী পণ্ডিতপাদ্রী মৌলোভীরা কাঁদছে তাদের ভণ্ডামিকে টিকে রাখতে পারছে না বলে। কারণ মানুষ নিজের মধ্যে ঈশ্বর শক্তি খুঁজছে আজ। তার একটা প্রধান আশ্রয় স্বপ্ন। কুসংস্কারিরা আজ খুব একটা ঘুমায় না। কারণ তারা তাদের ভণ্ডামির সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে। পাপতাপ নিয়ে তারা ব্যস্ত।

"শুনে আমি একেবারে আগুনের মত জ্বলে গেছি
তক্ষুনি মুখের কাছে টেলিফোন তুলে একচোট গালাগালি দেই।
স্বপ্নকে জোচ্ছোর বলতে আমার বাধে না।
ফোনের ওপাশ থেকে কুঁই কুঁই করে স্বপ্ন বলে চলে
কি সব নিজের কথা। আমার ধমক শুনে চুপ।
বন্ধুরা সবাই খুব খুশি। এখন যে যার বাড়ি গেছে।"

উপরের এই সব পাদ্রী সয়েবের কথা শুনে কবির বড় কষ্ট হল। এবং তখনই পরোক্ষভাবে অনেক গালাগালি দেন। স্বপ্নকে যা তা বলতে কবির বাধে না। কারণ কবি কাউকে পরোয়া করেন না। কবির এই হাবভাব দেখে চারপাশের পরিবেশ অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে গেল। বন্ধুরা সবাই অনেক খুশি। তারপর সবাই নিজের নিজের কাজেকর্মে ব্যস্ত হয়ে গেল স্বাভাবিকভাবেই। এইসব মানসিক ক্রিয়াকলাপ কবির এমনেই হয়ে যায় না। কারণ তিনি স্বপ্নপ্রিয় কল্পনাপ্রিয় একটু অন্য রকম রোমান্টিক। সময়ের চাঞ্চল্যে তিনি উদাসিন। সময় মানুষকে কিভাবে বদলাচ্ছে তার কথাই বলছেন।

"পাড়ার ছেলেরা বলে—কাল আপনি স্বপ্নেই চাঁদা দিয়েছেন
আর লাগবে না।
কাউকে ডাকলে বলে এখন সময় নেই
সব কথা স্বপ্নে হবে, এখন ঘুমুতে যাব।
আমি অভিমান করি, কেউ মান ভাঙাতে আসে না।"

কবি যে পৃথিবীতে থাকেন তা জীবনানন্দের পৃথিবীর মত অনেক বয়সিনী। মানুষ এখানে পুরাতনকে বড় তাড়াতাড়ি ছেড়ে নতুনকে গ্রহণ করে। তাই পাড়ার ছেলেদের সাথে তাঁর চিন্তাধারণার এত তফাৎ। সে জন্য কবিকে তার নবপ্রজন্মরা অন্যরকম ভাবে। তাঁর কাছ থেকে চাঁদা নিতে চায় না। কাউকে ডাক দিলে পাওয়া যায় না সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। অর্থাৎ কবি আজ আর নবপ্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে পাচ্ছেন না। ক্রমে তাঁদের মাঝে ব্যবধান বাড়ছে। স্বপ্নপ্রিয় কবিকে বলে সবকিছু স্বপ্নে হবে। কবি অভিমান করেন কিন্তু তাঁর মান ভাঙাতে কেউ আসেনি। তার একমাত্র কারণ কবির সাথে তাদের Generation Gap এর Problem। এই কয়েকটা লাইনের মধ্যে সময়ের সাথে মানসিকতা কিভাবে বদলে

যায় তা সুন্দর করে দেখাতে পেরেছেন কবি।

"অত্যন্ত নিঃসঙ্গতায়
স্বপ্ন আর ঈশ্বরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে রয়েছি
চিরকাল চিরকাল কবিতার কাছে নত হব।"

এ রকমের নিঃসঙ্গতার মধ্যে কবিতাটি শেষ করেছেন কবি। এখানে কেউ আর কবিকে সঙ্গ দিতে চায় না। নতুন প্রজন্মের হাতে সময় নেই একটুও। তাই কবি স্বপ্ন আর ঈশ্বরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এবং নিজে নিজে ভাবছেন চিরকাল শুধু কবিতার কাছে নত হয়ে নিঃসঙ্গতাহীন হতে। অর্থাৎ কবি কবিতার কাছে আশ্রয় নিয়ে একাকিত্বকে দূর করতে চেয়েছেন। এ রকমও ভাবতে পারি আজকাল কবিতার কোনও দরকার নেই বা কবিতা নাকি কোনও উপকার করতে পারে না—অবক্ষয়ী আধুনিক অনেক নবপ্রজন্মের এই মত। যারা বিজ্ঞানের মতো কেটেকুটে সবকিছুকে দেখতে চায় প্রমাণে যুক্তিতে। আর এই সবের ভিড়েও কবি কিন্তু কবিতাকে একমাত্র আশ্রয়ের শান্তির স্বপ্নের আধার করেছেন।

তোমার সুবাস

"সাধারণ-জনের কথাই তাঁর কবিত্বের উৎস ও আধেয়। এই মানবতাবাদের শাশ্বত রূপ দেখি ব্রজেন্দ্র কুমার সিংহের 'তোমার সুবাস' কবিতায়। সমুদ্র যেমন দিগন্তে মিশে একাকার ও অন্তরঙ্গ হয়ে থাকে, তেমনি এখানেও কবির ব্যক্তিপ্রেম ও মানবপ্রেম লাভ করে এক নৈকট্যের অনন্যতা।"[৩৫]

কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের কবিতাচর্চায় যে জিনিসটা পাওয়া যায় তা খুব নিবিড়ভাবে ধরতে পেরেছেন সমালোচক। 'তোমার সুবাস' কবিতা ব্যাখ্যায় এই কথাটা একবার মনে করতে পারি। কবি বলছেন—

"গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে ওই তোমার সুবাস
গল্পের হাটবারে তিসির দর, গো-মড়ক এবং পামরী পোকার মতো
জরুরী বিষয় ভুলে, লোকে বলছে—
কিসের সুগন্ধ এটা মোড়ল মশাই?
যেন বুকের মধ্যে জ্যোৎস্না গিয়ে লাগছে
কণ্ঠ বেয়ে নামছে যেন তৃষ্ণার জল।"

কবি ব্রজেন্দ্র কুমার যথেষ্ট আধুনিক কবি নন এবং তাঁর কবিতাও যথেষ্ট আধুনিক কবিতা নয়। কিন্তু তাঁর কবিতায় আধুনিকতার দ্বারা সমাজ মানস, মানুষের মানসিকতা, গ্রামগঞ্জের পরিবর্তন ইত্যাদির ছাপ সুস্পষ্ট। আধুনিকতার ছোঁয়ায় কিভাবে এইসব বদলে যাচ্ছে তার ছবি খুব সুন্দর করে ফুটে উঠেছে তার কবিতায়। এবং এই ফুটে ওঠার ভেতরে ভেতরে তাঁর রোমান্টিক চেতনা লুকিয়ে রয়েছে।

সেই পরিবর্তনের পালা বদলের কথা বলছেন কবি যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের ভেতরে কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। একটা সুবাস হয়ে একেবারে গ্রাম্য জীবন থেকে মানুষ বেরিয়ে আসছে ক্রমে। তাই তাদের জীবনে নাগরিকতা ঢুকছে ধীরে ধীরে। গ্রাম জীবনকে তারা প্রশ্ন করছে কিসের এই সুগন্ধ বা সুবাস—যেন বুকের ভেতরে এতদিনের পর রাতে চাঁদের আলো লাগছে। এই সুবাস বুকের ভেতরে গিয়ে প্রবেশ করছে জ্যোৎস্নার মতো। আর তারা এতদিনের তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে একটু জল পাচ্ছে এই প্রথম। এটা কিন্তু বিশ্বায়ণের কোনও কিছু না এটা আধুনিকতার পদধ্বনি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আজ আর কোথাও চণ্ডীমণ্ডপ নেই। জমিদারীপ্রথা সামন্তপ্রথা ইত্যাদি বিলুপ হওয়ায় নিম্নবর্গীয় মানুষেরা কথা বলতে পাচ্ছে—তার একান্ত নিজস্ব কথা। যা এতদিন অন্যকেউ বলত না। সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার নামই

হল নতুন যুগের আগমণি—আধুনিকতা, প্রগতি, উন্নতি ইত্যাদি।

''আমি জানি এ তোমার শরীরের অন্তরঙ্গ আলো।
তুমি জেগে ওঠো প্রেম, জেগে ওঠো। এ আমার অনুরোধ।
গাঁয়ে গঞ্জে ভূভারতে—এই চরাচরে
অনাহার দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যুর তৃতীয় বিশ্বজুড়ে
তোমার বিশ্বস্ত দৃষ্টি বলে দিক
গমের জাহাজ আসছে ঐশ্বর্যের তটভূমি থেকে।"

মানুষের তখনই পরিবর্তন হয় যখন সে তার অন্তরঙ্গ আলোকে এবং আলোর মধ্যে নিজেকে দেখতে পারে নতুন করে। কবি বলছেন যে এই সুবাস শুধু সুবাস না এটা মানুষের অন্তরঙ্গ আলো যা এতদিন সুপ্ত ছিল। সে জন্য কবি ডাক দিচ্ছেন 'তুমি জেগে ওঠো প্রেম'— অনুরোধও করছেন জেগে ওঠার জন্য। কারণ পৃথিবীর সৃষ্টির প্রথম ও শেষ কথা প্রেম। এখানে সবকিছু সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। আর সেই প্রেমকে জাগানোর চেষ্টা করছেন কবি সমগ্র ভারতের গ্রামেগঞ্জে। কারণ ভারতবর্ষে আজও তিনভাগের একভাগ মানুষ একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। এখানে আজও অনাহার দুর্ভিক্ষ রয়ে গেছে। এই দুর্ভিক্ষের ভূমি 'মৃত্যুর তৃতীয় বিশ্বজুড়ে' পরিপূর্ণতার সুবাস ও প্রেম জাগাতে কবি বদ্ধ পরিকর। এবং এই সুবাস অন্তরঙ্গ আলো আর প্রেমকে বলছেন তোমরা বলে দাও 'গমের জাহাজ আসছে ঐশ্বর্যের তটভূমি থেকে।'

মানুষের জীবনে দুর্ভিক্ষে অনাহারে কি পরিবর্তন আসে তা কবি ইতিহাসে থেকে জেনেছেন! ঘরে চাল না থাকলে পূর্ণিমা চাঁদ জ্বলা রুটি হয়ে যায়। মানুষের মনের আলো দিয়ে তার হাড়কে দেখার কথা স্মরণ করে দিচ্ছেন এবং তার সঙ্গে উত্তরণের কথা বলছেন। জীবন বোধটা এখানে আলাদা একটা মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে। তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'-র মতো তিনিও একটা নতুন সমাজ দেখতে চান। যেখানে শুধু গ্রামের সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে বিশ্বের সঙ্গে জুড়ে নেওয়ার জীবনবোধ আকাঙ্ক্ষা করছেন । আর যেখানে প্রত্যেকটা মানুষ সে নিজে তার ভাগ্য নির্মাণ করতে পারবে তার অন্তরঙ্গ আলো সুবাস প্রেম দিয়ে। ব্যক্তিপ্রেম মানবপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম এক নতুন মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে এই ভাবনার মধ্যে।

বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য উত্তরপূর্বাঞ্চলের বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে কবিতার জগতে তাঁর শিল্পীসত্তা সবচেয়ে সুন্দরভাবে বিকশিত হয়েছে। এ অঞ্চলের কবিতাজগতে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯৬৭ সাল থেকে 'সাহিত্য' পত্রিকার দ্বারা এ অঞ্চলের সাহিত্যকে আলাদা একটা মাত্রায় সঞ্চারিত করেছেন। একটা কথা মানতে হবে এ অঞ্চলের কবিতাকে প্রথম আধুনিক করে তুলেছিল 'স্বপ্নিল' (১৯৫৭) এবং 'অতন্দ্র' (১৯৬৩) পত্রিকা দুটি। এই দুটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার অবদান এ অঞ্চলে প্রায় কিংবদন্তিতে পরিণত। এই দুটি পত্রিকার যোগ্যতর উত্তরসূরী হল 'সাহিত্য' (১৯৬৭) যা আরও সমৃদ্ধশালী দীর্ঘজীবী। এখনও অবিরাম এই অঞ্চলের সাহিত্যধারাকে প্রকাশ করে যাচ্ছে 'সাহিত্য'। আর বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য তার প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছেন প্রথম থেকে আজ অবধি।

এ অঞ্চলের কবিতায় আধুনিকতার বিকাশপর্বে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এবং তাঁর কবিতায় আলাদা একটা নিজস্বতা ও আধুনিকতা আছে। আর কবিতার ভাষাকে বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তিনি। তার মধ্যে দিয়ে জীবন, সমাজ, সময়, ঐতিহ্য, পরম্পরা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে আলাদা একটা মাত্রা নিয়ে। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হল—'কেউ পরবাসী নয়' (১৯৭১), 'জেগে আছে স্তব্ধতায়' (১৯৮১), 'সুন্দর যেখানে খেলা করে' (১৯৯১), 'মহাভারত কথা' (২০০০), 'পুনর্ভবা' (২০০১) ইত্যাদি। এইসব কাব্যগ্রন্থের কবিতায় বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের আসল পরিচয় পাওয়া

যায়—তাঁর চরিত্রের বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য সহ। জীবন আর সময়ের, বাস্তবতা আর কল্পনার, অতীত আর বর্তমানের, ঐতিহ্য ও পরম্পরা আর আধুনিক সময়ের বিবর্তনের টানাপোড়েনে তিনি আলাদা একটা জগতকে প্রকাশ করেছেন নিজস্ব ভাষায়। নির্বাচিত কিছু কবিতা বিশ্লেষণ করে তা দেখানো যাচ্ছে।

কেউ পরবাসী নয়

''বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই আধুনিক জীবনদৃষ্টির সূচক ও প্রকাশক হিসেবে কবিতার নান্দনিক অস্তিত্বকে বিচার করেছেন। এও তাঁর প্রত্যয়ের মৌল উপাদান যে প্রাকরণিক বিন্যাস দিয়েই কবিতায় সময়কে চেনা সম্ভব। বিষয়ের চেয়েও আঙ্গিক তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতায় যখন ধীরে ধীরে আধুনিকতার আদল গড়ে উঠেছিল, সে সময় পশ্চিম বাংলার প্রকরণবাদী শ্রুতি আন্দোলন-সহ আন্তর্জাতিক কবিতা-পরিসরের দ্যুতি তাঁর কবি মনকে আকৃষ্ট করে। এই জন্যে লক্ষণীয়ভাবে তিনি কবিতার নির্মিতির প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং স্থপতির মতো বিবেচক অধ্যবসায়ে গড়ে তোলেন কবিতার স্থাপত্য। নিজস্ব কবিতায় ভাষা খুঁজতে খুঁজতে তিনি শুধু আলাদা পথরেখা নির্দেশ করেননি, পাথেয় তৈরি করে নিয়েছেন। আর, সবকিছুর ওপরে রয়েছে আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও প্রতিক্রিয়া।''[৩৬]

কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের কবিতা চর্চা করতে গিয়ে সমালোচক এই কথাগুলি বলেছেন। আর ঠিকই বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের কবিতা পড়তে গিয়ে সবচেয়ে আগে যে জিনিসটা চোখে পড়ে তা হল তাঁর কবিতার ভাষা। আর এই নিপুণ ভাষা দিয়ে তিনি জীবনকে তুলে ধরেন কবিতার শরীরে। 'কেউ পরবাসী নয়' এই কবিতাটি তার একটা উজ্জ্বল উদাহরণ। কবিতাটির শুরু এভাবে—

''কেউ পরবাসী নয়, ঘনিষ্ঠ দু'চোখে দেখ মানচিত্র
দু'হাতে প্রদীপ ঢেকে উঠোন পেরিয়ে যাওয়া প্রতিবেশিনীর মতো
হাওয়ায় নিপুণ পায়ে রেখাচিত্র এঁকে
তুমি চল নিজ নিকেতনে।''

এই কবিতায় কবি মানুষের পালাবদলের কথা বলেছেন। যে পালাবদল হল চরিত্রের, ব্যক্তিত্বের, অস্তিত্বের। প্রথম স্তবকেই কবি মানুষের জীবনের মানচিত্র দেখার কথা বলেছেন। নিজস্ব একটা নিকেতন পাকা করতে চান। নিজের আলো নিয়ে খুব নিপুণভাবে পথ তৈরি করে। যাতে কোনও ধরনের অসুবিধা হয় না। কারণ মানুষ যে পথ নির্মাণ করে যে রকমভাবে ঠিক সে রকমভাবেই সে ঐ পথে হাঁটে। এবং জীবনকে নিয়ে এগিয়ে যায়। এই কথা বলে কবি বলছেন—

''নিজস্ব স্বভাবে আছে বর্ণবোধ, ট্রাপিজের খেলার নিয়ম
ঘর বাড়ি, দর্শকের সীমিত আসন; প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে
বাস কিংবা পরবাস নির্ধারিত হলে আকাশবাণীর মতো
প্রচার যন্ত্রেরও কণ্ঠে শোনা যেত দৈববাণী।
তীর্থযাত্রীর বেশে অলকার মুখে মুখ রাখি
শুভ্র বুক খুলে যায়, ঘুম ভাঙানিয়া স্তনে শিশুর মতন নড়ে ঠোঁট
কেউ পরবাসী নয়, ঘনিষ্ঠ শরীর জুড়ে শরীর তো নয়
অভিজ্ঞান, মন চল নিজ নিকেতনে।''

কবিতার শারীরিক প্রকরণে জীবনের ছবি কত গভীরভাবে তুলে ধরেছেন এখানে। নিজের স্বভাব সম্পর্কে মানুষ অনেক ভালো করে জানে। কারণ মানুষ তার পথহাঁটার মধ্যেই বেঁচে থাকে। এখন মানুষের সময় নেই অন্য মানুষের

জন্য। আর আজকের যুবকযুবতীদের জীবনধারণ তো অন্যরকম—কৃত্রিম, মেকি। তারা 'নিজ নিকেতন' কিভাবে গড়বে এই পরবাসে?

এখানে সবাই যেন এক ধরনের পরবাসী। আসল বা স্থায়ী ঠিকানা নেই কারুর। নিজস্ব মাটিতে থেকেও মানুষ কিভাবে পরবাসী হয়। তার একটা অভাস আছে এখানে। আবার কবি অন্যরকমভাবে বলছেন এই পরবাসটা কিন্তু আসলে স্থায়ী আবাস। কারণ আমরা তো এভাবেই বেঁচে আছি বহু যুগ ধরে। আমাদের শরীর তো চলছে এখানে ঘনিষ্ঠভাবে। তা তো আমাদের বেঁচে থাকার বড় প্রমাণ—একমাত্র অভিজ্ঞান। মনে হয় তাই কবি এই রকম—জীবনধারনেই জীবনচর্চা চর্যাকে প্রাকৃত করতে চান। তাই কবি আবারও উচ্চারণ করলেন ''মন চল নিজ নিকেতনে।''

কবি দেখেছেন গ্রামীণ জীবন। দেখেছেন নাগরিক জীবন। আর দেখেছেন এই দুই পৃথিবীর জীবনধারণ—টানাপোড়েন। আর সেই সব জীবনের যান্ত্রিকতা কিভাবে আসল জীবনকে গ্রাস করছে সে কথাই কিন্তু কবি বলতে চাইছেন। এবং ফিরে যেতে চান মানে অর্থশীল জীবনে। যেখানে পাখি মানে পাখি, পাতা মানে সবুজ, মানুষ মানে মনুষ্যত্ব। তাই এই পরবাসকে কবি বলতে যাচ্ছেন অপরবাস।

''আশ্বিনে জ্যোৎস্নায় তুমি একা যেয়ো ধান জমি দিয়ে
ছায়াকেও ঘিরে চলে হিরণ্ময় লোক,
পূর্বপ্রস্তুতি আছে, ভিন্ন পোশাকে এসে সাম্রাজ্য দর্শন
ভ্রমণ তো নয় ভ্রমবশে, কেউ পরবাসে নেই
ফিরিঅলা দূরে যায় রেলট্রেনে একা...
মন, তুমি চল নিজ নিকেতনে।''

কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য কিন্তু সচেতনভাবে কবিতা রচনা করেন। আর তিনি চান পাঠককে একটা নয়া চেতনা দিয়ে যেতে। যে চেতনা জীবনের জটিলতাকে পরিচিত করে দিতে চায়। আজ মানুষের মন যান্ত্রিকতাকেই ভালোবাসে। কিন্তু কবি মানুষের মনকে বলছেন যে আশ্বিনের সবুজ ক্ষেতের উজ্জ্বল রূপ দেখার জন্য। কারণ কবিও বিশ্বাস করেন যে মানুষের মুক্তি একমাত্র প্রকৃতিতে। এখানে কবি বলছেন যে সব মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে বা অন্যভাবে বলা যায় প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখার সে রকম চোখ আছে তারা কিন্তু ছায়াকেও অনেক গভীরভাবে দেখতে পারে। এই বয়ানের মধ্যে কিন্তু চেতনার রঙ বড় হয়ে উঠছে।

জীবনের খুঁজে মানুষ বিভিন্ন পোশাকে বিভিন্ন পথে হাঁটতে থাকে। কিন্তু একটা সুন্দর মার্জিত জীবন তৈরি করতে অনেক দিনের পথহাঁটা লাগে। আর এই পথহাঁটায় কিন্তু জীবনকে চাষ করে করে এগিয়ে যেতে হয়। তা না হলে জীবনের বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় না। এই গভীর সত্যটা বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য তাঁর কবিতার শরীরে ধারণ করেছেন।

আরেকটা কথা 'কেউ পরবাসী নয়' কবিতার মধ্যে কবি তিনবার ব্যবহার করেছেন একটা বাক্যবন্ধ 'চল নিজ নিকেতনে'। এখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে এই নিকেতনটা কি? কোথায়? কেন চাই তা? এই সব প্রশ্নের পরমুহূর্তে মনে হয় কবিতাটির নামের মধ্যেই কিন্তু অনেকটা উত্তর লুকিয়ে আছে তার। কেউ পরবাসী নই কিন্তু আমরা এখানে। আবার নিজের মাটিতে থেকেই আমরা সবাই এক ধরনের পরবাসী। তাই একটা স্থায়ী নিকেতন ঠিকানা বড় প্রয়োজন। যাতে আমরা পরবাসহীনভাবে বাঁচতে পারি। কারণ মধ্যবিত্ত সমাজের ভেতরেই কিন্তু সকল জটিলতা জঞ্জাল কষ্ট দুঃখভোগ ইত্যাদি। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কবি একটা স্থায়ী ঘরের কথা বলছেন যে চল আশ্রয় নিই একটা ঘরে যেখানে সবকিছু নিজস্ব আপন। এই কথাটা কী উপনিবেশোত্তর চিন্তার ধারক বাহক নয়! এখানে কবিতাটি সার্থকতার চূঁড়ায় পৌঁছে যায়।

অন্য চোখে সমস্ত পৃথিবী

''বরাকের মন্থর সমাজে সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের আয়তন নির্বোধভাবে ব্যক্তিসত্তার উপর অগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে; তবু ক্রমশ মধ্যবিত্তবর্গ ঐতিহ্যোত্তর অবস্থানে পৌঁছে জীবন ও মননের অনন্বয়কে নতুন তাৎপর্যের সূচক হিসেবে নিতে চাইছে। বিজিৎ কবিতার ভাষায় ওই দুই অবস্থানের দ্বন্দ্ব ও কূটাভাসকে প্রকাশ করেছেন।''[৩৭]

সমালোচকের এই মন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের অন্যতম একটা শ্রেষ্ঠ কবিতা 'অন্যচোখে সমস্ত পৃথিবী' কবিতায়। এখানে কবি ব্যক্তিসত্তার কথা বিশেষ ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। যা ব্যক্তিকে পার হয়ে গিয়ে নৈর্ব্যক্তিকতায় পৌঁছে গেছে। কবিতাটি শুরু এভাবে—

''তুমি পাঠিয়েছ এক তেজী যুবা, বলেছি নিশ্চিত যাব
কোনো দিকে যাই না এখন;
দু'হাতে সযত্নে পাতি আরামকেদারা, হরিণী কেমন এসে
নিশ্চুপ শুয়ে পড়ে''

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে 'কে পাঠিয়েছে'? এই তেজী যুবা কে? কিন্তু কবিতাটির প্রথম স্তবকেই তার উত্তর মিলে যায়। এই পৃথিবী বা প্রকৃতিই পাঠিয়েছে। এই তেজী যুবা তো আসলে কবি। জীবনের সন্ধান, চর্চা, চর্যা, চাষ করার জন্য এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছে প্রকৃতি। এটা কিন্তু কবির বাইরের 'আমি'। কিন্তু কবি এখনো বসে আছেন কোথাও যায়নি। তারপরে দু'হাতে আরামকেদারা পাতেন। আর তাঁর ভেতরের 'আমি' একা নিশ্চপ হয়ে পড়ে এখানে এই আরামকেদারায়। অর্থাৎ কবি বাইরের আর ভেতরের আমিকে মেলাতে পাচ্ছেন না যা তাঁর অন্বিষ্ঠ। এই পৃথিবীতে অনেক কিছু করার ছিল তার কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না। তাঁর জীবনের একটা উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু কী করতে পাচ্ছেন? এই বোধটা কবিকে তাড়া করছে। তাই পরবর্তী স্তবকে বলছেন—

''আমি গেরস্থালি করি, যে অদ্ভুত ঘড়ি সৌভাগ্যের যৌতুক আমার
বহুবার থেমে যায়, এইখানে সময় তোমারই, তুমি
কোনো এক মুহূর্তকে যতক্ষণ খুশি রেখে দাও,
অথবা নিজেই থেমে
দেখ শুধু শুভ্র পায়ের পাতা, কপালে সিঁদুর।''

নিজের অবস্থান প্রকাশ করতে গিয়ে কবি বলছেন যে তিনি সাধারণ মানুষ থেকে বেশি দূরে নয়—তিনিও গেরস্থালি করে বেঁচে আছেন। আর তাঁর সৌভাগ্যের 'অদ্ভুত ঘড়ি' অর্থাৎ সময়টা অনেকবার থেমে যায়। এখানে ভেতরে ভেতরে একটা কথা পাচ্ছি যে কবির জীবনযাপনের মধ্যে একঘেয়েমির মাত্রা অনেক বেশি লুকিয়ে আছে মধ্যবিত্ত মানুষের গৃহস্থ জীবনের মতোই। আর এই সময় অবসর ইত্যাদি সব কিছুই তাঁর দ্বৈতসত্তার। একটা জায়গায় নিজেকে অনেকক্ষণ রেখে দেয় তাঁর সময়। তার ফাঁকে ফাঁকে পারিবারিক জীবনের রূপ প্রকাশ পায় ঘর, স্ত্রীর উষ্ণ ছোঁয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ সংসারের মায়া তাকে আবৃত করে আছে বড় নিবিড়ভাবে।

তারপর নিজের সামাজিক রূপ প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন—

''আমি বহুদূর; প্রচারযন্ত্র ঘুরে গ্রামে কিংবা চায়ের বাগানে
ঘুমের ভিতরে ভাসে তোমাদের রাতজাগা কণ্ঠস্বর,
বিপুল শহর এখনো তো নীরবতাময়, তুমি পাঠিয়েছ এক জিপগাড়ি
আড়াআড়ি দ্রুত ছুটে যায়, আমি আজ কোনো দিকে
যেতেই পারি না

সময় কি এভাবেই থেমে যায়, না কি এই পরম শূন্যতা
যতই সযত্নে পাতি আরাম কেদারা, হরিণী নিশ্চুপ এসে শুয়ে পড়ে।"

কবির সাথে পৃথিবীর মানুষের অনেক দূরত্ব বেড়ে গেছে আজ। মানুষের থেকে তিনিও নিজের মুদ্রাদোষে আলাদা হয়ে গেছেন জীবনানন্দের মতো। এই জিনিসটা গ্রাম বলো আর চা-বাগান বলো আজ সবখানে মানায়। আর যে সকল মানুষেরা কবির বিপরীতে অর্থাৎ বিলাসী রঙিন মানুষ হয়তবা অতিবাস্তবতাপূর্ণও। তাদের ভেতরের চিৎকার কবি শুনতে পান। তারা কেউ আজ আর শান্তিতে ঘুমাতে পারে না। কারণ নাগরিকতাপ্রিয় জীবনে জটিলতা যান্ত্রিকতায় তাদের জীবন আবৃত করে নিয়েছে। আর এই সব ভয়ঙ্কর আর্তনাদের পরও শহর নীরবতায় আচ্ছন্ন।

কিন্তু 'তেজী যুবা' সব কিছু চুরমার করে জিপগাড়ি নিয়ে তার জীবনকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। তবে চারপাশ তার কী জিপগাড়ির মতো দ্রুতগামী বেগের উপযোগী? ভেতরের একটা সত্তা তার 'বন্দি বিহঙ্গ'। সে ভেতর থেকে এতকিছু ভাবে জাগে চিন্তা করে। কিন্তু যখন বাইরের সত্তাটা পারিপার্শ্বের মধ্যে তা মাপ করে বা ওজন করে তখন সব কিছু শূন্যতায় মিলিয়ে যায়। তাই আজ কবি বা তেজী যুবা কিছুই করতে পারছেন না। কোনওদিকে যেতে পারছেন না। তার সময় এভাবেই থেমে থাকে। হয়তবা এটাই পরম শূন্যতা। এই সব টালমাটাল পরিবেশে যতই আরামের কেদারা ঠিক করেন তার ভেতরের হরিণী অর্থাৎ শক্তি উদ্যম গতি তেজ শুয়ে পড়ে নিশ্চুপ হয়ে। তার মূল কারণ আজ কবি নিজেকে নিজের সাথে মেলাতে পারছেন না। মাঝখানে এক বিশাল ফাঁক থেকেই যায় সব সময়।

তবুও কিন্তু শেষ দুটি লাইনে একটা সামগ্রিকতাকে ধরতে চেষ্টা করেছেন কবি—

"দেখি তার এক চোখে ধরেছে নিসর্গ দৃশ্য
অন্যচোখে সমস্ত পৃথিবী।"

কবিতাটিকে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে একটা গতিময়তা আছে। যার বেগ খুব দ্রুত। ব্যক্তি, পরিবার, সমষ্টি, সমাজ, সমস্ত পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে এগিয়ে যাওয়া জীবন চর্চা চর্যা ও চাষের মধ্যে দিয়ে। তাই শেষে কবি দেখতে পেয়েছেন তেজী যুবার একচোখে নিসর্গ দৃশ্য আর অন্য চোখে সমস্ত পৃথিবী। এই দু'টা চোখে সবকিছুকে ধারণ করে কবিতাটির সমাপ্তি করেছেন। আর এখানে উচ্চকণ্ঠে বলতে সাহস পাচ্ছি কবিতাটি এক অনন্য গভীরতাপূর্ণ কবিতা। এবং আসলে এই তেজী যুবার সত্তাটাই হল কবির সত্তা। কারণ এই কবিতাটিতে তার ব্যক্তিচরিত্র গভীরভাবে ফুটে ওঠেছে। কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের চরিত্রের কথাটা কবি রণজিৎ দাশের ভাষায় প্রকাশ করছি—

> *"বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য। আপনি রোমান্টিক নন, বাস্তবজ্ঞানীও নন (যদিও এ দুটি গুণ আপনার মধ্যে স্বাভাবিক মাত্রায় আছে)। আপনি, আপনি হয়তো শাক্ত। পদার্থবিদ্যা এবং পাউণ্ডের প্রবন্ধ মিলে আপনার চরিত্র গঠিত। এক বিশাল নৈঃশব্দ্যের চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে কথারা কিভাবে বিক্ষিপ্ত হয় কখনো প্রলাপে, কখনো বিলাপে, কখনো গানে, আপনি যেন এই প্রক্রিয়াটিই পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন।"*[৩৮]

সুন্দর যেখানে

> *"বিজিতের কবিতা পড়ে বুঝতে পারি কেন চেতনার জাগরণ ঘটে জগতের সঙ্গে আমাদের ভঙ্গুর সম্পর্কসূত্র উপলব্ধির ফলশ্রুতি হিসেবে। পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মৌলিক ওই ভঙ্গুর তার চলচ্ছবি বিজিতের কবিসত্তায় প্রতিফলিত হয়েছিল, তাই একে বলা যেতে পারে সময়ের আত্মগত অভিজ্ঞতা।"*[৩৯]

সমালোচকের এই চেতনাঋদ্ধ বাক্যবন্ধটির একটা বড় প্রমাণ পাওয়া যায় কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের 'সুন্দর

যেখানে' কবিতাটির মধ্যে। এই বোধটা এখানে গভীরভাবে মিশে আছে। সমালোচক যাকে বলছেন 'সময়ের আত্মগত অভিজ্ঞতা'। কবিতাটির শুরু এভাবে—

"তাকে শেষ অব্দি দেখি'
এই বোধ, এই ভালোবাসা
এখনো আমার মধ্যে জেগে ওঠে।"

কাকে শেষ অব্দি দেখতে চান কবি? এটা আবার একটা বোধ। এই বোধটা কি? এই বোধটা আবার ভালোবাসাও কিন্তু। কি এই ভালোবাসা? কবির ভেতরে যা আজও জেগে ওঠে।

পৃথিবীটা বড় জটিল অন্ধকারে আবৃত আজ। এখানে মানুষ নিজের অস্তিত্বটাকে ভালোভাবে টিকে রাখতে পারছে না। সেখানে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি অনুভব করার মতো সময় কার? কোথায়? তবুও কবি পৃথিবীর মানুষের মতো যান্ত্রিকতায় কৃত্রিমতায় হারিয়ে না গিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে পারেন আজও। কারণ কবি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। এবং তিনিও কীট্‌সের মতো বিশ্বাস করেন—

"Beauty is truth, truth Beauty"[14]

অর্থাৎ তার সৌন্দর্যও সত্যের প্রতিশব্দ। তাই তিনি উচ্চারণ করতে পারেন এইরকম বাক্যবন্ধ। এই সৌন্দর্য জিনিসটা আসলে একটা 'বোধ'—আসলে একটা 'ভালোবাসা'। যা সকলের কাছে ধরা দেয় না—দিতে পারে না। কিন্তু কবির এই বোধ আবিষ্কারের ক্ষমতা আছে—ভালোবাসারও। তাই কবি দ্বিতীয় স্তবকে বলছেন—

"তাকে বারান্দার থেকে
টেনে নিয়ে যাই ঘরে
বারান্দায় মানুষেরা
কেমন উদাসী মনে হয়।"

বারান্দার উদাসী মানুষের সারি থেকে কাকে কবি ভেতরে টেনে নিয়ে যান উদাসীনতা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য? এখানে মনে হয় কবির প্রিয়া হবে নিশ্চয়! কারণ প্রেমিক কবিও জানেন কোনও ধরনের সম্পর্ক ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না পৃথিবীতে। যদিও সৌন্দর্যের কোনও রঙ নেই, সম্পর্ক নেই, আকার সেই, আয়তন নেই। সে তো উপমাহীন—সবার উপরে। কিন্তু সৌন্দর্যের একটা ধারক বাহক তো চাই। তাই কবি হয়তবা প্রিয়াকে ভেবেছেন মনে মনে। যাকে উদাসীন দেখতে পারেন না তিনি। তাঁর বুক বা ভেতর কষ্ট পায়।

এই পৃথিবীটার অদ্ভুত আঁধারে আজ প্রায় সবাই ঘর ছেড়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে আজ। এই জায়গা থেকে কবি সৌন্দর্যকে আর তাঁর প্রিয়াকে মুক্তি দেয়ার জন্য এই পট পরিবর্তন করেন। এখানে যে যে রকম বাঁচুক, কবি চান সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে।

পরবর্তী অর্থাৎ শেষ স্তবকে অন্যরকম ভাব প্রকাশ করছেন—

"ঘরের ভিতরে তাকে
চলাচলে মুক্ত করি
আজ আমি একা একা তাকে দেখি
শেষ অব্দি দেখি
সুন্দর যেখানে খেলা করে।"

এই ঘর কিন্তু কবির একেবারে নিজস্ব ঘর। যেখানে বাইরের নষ্ট পৃথিবীর কোনও বাতাস পৌঁছায় না। এই নিজস্ব ভুবনে কবি তাকে মুক্ত করে তার সৌন্দর্য দেখেন। কবি একা একা এই সৌন্দর্যে ঘেরা তার নিজস্ব পৃথিবীকে দেখেন।

তাঁর প্রিয়ার অস্তিত্ব মিশে আছে কিন্তু তাঁর গভীরে কোথাও না কোথাও। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত দেখেন—দেখতে পারেন। সৌন্দর্য যেখানে খেলা করে তার আঁচল বিছিয়ে।

এই কবিতাটির ভেতরে কবি পরোক্ষভাবে দেখিয়ে দিচ্ছেন সৌন্দর্যের আবিষ্কার। যদিও সৌন্দর্য আজ কিছু মানুষের জন্য বেঁচে আছে। সৌন্দর্যবোধটাকে সৌন্দর্য ভালোবাসাটাকে কবি প্রচার করতে চান এখানে। কারণ সৌন্দর্য ছাড়া জীবন, পৃথিবী পানসে হয়ে যায়। জীবনটা নিয়ে ভালোভাবে বাঁচতে হলে সৌন্দর্যবোধ সবচেয়ে বড় রঙ। যা জীবনকে রঙিন করে। হয়তবা কবি সে কথাই দেখাতে চেয়েছেন কবিতাটির মধ্য দিয়ে।

পুনর্ভবা

'পুনর্ভবা' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটি কবি মনোতোষ চক্রবর্তীর চিঠির সূত্রে লিখেছেন—উত্তরস্বরূপ। কবিতাটিকে ভাবতে পারি দুই কবির কথোপকথন—যা গভীর অর্থময়। কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে—

''এখানে নদীর নাম পুনর্ভবা
প্রাণ সাগর গ্রামের নাম
আমি হঠাৎই এসেছি এই হাটুরে জায়গায়
এসে অব্দি তাঁবুর সন্ধানে আছি।''

প্রাকৃত জীবন থেকে আমরা আজ কতটুকু সরে গিয়েছি। এবং যে জীবন বরণ করে নিয়েছি তা কত বীভৎসতম কণ্ঠকময়। তা ক্রমে বুঝতে পারছি এখন। হয়তবা সেটা নরকবাসও বলতে পারেন। তবুও এইরকম জায়গায় বাস করেও মানুষ মেকির আড়ালে ছদ্মজীবনধারণ করে বেঁচেও কোনও দুঃখভোগ নেই তার। অর্থাৎ মুক্তির পথসন্ধান নেই। কিন্তু কবি এখানে হঠাৎ করে এসে এই বাজারি জায়গায় এখন পর্যন্ত একটা তাঁবু খুঁজছেন—এই মুখোশ পরা জীবন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার জন্য। এখানে মানুষ বড় অসহায় সংকীর্ণ। যদিও এখানে নদীর নাম 'পুনর্ভবা' আর গ্রামের নাম 'প্রাণ সাগর' রাখা হয়। আসলে তার অর্থমানে আরও অন্যকিছু হয়—হয়ে যায় এখানে।

এখানে কবি যেরকম পারিপার্শ্বিকে বেঁচে আছেন নিজেকে নিয়ে। তা বড় অন্যরকম হাটুরে জায়গা। তাই কবি নিজস্বতা বাঁচিয়ে চলার জন্য একটা তাঁবু খুঁজছেন। তারপর কবি বলছেন—

''ক্যাম্পের জীবন কতদিন কাটাতে হবে এখনও জানি না
স্বস্তিতে থাকার মতো বাড়ি খুঁজে পাওয়াও কঠিন।''

'ক্যাম্পের জীবন' কথাটা শুনার সঙ্গে সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের 'ক্যাম্পে' কবিতাটির কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে মানুষেরা শুয়ে থেকে কেবল শুকায় তাদের হৃদয়। কবিও ভাবছেন এই রকম বৃত্তবন্দি জীবন আর কতদিন তিনি কাটাবেন। চারদিকে সমস্ত ভালো জিনিসকে সমূলে ধ্বংস করার যে প্রস্তুতি আর জয় জয়কার অর্থহীন মিথ্যা উল্লাস। সেখানে তিনি নিজের অস্তিত্বকে নিয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। আর ভাবছেন সবদিকে এত মুখোশ স্বস্তিতে বেঁচে থাকার জন্য একটা স্থায়ী আবাস খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন। কবিও নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন না এই মায়াজাল আবৃত ক্যাম্পের জীবনে। তাই পরবর্তী স্তবকে বলছেন—

''আমি অন্য কিছু খুঁজি অন্য চোখে
তাঁবুর সন্ধান করি
ভিন্ন গ্রামে নয়, যেখানে বিষণ্ণতা
আমাকে পেয়েছে এই প্রাণ সাগরেই''

এই রক্ষণশীল বৃত্তবন্দি জীবন থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে কবি খুঁজছেন একটা তাঁবু—অন্যরকম চোখে । কিন্তু

কবি যেখানে বেঁচে আছেন সে গ্রামেই এই তাঁবুর সন্ধান। কারণ তিনি জানেন এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই জায়গাও নেই। যেখানে সমস্ত বিষণ্ণতা তাকে ঘিরেছে—এই প্রাণ সাগরেই তিনি মুক্তি দিতে চান নিজেকে। এই মুক্তি কিন্তু শুধু নিজেকে নয়। এই মুক্তির পথ খুলে দিতে চান সমস্ত মানুষের হয়ে। অর্থাৎ একটা পথ আবিষ্কার করে দিতে চান।

এখানে একটা কথা মনে পড়ে যা আমরা সচরাচর খেয়াল করি না যে দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমরা এত মশগুল হয়ে যাই যে কীরকম আমরা বৃত্তের ভেতরে বন্দি হয়ে যাই টেরও পাই না। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারি কখনও কোনদিন। তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। হয়তবা মুক্তির কথা ভাবাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই বৃত্তে বন্দি হওয়ার জন্য এত আর্তনাদ আয়োজন! এই সব দেখে কবি নীরবে তাঁবুর সন্ধান করছেন। যেখানে নদীর নাম অর্থাৎ সময়ের নামটা হল পুনর্ভবা। এ জন্যই শেষ লাইনটাও প্রথম লাইন রেখেছেন—

''এখানে নদীর নাম পুনর্ভবা।'

অর্থাৎ কবিতাটি যেখানে শুরু সেখানেই শেষ হয়েছে এসে। কারণ সময় তো চলমান। কোথায় তার শেষ? আর নদী তো চলমান সময়ের প্রতীক। কবি জানেন—বিশ্বাসও করেন যে সময় চলে যায়নি। অধ্যবসায়ের দ্বারা আমরা এই বৃত্তবন্দি ভোতা জীবনকে উজ্জ্বল করতে পারি—নিজেকে মুক্ত করতে পারি। এই পথে কবি হেঁটে একটা পথ খুঁজছেন যেখানে মানুষের মুক্তি হবে মানুষের চেতনায়। হয়তবা তাঁবুর সন্ধানে। এ তাঁবু হচ্ছে জীবনকে সুরক্ষা করে রাখার হাতিয়ার।

মহাভারত কথা

''বরাকের অচলায়তনে যিনি তাঁর কাব্যবীজ সন্ধান করবেন, আধেয় এবং আধার—এই দুটি ক্ষেত্রেই তাঁকে পদে পদে যুদ্ধ করতে হবে মুখ্যত নিজের সঙ্গে এবং তারপর নিশ্চরিত্র প্রেক্ষিতের সঙ্গে। পশ্চাৎপরতার সমস্ত চিহ্ন উপড়ে ফেলে স্বত-আরোপিত আধুনিকতার আদল, অন্তত প্রাকরণিক বহিরঙ্গে, প্রতিস্থাপিত না করে তিনি স্বস্তি পাননি। এই প্রকরণের বোধের জন্যে রৈখিকতা ভেঙেছেন যাতে প্রতিবেদনে বহুস্বরন্যাসের উপযোগী বাচন ও প্রতিবাচনের ক্ষেত্রে তৈরি হতে পারে। কবিতার ভাষায় এই বিনির্মাণ দিয়ে নির্মাণে পৌঁছানোর ইশারা বিজিৎ করেছেন। প্রতীক থেকে বিবরণে গেছেন কখনো, আবার বিবরণের পথ দিয়ে প্রতীকের গভীরে যেতে চেয়েছেন।''[৪০]

উপরের এই মন্তব্যের একটা গভীর প্রমাণ পাই কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের 'মহাভারত কথা' কাব্যের নাম কবিতাটিতে। সমালোচকের বক্তব্যের একটা উজ্জ্বল উদাহরণও মনে হয় এই কবিতাটি। জীবনের মাঠে পথে চলার জন্য মানুষ নিজেকে আর নিজের দিককেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ভালো খারাপ দোষগুণ সত্য মিথ্যা এইগুলি আজ যেদিকে টাকা বেশি ক্ষমতা বেশি সেদিকেই তার পাল্লা ভারি। এইরকম মানবতাহীন জীবনযাপন দেখে কবি বিস্ময়ে মানবতার পরাজয় দেখে জয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। এবং সত্যের। গুণের হেরে যাওয়াটা তুলে ধরেছেন কবিতাটিতে। কবিতাটি শুরু হয়েছে অতীতের উদাহরণ আর মিথের কথা দিয়ে—

''যখন শুনিলাম, শকুনি অচিন্তনীয়-শক্তি-ভ্রাতাগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে
পাশা খেলায় পরাজিত করিয়া রাজ্যহীন করিয়াছে এবং আমার পুত্রেরা
আনন্দ উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে,
হে সঞ্জয়, তখন আমি আর জয়ের আশা করি নাই।''

পুরাণের মাঝখান দিয়ে বর্তমানকে তুলে ধরেছেন যে আমরা আজ কত সংকীর্ণ স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক জীব। অতীতকে টেনে এনে বর্তমানকে গভীরভাবে তুলে ধরলেন যে বর্তমানটাও সেই অতীতের মিথ্যা জয়ের মতো কিছু বোধ নিয়ে মানুষ বেঁচে আছে। যা আসলে জয়ের যোগ্য তো দূরের কথা এখানে পরাজয়ের কথাও লজ্জাজনক।

যে 'মহাভারত' কথা সমস্তই সঞ্জয়ের মুখের কথা বর্ণনা। সেই সঞ্জয় নামক প্রতীককেই কবি অন্ধরাজ হয়ে বলছেন যে যখন শুনলাম কুচক্রান্তকারী শকুনির চিন্তায় কৌরবরা পাণ্ডবকে পাশা খেলায় পরাজিত করে রাজহীন করেছে। আর কৌরব নামধারী প্রতীকগুলি আনন্দ করছে তখন তিনি আর জয়ের আশা করেননি। কারণ তিনি জানেন ধর্মের পরাজয় হয়েছে—অধর্মের জয় হয়েছে। সত্যও হারিয়ে গেছে মিথ্যার অন্ধকারে। রাজ্য কৌরবদের মতো মানুষের হাতে চলে গিয়েছে। এখানে কবি কি তার পরিবার সমাজ মানুষ নিয়ে বাঁচতে পারবেন? যেখানে দৌপদীর মতো লক্ষ লক্ষ মহিলার কোনও সুরক্ষা নেই—কেবলই বর্বরতা। এই রকম জায়গায় বাস করে কি জয়ের আশা করা যায়? দ্বিতীয় স্তবকে বলছেন কবি—

> ''যখন শুনিলাম, অযোধ্যার ধ্বংসলীলার সংবাদ আকাশবাণীতে ভাসিয়া
> আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্মপ্রাণ প্রতিবেশিরা শঙ্খনাদ সহ জয়ধ্বনি করিতেছে,
> ব্রতপরায়ণা মহিলারা উলুধ্বনি করিতেছে,
> তখন আমি আর জয়ের আশা করি নাই।''

এখানে মহাভারতের অনেক আগের অতীতের অনুষঙ্গ এনে অযোধ্যার ধ্বংস লীলার কথা বলছেন। এই অযোধ্যর ধ্বংসলীলা হল ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসলীলা। এই মানবতাহীন ধর্মপ্রাণ মানুষেরা আকাশবাণীতে খবর শুনে দেখে জয়ধ্বনি করল— মহিলারা উলুধ্বনি। কিন্তু কবি জানেন এটা নিশ্চিত পরাজয়। কারণ মানুষ নিজস্ব সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেছে কয়েক মুহূর্তে। এখানে কেউ আর ভারতবাসী রইল না। হয়ে গেল হিন্দু আর মুসলিম। এই বোধটা একটা অগ্নিগিরির মতো মানুষের ভেতর দখল করে নিল। এটা মানবতার চরম পরাজয় নয়? মানুষের মনে এই বিষ বুনে দিল মানুষ নামধারী অমানুষেরা। তখন কবি জয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষ জগতে আর প্রথম আসল লাভ করতে পারবে না। তাই তৃতীয় স্তবকে মহাভারতের পুরাণ কাহিনি দিয়ে প্রকাশ করছেন—

> ''যখন শুনিলাম, কর্ণ ও ঘটোৎকচ ভয়ানক যুদ্ধে রত, এই অবস্থায় ইন্দ্রপ্রদত্ত
> যে শক্তিদ্বারা কর্ণ অর্জুনকে বধ করিবে ভাবিয়াছিল সেই শক্তিটা সে
> ঘটোৎকচের উপরই নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছে,
> সঞ্জয়, তখন আমি আর জয়ের আশা করি নাই।''

এখানে দেখানো হয়েছে দেবতা অর্থাৎ উপরতলার মানুষেরা কীভাবে জয় নির্ধারণ করেন যুদ্ধের পূর্বে। এখানে বিশেষভাবে মনে পড়ে কবি মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের কথা। তিনি কি সুন্দর করে দেখিয়েছেন দেবীদেবতার কৌশল যুদ্ধ ছলনা তাঁর কাব্যের মধ্যে। যা এর আগে কেউ দেখানো তো দূরের কথা, চিন্তাও করেনি। আর অনেকদিন পরে বিজিৎকুমার এই জিনিসটা প্রকাশ করেছেন নিজের মতো করে। তিনি দেখিয়েছেন কর্ণ অর্জুনকে বধ করবে ভেবেছিল যে শক্তি দিয়ে সেটা তো ঘটোৎকচের উপর ফেলে দিয়েছে। অর্থাৎ কর্ণের শক্তি আর নেই অর্জুনকে বধ করার। এটা তো পূর্ব নির্ধারিত। অতএব কর্ণের মৃত্যু নিশ্চিত। এটা কী তোমার আমার বাস্তব নয়। আমরাও পদে পদে হেরে যাচ্ছি। কারণ পথ যারা নির্মাণ করছে তারাই নির্ধারণ করে দিচ্ছে কারা হাঁটবে। তাই এখানে আর জয়ের আশা রাখেন না কবি।

চতুর্থ স্তবকে কবি বর্তমান ভারতের একটা রূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন যেখানে মিথ্যা আনন্দ প্রলাপপূর্ণ জয়ধ্বনি করছে সবাই। কবি বলছেন—

"যখন শুনিলাম, আমাদের পূণভূমি মহাভারত পোখরানে পরমাণু বোমার
বিস্ফোরণের মাধ্যমে অসীম শক্তির পরিচয় দিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে,
জনগণ দিকে দিকে জয়ধ্বনি করিতেছে,
তখন আমি আর জয়ের আশা করি নাই।"

পূণ্যভূমি ভারতবর্ষকে আমরা এরকম জানতাম যেখানে জ্ঞানের জন্য শান্তির পূণ্যের জন্য মানুষ আসত দূর দেশ থেকে। যেখানে 'তক্ষশীলা', 'নালন্দা বিশ্বদ্যিালয়' ছিল। কিন্তু সেই ভারতবর্ষ আজ পরমানু বোমার বিস্ফোরণের মাধ্যমে অন্য এক বিপন্ন অসীম শক্তির পরিচয় দিচ্ছে পৃথিবীকে। আর জনগণ তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জয়ধ্বনি দিচ্ছে নির্বোধের মতো। যে ভারতবর্ষে লক্ষ কোটি মানুষ উপবাস থাকছে আজও, হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে, হাজার হাজার মহিলারা ধর্ষিতা লুণ্ঠিতা হচ্ছে। সেখানে এই রকম জয়ের কথা কি মানায়? এটা কি জয়? চিন্তা চেতনার কোনও উন্নতি নেই—কেবলই অবনতি। নৈতিকতা, মূল্যবোধ, বুনিয়াদ, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি রোগাক্রান্ত আজ, সেখানে প্রয়োজনহীন বাহুল্য উৎসব জয়ধ্বনি কী প্রয়োজন? না মানুষের উন্নতির জন্য চিন্তা করা। সে জন্যই কবি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে জয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে নিজের বোধটাকে প্রকাশ করছেন। কিন্তু পঞ্চম স্তবকে অন্যরকম একটা জিনিস প্রকাশ করেছেন। গুণ, যশ, খ্যাতি আর ভণ্ডামির কথা অন্যভাবে বলছেন—

"যখন শুনিলাম, জীবনানন্দ দাশ গভীর অর্থসংকটের দিনে অনেক অনেক গল্প
উপন্যাস লিখিয়া সমস্তই অপ্রকাশিত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এবং যখন
একজন রাজকবি বলিলেন তিনি কান চুলকানোর মতো অবহেলায় গদ্য
লেখেন অর্থের জন্য, তখন আমি আর জয়ের আশা করি নাই।"

সব মানুষেরা যে জীবনকে গভীরভাবে অনুভব উপলব্ধি করেন। সে সব শিল্পী গুণসম্পন্ন মানুষের আপামর জনগণকে অনেক কিছু দিয়ে যেতে চান কিন্তু সময় সুযোগ সুবিধা অনুকূল পরিবেশ তারা পায় না। এই উপযোগী পারিপার্শ্বটা গুণহীন বিলাসী অর্থলোভী মানুষেরা ছিনিয়ে নেয়। তাই জীবনানন্দের মতো জাত কবি গভীর অর্থসংকটে ভোগেই চলে যান এই পৃথিবী থেকে। চবুও সমস্ত ধরনের অসুবিধা সত্ত্বেও মানুষকে অগ্রসর সূর্যালোক দিয়ে যান তারা।

অন্যদিকে পৃষ্ঠপোষকতা সুবিধা প্রাপ্ত রঙিণ জীবনের অধিকারীরা বড় অবহেলায় অর্থের লোভে কিছু দিয়ে যেতে চান পৃথিবীকে। যা জীবনানন্দ দাশের মতো শিল্পীর শিল্পের কাছে শূন্য মনে হয়—অর্থাৎ তুলনা করাও বোকামি। এই রকম আমাদের চারপাশে অসংখ্য 'রাজকবি' আছেন যাদের যোগ্যতা খুব ক্ষুদ্র শিল্পীর সঙ্গেও তুলনা করা চলে না। কিন্তু মেকাপ করে নিজেকে এবং নিজের শিল্পকে বাজারের তালে বড় দামে বিক্রি করে দিতে পারেন—বিক্রি করেন। তখন কবি 'গুণ' এর ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেখে কবি জয়ের আশা করেন নাই।

শেষ বা ষষ্ঠ স্তবকে কবি অন্যরকমভাবে কটাক্ষ করে শেষ করেছেন কবিতাটি। কবি উচ্চারণ করছেন—

"যখন সেই অনামা কবি আমাকে বলিল, 'মহারাজ', আমাকে আর আপনার
আসনের পাশে বসিতে বলিয়া জনতার কাছে অপরাধী করিবেন না, তখন
রাজ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানকারী নিঃসঙ্গ কবির বিনীত মুখের দিকে চাহিয়া
আমি আর জয়ের আশা করি নাই।"

সেই 'রাজকবি' তাচ্ছিল্য অর্থে হয়তবা গভীর কটাক্ষ করে বলছেন তা। সেই (হয়তবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) অনামা কবি কবিকে বললেন যে সে যেরকম আছে তাকে সে রকমই থাকতে দিতে। কবিদের সারিতে না বসাতে। কারণ তিনি সেখানে অপরাধবোধ করেন। কারণ তিনি জানেন 'কান চুলকানোর মতো অবহেলায়' শিল্প রচনা করে মানুষের হৃদয়কে ধারণ করা কঠিন। যদিও বাজারে এইসব শিল্পের দাম থাকে অনেক—রঙিন মানুষের কাছে। বাজারিকরণের ফলে এইসব এই রকম 'রাজকবি'-র সামগ্রি চলে যায় বাজারে! আর মানুষেরা (বিলাসী মানুষেরা) শুধু বিনোদনের

জন্য তা গিলে খায় পাগলের মতো। তার একটা কারণ তিনি রাজার রাজ্যের কবি। অর্থাৎ সুযোগ সুবিধার ফলে উপরে উঠে গেছেন তাই 'রাজকবি'। গুণ থাকুক আর নাইবা থাকুক—প্রতিভাও। তখন 'মহাভারত কথা'র কবি জয়ের আশা ত্যাগ করে দিয়েছেন যখন তিনি দেখেছেন গুণ প্রতিভা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে গভীর অনায়াসে।

কবিতাটির আলোচনা করতে গিয়ে একটা জিনিস চোখে পড়ে যে কবি প্রতিটা স্তবকের শেষে একবার বলেছেন—

"আমি আর জয়ের আশা করি নাই।"

সুদূর অতীতপুরাণ থেকে উদাহরণ দিয়ে অতীত বর্তমানকে খুঁড়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, যে জয় জয়কার জয়ধ্বনি করেছি আর আজও করি তা তো জয়হীন—গভীর পরাজয়। আসল জয় তো তার পরাজয়টা ছিল। আর আজ সে রকম অসংখ্য মিথ্যা জয়ের উল্লাসে পৃথিবীটা মগ্ন। মানবিকতা, মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, বুনিয়াদ ইত্যাদি কিভাবে ধ্বংসলীলায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা ভোতা রক্ষণশীল বৃত্তবন্দি জীবনে সামন্ততান্ত্রিক ঔপনিবেশিকতাপূর্ণ জীবন নিয়ে বেঁচে আছি। যেখানে কেবল মানিয়ে নেওয়া আছে। কোনও প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা নেই 'কেন'? তাই শুধু পরাজয় আর পরাজয়।

উদয়ন ঘোষ

বিশ শতকের ষাটের দশকে বহু আলোচিত চর্চিত অতন্দ্র কাব্য আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তি। যিনি 'অতন্দ্র' নাম দিয়ে পত্রিকার জন্ম দিলেন। এবং পরবর্তী সময়ে এই কাব্য আন্দোলনই বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতায় পূর্ণ যৌবন এনে দিল। 'অতন্দ্র' বৃত্তের অন্যান্য কবির তুলনায় তাঁর ভাষা ভাব প্রকাশ স্বতন্ত্র্য ছিল। নান্দনিকভাবে তিনি কবিতাকে প্রকাশ করতে শুরু করেছেন প্রথম থেকেই। নাগরিক ব্যথা আছে তাঁর কবিতায়— কিন্তু অন্যরকম। কারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা শান্ত সুন্দর শিলং শহরে তাঁর জন্ম। হয়তবা কবি প্রথম কাব্য গ্রন্থের নাম 'ঝোপজঙ্গলের কবিতা' (১৯৯৪) রেখেছেন সে জন্যই। দীর্ঘ তিন দশক কবিতা লেখার পর তাঁর ঐ একটি মাত্র কাব্যই প্রকাশিত হয়ে আছে। তা ছাড়াও 'হরিশচন্দ্র' নামক একটি বলিষ্ঠ উপন্যাস আছে। এবং বলতে ভালো লাগে 'কমলকুমার বোধিনী' প্রবন্ধ রচনা করে (বরাক উপত্যকায়) প্রবন্ধ ধারায় আলাদা একটা মাত্রা যোগ করেছেন কবি। তবে এখানে কবি না একজন শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। তবুও তাঁর এই সব বহুমাত্রিক শিল্পীসত্তার মধ্যে কবিসত্তাটা প্রধানতম। তাঁর কবিতা পড়লে অনায়াসে তা ধরা পড়ে।

উদয়ন ঘোষের কবিতায় অস্তিত্বচেতনা এক বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে। সময়ের সমুদ্রে সাঁতরে কিনারা পেতে চান, কখনো অন্ধকারকে খুঁড়ে কখনো মৎসেন্দ্রনাথের মধ্যে—কখনো অতীতের দ্বারা নিজেকে মার্জিত পরিশোধিত সংশোধিত করতে চান কবি। আমরা নির্বাচিত কিছু কবিতা আলোচনা বিশ্লেষণ করে খুঁজব তাঁর জীবনবোধ সময় সমাজবাস্তবতা ইত্যাদি।

অন্ধকারকে খুঁড়েছিলাম

> *"অতন্দ্রবৃত্তের তৃতীয় প্রধান কবি উদয়ন ঘোষ আলাদা পথের পথিক; তিনি শক্তিপদ ও বিমলের সহযাত্রী হয়েও সতীর্থ নন। এবং এই দু'জনের তুলনায় কবিতার ভাষার নির্মিতি ও প্রয়োগে প্রাগ্রসর। নান্দনিক আধুনিকতার উপকূলরেখায় শক্তিপদ কখনো আভাসে কখনো স্পষ্টতরভাবে নোঙর ফেলেছেন আর বিমল দূর থেকে দেখেছেন তার বাতিঘরের আদল। অন্যদিকে উদয়ন প্রবল সপ্রতিভতায় এবং স্বচ্ছন্দ বিচরণে আবিষ্কার করেছেন ওই উপকূলসন্নিহিত ভূমির অবাধ অগাধ বিস্তার।"*[৪১]

সমালোচক কবি উদয়ন ঘোষ সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা দিয়ে দিয়েছেন। আর এই কথাটি একেবারে সম্পূর্ণ

উপযুক্ত কিন্তু। কারণ উদয়ন ঘোষের কবিতা পড়লে এই মন্তব্যটি আরও স্পষ্টভাবে সত্য হয়ে ধরা দেয়। তাঁর কবিতার মর্মমূলে আছে ব্যক্তি আর সমাজ, জীবন আর জগৎ, অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি অনুভব, সংস্কার আর ঐতিহ্যের বিনির্মাণ। এই কথাটির প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি 'অন্ধকারকে খুঁজেছিলাম' এই কবিতাটিসহ আরও অনেক কবিতা। এই কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে—

''অন্ধকারকে খুঁড়েছিলাম আলোর জন্যে
একাকী এই জনারেণ্যে
আলোর শরীর হাতড়েছিলাম যার খোঁজে কই
ত্রিতাপহরণ সে অন্ধকার?''

জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে আজ' পৃথিবীতে। কবি সেই অন্ধকারকেই কিন্তু খুঁড়েছিলেন আলোর জন্য। একা একা এই পৃথিবীর মানুষের ভিড়ে। আর 'আলোর শরীর' মন্থন করেছিলেন যে জিনিসটার খোঁজে তা কোথাও পাননি। উল্টো করে দেখেছেন সে তো ত্রিতাপহরণ অন্ধকার। এই কথাগুলির অর্থ দাঁড়ায়, পৃথিবীতে এই জনসমুদ্রে জনারণ্যে অপ্রাকৃত জীবনচর্চা চর্যার ফলে কেবল অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। মানুষের সংস্কারবোধ, মূল্যবোধ, শেকড়, ঐতিহ্য ইত্যাদি ঢেকে যাচ্ছে যান্ত্রিক জীবনের কালো ধোঁয়ায়। যুদ্ধ মন্বন্তর বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িক অমানুষিকতা ইত্যাদিও লুকিয়ে আছে কোথাও—কোথাও প্রাকাশ্যভাবে। সব মিলিয়ে জীবন নষ্ট ধ্বংস হয়ে যাওয়া আর ক্ষয় বিকলাঙ্গ করে দেওয়ার অন্ধকারকেই কবি মন্থন করেছিলেন প্রাকৃত শুদ্ধ সরল জীবনকে আলোকিত করার জন্য। এক শুদ্ধ আলো যা কবির একমাত্র উদ্দেশ্য—অন্বিষ্ঠও কিন্তু। দ্বিতীয় স্তবকে কবি ব্যক্তিগত (নিজের) পথ খুঁজেছেন বেঁচে থাকার জন্য—

''ওলোট পালোট তুমুল কাণ্ডে বিশ্বভুবন দাপিয়ে এখন
কোথায় আমার
মন্ত্রপূত সেই জলাধার
কোথায় নদী''

সামাজিকবোধ ঐতিহ্যবোধ ইত্যাদি এখানে রসাতলে। সব মানুষই একটা মায়ার চক্রব্যূহের মধ্যে ঘুরে বেঁচে আছে মরে মরে। যেখানে নিজস্ব কোনও পথ নেই—আছে কেবল বৃত্তবন্দি জীবন। আর আমরা ক্রমে অর্জন করে নিচ্ছি সেই নেতিবাচক জীবনবোধ। যা আসলে আধুনিক তো নয়ই—বরং কেবলই অবক্ষয় আর রং করা মেকাপ মুখোশের জয় আর্তনাদ চিৎকার ছাড়া কিছু নয়। এই জায়গা থেকে, বন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্য কবি ঐতিহ্যের জলাধার আর নদীর কাছে আশ্রয় নিতে চাইছেন।

কবিতাটির শেষ স্তবকে কিছু প্রশ্ন করে পাঠককের মনে অন্যরকম কিছু বোধের জন্ম দিতে চাইছেন। কারণ ভারতচন্দ্রের মতো কবিও বিশ্বাস করেন 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।' কবি তাই বলছেন— কোথায় নদী?

''কুলুকুলু ঘুমের পারে বনের ছায়ায়? কোথায় আকাশ
তাঁবুর কাপড় উড়িয়ে নেওয়া? রাতের পাহাড়
গড়িয়ে পড়া দুগ্ধ ধবল সে জ্যোৎস্নাসার
কোথায় আমার
ত্রিতাপহরণ সে অন্ধকার?''

বনের ছায়ায় ঘুমের পারে কবি খুঁজছেন কোথায় নদী? যে নদী দিয়ে কবি এগিয়ে যাবেন 'জনারণ্যে'। বৃত্তবন্দি জীবনে কোনও গতি নেই। আমাদের মাথার উপরে কোনও আকাশও নেই। রাতে জ্যোৎস্নাও নেই। অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। সেই সব জিনিসকে কবি পুনরোদ্ধার করার জন্যই কবি অন্ধকারকে খুঁড়তে চেয়েছিলেন। মানুষ জীবন প্রকৃতির

সৌন্দর্য ইত্যাদিকে অবক্ষয় থেকে বাঁচানোর জন্যই কবির অন্ধকার কর্ষণ। এই সব কথার মধ্য দিয়ে আমরা কবির গভীর জীবনবোধ সমাজমনস্কতা সংস্কার আর ঐতিহ্য প্রিয়তার পরিচয় পাই। যা কবি আমাদের কাছে পৌঁছাতে চান তাঁর কবিতাশিল্পের মধ্য দিয়ে। আর আমরাও যেন অন্ধকার খুঁড়ে আলো পাই—এবং জীবনকে আলোকিত করতে পারি অন্ধকার থেকে মুক্ত করে।

একদিন অনেকদিন ও তোমরা

''তাঁর (উদয়ন ঘোষের) কবিতায় প্রায়ই খণ্ড সময়ের চিত্র, অবক্ষয়ের করুণ চিত্রকল্প বিপথগামী চিন্তা-চেতনা ও পক্ষপাতগ্রস্ত চৈতন্যের ছবি ফুটে ওঠে। আবার টুকরো সময়ের ছবি যখন আঁকা হয় তাঁর কবিতায় তখনও প্রকৃত সময়ের ধারাবাহিকতাকে ভুলে থাকতে পারেন না কবি—''[৪২]

সমালোচকের এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় বেশি করে কবি উদয়ন ঘোষের 'একদিন অনেকদিন ও তোমরা' নামক কবিতাটিতে। এখানে কবি খণ্ড খণ্ড সময়কে এক জায়গায় করে অখণ্ড সময়ে প্রকাশিত করেছেন চলন্ত জীবনের একটা রূপ। কবিতাটি শুরু এভাবে—

''একেকটা দিন অন্ধকারে তোমরা আমার আহত মুখ দেখ
একেকটা দিন গভীর রেখায় আমর্মমূল অমল উন্মোচনে
গহন দুপুর আন্দোলিত, পাঁজর ছোঁয়া শীতল মেঘচ্ছায়া
একেকটা দিন সহসা পায়ে পুরনো নদী অধুনা খররেখ
একেকটা দিন চকিত ত্রাস সুতীব্র ঝড় রজনীগন্ধা বনে
একেকটা দিন অন্ধকারে নিবিড় ব্যথায় কাঁপে তোমার কায়া।''

মানুষের সারা জীবন একভাবে কাটে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে নদীর পার ভাঙে আর গড়ে। অর্থাৎ অনেকদিন অনেকভাবে কাটে। কবি নিজের কথা বলতে গিয়ে বলছেন যে এক একটা দিন অন্ধকারে ভরে যায় তাঁর মুখ আর মানুষ দেখে। আর কখনও এক একটা দিন দুপুর আন্দোলিত মর্মমূলসহ পাঁজর ছেঁয়ে যায় শীতল ছায়ায়। আবার কখনও এক একটা দিনে বেগ বেড়ে যায় পুরনো সময়ের ব্যর্থতা মনে করে। আর কখনও কোনও দিন রজনীগন্ধা বনে জড় হয়ে ত্রাসে কাঁপে সমস্ত অস্তিত্ব। আবার কখন কোনদিন অন্ধকারে সারা শরীর কাঁপে কবির ভালোবাসার ব্যক্তির 'নিবিড় ব্যথায়'। এই যে প্রকাশ, টুকরো টুকরো ছবি। এ তো জীবনের খণ্ড খণ্ড জীবন ছবি। যা জীবনকে চালিত করে বর্তমান ভবিষ্যতকে নির্ধারণ করে—নির্মাণও।

আসলে কবি এখানে দেখতে চেয়েছেন এই একদিন অনেক দিনে আমরা কীভাবে বেঁচে আছি। তাই তো আমাদের সামাজিক পরিবেশ পরিসর ব্যক্তিসত্তার বাঁচা ব্যক্তিজীবনের জীবনধারার কথা ফুটে ওঠছে তার ভেতরে। নাগরিক জীবনবোধ ক্রমে সমস্ত প্রাকৃতবোধকে ঢেকে নিচ্ছে 'সুতীব্র ঝড়ে' তার। আমাদের পাঁজর, মুখ, কায়া, মর্মমূল, ইত্যাদিকে খণ্ডভাবে এক অখণ্ড বোধের জন্ম দিচ্ছেন কবি। আর দ্বিতীয় স্তবকে তিনি আমাদের আলোকিত দিনের কথা বলছেন—

''একেকটা দিন সন্ধেবেলায় উৎসারিত তীব্র দীপাবলি
একেকটা দিন আবিষ্ট ঘর নিয়ন আলোর মৃদু চরণপাতে
একেকটা দিন স্বচ্ছ জলে রূপালী মাছ স্বর্ণাভ গোধূলি
একেকটা দিন গাছের ছায়া কাপে গোপন সহাস্য জোছনাতে।''

এখানে কবি মানুষের জীবনের উজ্জ্বল দিনগুলির কথাই বলছেন। যেখানে মানুষ অনেককিছু পেয়েছে এইসব

দিনগুলিতে। এক একটা দিন দীপাবলির মতো হয়ে সন্ধ্যেবেলা, কখনও ঘর উজ্জ্বল হয়েছে নিয়ন আলোতে, আবার কখন এক একদিন পরিষ্কার জলে মাছেরা রূপালি রং ধরেছে—স্বর্ণাভ গোধূলিবেলায়। কখনও রাতে জ্যোৎস্নায় গাছের ছায়াও উজ্জ্বল হয়েছে। এইসব কথার মানে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক যাতাকলের চাপ পরেও মানুষ এক একটা দিনে এই রকম উজ্জ্বলতা আলো পায়। তাই এত বিতৃষ্ণা, পরাজয়, মৃত্যু তবুও তো মানুষ বাঁচে—বেঁচে থাকতে চায়। এখানে সেই বেঁচে থাকার বোধটা আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

তবে পরবর্তী স্তবকে কবি এইসব এক একটা দিনের কথা ছেড়ে চলে গেলেন সুদীর্ঘকালের কথা বলতে—

> ''সুদীর্ঘকাল মৃত গোলাপ 'ক্লান্ত জলে টুকরো চাঁদের ফালি'
> সুদীর্ঘকাল একলা ঘরে সুদীর্ঘকাল রাতের ট্রেনে পাড়ি
> সুদীর্ঘকাল মেঘে ছায়ায় শীতল হিমে ব্যাহত বৈকালী
> সুদীর্ঘকাল আগুনে হাত সুদীর্ঘকাল এমন অসংসারী।''

আমাদের জীবনের টুকরো টুকরো পাওনা, এক একটা দিনের বিপরীতে আছে সুদীর্ঘকালের না-পাওয়া মৃত্যু অপেক্ষা ছায়া আগুনের জ্বলন একলা ঘর ট্রেনে যাত্রা; অসংসারী বিরক্তিকর জীবন আর 'ক্লান্ত জলে' অসহায় চাঁদ। আমাদের এই তরঙহীন জীবনের কথা রূপ প্রকাশ করতে গিয়ে কবি এত আয়োজন করেছেন। 'সুদীর্ঘ কাল' এই শব্দবন্ধ বারবার উচ্চারণ করে সুদীর্ঘকাল ধরে একঘেয়েমি জীবনে আঘাত করেছেন। অন্যরকম অর্থে জীবনকে উজ্জ্বল করে উপভোগ করার বার্তা দিচ্ছেন এই সব অনুষঙ্গ প্রসঙ্গের সংকেতে। সুদীর্ঘকালের অভ্যাসে আঘাত করে সমসাময়িক হয়ে চলার বয়ানও পাচ্ছি এখানে। কবিও জীবনবাদী, জীবনানন্দের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন— ''আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে যায় জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।''

মৎস্যেন্দ্রনাথ

> *''বরাক উপত্যকার আলো-হাওয়া রোদে তাঁর পরিশীলিত ভাষাও অঙ্কুরিত হয়েছে বলে প্রতিবেদনের মর্মমূলে রয়ে গেছে অন্বয় ও অনন্বয়ের দ্বিবাচনিকতা। উদয়নের সমাজ-সংবিদ ক্রমশ স্পষ্টতর হয়েছে, তাই তাঁর কবিতায় আদল এবং অন্তর্কথন ধীরে ধীরে পর্ব থেকে পর্বান্তরে পৌঁছেছে।''*[৪৩]

সমালোচকের এই মন্তব্যের এক যথাযোগ্য উদাহরণ হল উদয়ন ঘোষের বিখ্যাত পরিশীলিত 'মৎস্যেন্দ্রনাথ' কবিতাটি। কবিতাটিতে কবির ছন্দ সচেতনতার প্রগাঢ় শক্তিক্ষমতার আভাস পাওয়া যায়। আর এই ছন্দশীলতা আবার কবিতাটির অন্তর্ঘাতের সমিধ হিসেবে গৃহিত। এবং মধ্যযুগীয়ও কাছাড়ের মৎন্দ্রনাথের কথা, ঐতিহ্য ও পরম্পরার কথা মনে করিয়ে দেয়। কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে—

> ''আলো ক্রমে আসিতেছে না-কি?
> না-কি ক্রমে নিভে আসে আলো?
> ঝড়ে মেঘে বরাকে একাকী
> মাছ ধরে হিরণ্ময় মালো।''

কবি তাঁর অন্যতম প্রিয় কথাসাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'অন্তর্জলি যাত্রা'র প্রথম ও শেষ লাইনকে প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসা দিয়ে কবিতাটির শুরু করেছেন। আলো কি আসচে না নিভে যাচ্ছে? কারণ কবি আজ দেখতে পাচ্ছেন বরাকের পারে দাঁড়িয়ে একাকি হিরন্ময় মালো মাছ ধরছে। প্রাকৃত জীবনের প্রতিনিধি সে। তাঁর চেয়ে বেশি নিম্নবর্গের। তার এই জীবনের কোনও পরিবর্তন নেই। যদিও বরাকের জল সমুদ্রে যাচ্ছে আজ। তাই কবি বলছেন

নাগরিকতার অন্ধকার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মেকি জীবনের ভিড়ে হিরণ্ময় মালোর মতো অসংখ্য জীবন হারিয়ে যাচ্ছে—গতিহীনভাবে। এটা কি 'আলো'? —এটাই কবির জিজ্ঞাসা। দ্বিতীয় স্তবকে প্রকৃতির রূপটা আরও নান্দনিকভাবে ফুটে ওঠেছে—

"শব্দ মালা মধু হয়ে জমে
ফুলময় ফোটে থোকা থোকা।
নিজেকে যে পোড়াল বিক্রমে
যে খুলছে সূর্যের ঝরোখা"

এই রকম প্রাকৃত জীবনে যুগযন্ত্রণার হতাশা নেই কিন্তু। আছে জীবনসংগ্রামের গভীর বোধ—বেঁচে থাকার তাগিদ। এখানে জীবন কথাবার্তা ভাষা প্রকৃতির সবচেয়ে কাছে। নিজেকে জীবনযুদ্ধে পুড়ায় সে বিক্রমে। আর পুড়িয়ে জীবনটাকে পায় সূর্যের মতো প্রখর। কারণ সে জানে 'Survival for the fittest' হতে হলে কীরকম ভাবে যুদ্ধ করতে হয়! এই চরম বোধ শক্তি সে জীবনচাষ করে পেয়েছে কিন্তু। তাই তৃতীয় স্তবকে তার সমর্থন পাই আরও নতুন করে—

"নীরবতা তুচ্ছ তার কাছে
নতজানু পৃথিবী তন্ময়
নৌকো তার ভরে জ্যান্ত মাছে
জাদু জানে মালো হিরণ্ময়।"

নিম্নবর্গীয় প্রাকৃত জীবনধারার প্রতিনিধি এই 'হিরণ্ময় মালো' কোনও ব্যক্তি না কিন্তু। সে কবিতার বিষয়বস্তু ফুটে তুলার জন্য এক সংকেতবিশ্ব—দ্যোতনার জগৎ। সকল ধরনের নীরবতা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়—পৃথিবীও নতজানু হয় তার কর্মে। পুথিগত জ্ঞানবুদ্ধি চিন্তাচেতনা তার কম থাকতে পারে। কিন্তু সে প্রাকৃত জীবনকে সুগভীরভাবে চাষ করে করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এখানে তো মাটির তন্ময় পৃথিবী নতজানু হবেই। কারণ সে মাটির মানুষের সঙ্গে থেকে হেঁটে কত ধরনের কত রঙের জীবন পাঠ করে জেনেছে কত জাদু। তাই তো তার 'সোনার তরী' ভরে যায় জ্যান্ত মাছে। এটা তো কম বড় সংকেত নয়! এই 'মালো হিরণ্ময়'ই কিন্তু মৎস্যেন্দ্রনাথ।

কিন্তু চতুর্থ স্তবকে কবি সুর বদলে নিয়ে এক নয়া তালে অন্যরকম জীবনবোধের কথা বললেন—

"সংসারের ভূষণ্ডীর মাঠে
যাকে আমরা দিবালোক ভাবি
স্মার্ট, দূর্ত, মেধাবী বখাটে
উজ্জ্বল ভূতেরা খায় খাবি।"

এই প্রাকৃত জীবন মাটির সোঁদা গন্ধে ভরা জীবন পরেও সংসারের অর্ধেক দিকটা অন্যরকমভাবে বেঁচে আছে। যান্ত্রিকতাচ্ছন্ন জীবন মেকাপে আবৃত জীবন নিয়ে যারা বেঁচে আছে। বাইরে থেকে আমরা ভাবি যাকে দিবালোক আসলে এই জায়গায় বোকা, দুর্ত স্মার্ট, ভুতের মতো জীবনজীবী মানুষেরা বড় যন্ত্রণায় কষ্টে বেঁচে আছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের মতো সব তো আর সুখি হতে পারে না। কারণ বিলাসীতা প্রিয় জীবনে বিলাস শেষ হওয়ার পরমুহূর্তে গ্লানি ক্লান্তি কষ্ট হতাশা এসে আপাদমস্তক মোড়ে নেয়। একটা বৃত্ত আবৃত করে নেয় গভীর সহজে। এর বিপরীতে হিরণ্ময় মালো কিন্তু মুক্ত ও স্বাধীন—নিজের জীবন চর্চায় চর্যায় চাষে সংগ্রামে। কিন্তু আজ তার জীবনও জটিলতা, কৃত্রিমতায়, যান্ত্রিকতায় ক্রমে ভরে যাচ্ছে। তাই কবি ভাবছেন আলো কি আসছে না নিভে যাচ্ছে ক্রমে?

কবিতা ১৯৬৯

''এই কবিতায় (কবিতা ১৯৬৯) যুগপৎ ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে সমন্বিত হয়ে যায় নাগরিক বিতৃষ্ণা ও পরাবাস্তবের আয়তন, রবীন্দ্রনাথ... বিমল চৌধুরী ও রুচিরা শ্যামের পাঠ। আমাদের অবধারিতভাবে মনে পড়ে যায় তাত্ত্বিকের এই প্রসিদ্ধ মন্তব্য যে প্রতিটি নতুন পাঠ আসলে পূর্ববর্তী অনেক পুরোনো পাঠের বিনির্মিত উপস্থিতির সমবায়ে তৈরি হয়ে থাকে। একথা যদি মনে রাখি তাহলে বুঝতে পারি কেন বরাক উপত্যকার এই কবিও আধুনিকতাবাদের বহু ব্যাখ্যাত 'Infectious mood of disenchantment'—কে অবলম্বন করেও তারই আয়ুধে তাকে অন্তর্ঘাত করে যান।''[৪৪]

কবি উদয়ন ঘোষের 'কবিতা ১৯৬৯' সুদীর্ঘ কবিতা চর্চা করতে গিয়ে সমালোচক উপরের এই দীর্ঘ মন্তব্যটি করেছেন। মন্তব্যটিও এই কবিতার পক্ষে যথাযথ কিন্তু। কবিতাটির প্রথম স্তবকেই বিষয়বস্তুর কথা নিবিড়ভাবে ধরা দেয়—

''চায়ের পেয়ালা থেকে প্রতিটি চুমুকে তুলে নিই প্রবল বিস্বাদ হলাহল
চামচে দিয়ে কারা যেন বাতাসেও বিষ মিশিয়েছে
আমার সর্বাঙ্গ ক্রমে পচে যাচ্ছে। এমন দুর্গন্ধ,
ডাক্তার বলেছে, 'নাকে সাড় থাকলে তুমি
একদিনে পাগল হতে, গোটা হাসপাতাল দুর্গন্ধে অস্থির।''

নাগরিক জীবনের নিঃসার জীবনচর্চার ভেতরে হতাশা আর যন্ত্রণাবোধ। এবং ক্রমে বিষাক্ত হচ্ছে আরও শ্বাস নেওয়ার বাতাস। আর ধীরে ধীরে মানুষেরা পচে যাচ্ছে—দুর্গন্ধও এত বেশি নাকে সাড় থাকলে কবে যেন পাগল হয়ে যেত। সমস্ত আরোগ্য নিকেতনও সেই দুর্গন্ধে অস্থির। তার মানে মানুষ 'মানুষ' শব্দের অর্থ মানে সংঙ্গা থেকে ক্রমে সরে গিয়ে যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে—রবটও। তাই এই রোগটা বাড়ছে দ্রুত। সমাজ, সংস্কার, ন্যায় বিচার সবই যেন নিজের জায়গা ছেড়ে অর্থ বদলে নিয়েছে। তার অর্থটা হয়তবা এরকম 'মানুষ' আজ সবচেয়ে অসামাজিক জীব।

দ্বিতীয় স্তবকে প্রশ্ন করছেন যে নিজে জানি না কতটা অসুখ আর অসুস্থ আমরা—

''আমি সোল্লাসে চিৎকার করি, 'সত্যি বলছ তো ডাক্তার,
এখনও পাগল হইনি? প্রসূতি সদন থেকে রোজ
মাদোন্নার রক্তে ভেজা ফুলের বাস্কেট তোমরা ভরে দিচ্ছ, ওরা
পাপড়ি ছিঁড়ে খেলা করে। ডাক্তার, আমার
রক্তের নদীতে যারা নৌকা বায় তাদের বুলেট
মাঝে মাঝে গর্জে ওঠে, হাতড়ে দেখি দায়িত্ববোধের টর্চলাইট
জায়গা মতো আছে কি না—মধ্যরাতে একা
গাছের মগডালে উঠে উঁকি মেরে দেখি
রবীন্দ্রনাথের কোন জ্যোৎস্নালোক এখানেও পৌঁছতে পারে কিনা
গাছের নীচেই ঘোর অন্ধকারে একদল লোমশ প্রাণীর
আঠাল যৌনতা, তীব্র ঘাম ও বীর্যের গন্ধ, কামড়কামড়ি ওরা
আমাকে নামিয়ে এনে বলে, 'ওহে, তিরিশের কাছে
পৌঁছুলে এখনও তুমি গাছে চড়ো? গত দশ বছর
রক্তের গর্জন তুমি শুনতে পাওনি? স্পর্শ পাওনি হর্ষিত লোমের
ভোরে উঠে দেখি তাঁর আলোর প্রাসাদ ভেঙে
পড়ে থাকে হাড়, রক্ত, বিষ্ঠা ও পেচ্ছাব?''

এই জিজ্ঞাসার মধ্যে একটা আত্মজিজ্ঞসা লুকিয়ে আছে। ঔপনিবেশিক বেড়াজালে বন্দি জীবনের কথা। যে চিরাচরিত অভ্যাসের মরচে পড়ে পড়ে কেবল রোগাক্রান্ত হচ্ছি। আর যারা এভাবে মাথা নুয়ে রেখেছে আমাদের তাদেরই বুলেট গর্জে ওঠে মাঝে মাঝে। কিন্তু কবি কী করেন একা! নজরুল ইসলামের মতো ভাবেন—'একা তো রক্ত ঝরাতে পারি না বন্ধু'। আর পিঠে আছে দায়িত্ববোধের বোঝা। অর্থাৎ সংসারের চিন্তা। এ রকমভাবে বেঁচে আছেন তিনি।

তারপরও কবি ঐতিহ্যকে স্বানন্দে আস্বাদন করতে চান। এই অসুখ ভরা অন্ধকারেও সকলের উপরে ওঠে খুঁজে দেখেন 'রবীন্দ্রনাথের কোন জ্যোৎস্নালোক' পৌঁছতে পারে নাকি। কারণ তিনি দেখেছেন এই জায়গা থেকে নিচে ঘন অন্ধকার আর রোমে পূর্ণ একদল প্রাণীরা বেঁচে আছে তাঁরা সমাজহীন মনুষ্যত্বহীনভাবে। এইরকম আঠাল যৌনতা, বীর্যের গন্ধ, মানুষে মানুষে কামড়াকামড়ি, হানাহানি ইত্যাদি পাঁককাদা মাখা জীবন নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। এই সব জীবনজীবী ব্যক্তিরা কবিকে নিজের জায়গায় নামিয়ে এনে বলে যে এত রক্ত সময় বদল ইত্যাদি তুমি জানতে পাওনি! আর কবি দেখেন 'আলোর প্রাসাদ ভেঙে' এই নোংরা জীবনযাপনের ফাঁকে পড়ে রয় বিষ্ঠা পেচ্ছাব মৃত মানুষের হাড় রক্ত ইত্যাদি। এই রকম জীবনের উর্ধ্বে উঠে তিনি চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের জ্যোৎস্নালোকের মতো আলোকে আশ্রয় নিতে। যেখানে জীবন সহজ সরল— প্রাকৃতও। তারপর মুহূর্তে কবি বলে উঠলেন—

''তবে কি পাগল হব শেষ পর্যন্ত' এরকম ভয়ে''

প্রথম স্তবকের মধ্যে আরোগ্যনিকেতনের ডাক্তাররা বলেছিলেন নাকের শুঁক ক্ষমতা না থাকলে পাগল হবে। আর এখানে কবি উপরের স্তবকের জীবনচর্চার চর্যার আধিপত্যবাদের ভয়ে পাগল হবেন নাকি ভাবছেন। কারণ চারদিক থেকে উন্মূল হয়ে আছে প্রস্তুতি সমস্ত সম্ভাবনাকে ডুবিয়ে দিতে অন্ধকারে। সামাজিকবোধ সচেতন কবি এখানে সবকে সচেতন করছেন জিজ্ঞাসা সহকারে আমাদের কি মুক্তি নেই এই চক্রব্যূহ থেকে! এ রকমই বেঁচে বেঁচে শেষ পর্যন্ত পাগল হব? এটাই কি জীবন? জীবনের মানে অর্থ সংজ্ঞাও? কিন্তু পরবর্তী স্তবকে নাগরিক জীবনের জ্বলন্ত ছবি এঁকেছেন। যেখানে নাগরিক জীবনের বিতৃষ্ণা নেতিবাচক জীবনবোধ হতাশা সব মিলিয়ে এক গভীর বাস্তবকে তুলে ধরেছেন—

''রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে আঁতকে উঠি, জেগে উঠে দেখি
বাগানের সব জ্যোৎস্না চুরি যাচ্ছে, ঘুমে জাগরণে
চোরের পেছনে ছুটে ভোর হয়, পড়ে থাকে ডানা ভাঙা প্রাচীন সড়ক
ছুটে আসে জ্বলন্ত বেশ্যারা এলোচুলে, ডাকে শাড়ির রহস্যে
পুষ্প-কোরকের মতো সরে যায় উত্তপ্ত কাঁচুলি, হাতে সুডৌল স্তনের
পুঞ্জ নাচে, অসাবধান হাত
যোনিকেশ স্পর্শ করলে শিউরে উঠি ওরা চোখ নামায়''

স্বার্থপর জীবনের প্রতিটা অনুষঙ্গে এখানে কেবল বিনিময়। সে জন্য শান্তি নেই কারুর ভেতরে—শুধু হতাশা। কবি দেখেন সব জ্যোৎস্না অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চুরি হয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক জীবনজীবী চোরের হাতে। এই সব কবি বাঁচাতে চান তাই স্বপ্নে তাদের পেছনে ছুটেন। কারণ তিনি জানেন বাস্তবে তা কোনদিনই সম্ভব নয়। তারপর মুহূর্তে দেখেন 'জ্বলন্ত বেশ্যারা' দৌড়ে এসে শারীরিক ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে হাতে স্তন দুলে ডাকে। কখনও অসাবধানভাবে যোনিকেশ স্পর্শ করলে চমকে তারা চোখ নামায়। হয়তবা লজ্জায় নাকি?

এই যে জীবন তা তো চরম বাস্তব। আজ আমরা কী তার ঘেরাটোপে ঘেরা না? ক্রমে আমরা ঐ দিকে যাচ্ছি না?

নাগরিক জীবনের ব্যথা যন্ত্রণা ভোগবাদপূর্ণ জীবনে কোনও শান্তি নেই—আশ্রয়ের জন্য কোনও মাটি নেই জায়গা নেই। এখানে আমরা বেঁচে আছি এই সব ভিড়াক্রান্ত জীবনের ফাঁকে মরে মরে—

"রোজরাত্রে ভীষণ দুঃস্বপ্ন, মৃত্যুভয়,
মৃত মানুষের লক্ষ প্রসারিত হাত, মৃত চোখের বরফ,
ক্রমশ এগিয়ে আসে, আতঙ্কে দৌড়ুতে গিয়ে দেখি
বন্ধুদল উঁচু একটা কাঠের প্ল্যাটফর্মে বসে আড্ডা দিচ্ছে যেন
'মৃতেরা কোথাও নেই' এরকম নিরুদ্বিগ্ন। আমি
পাটাতনে উঠতে গেলে কাঠের মইটাই ভেঙে পড়ে
হাত থেকে ছিটকে পড়ে রবীন্দ্র রচনাবলী, রেনোয়ার ছবি।"

এই জীবনে কোনও জলের নরম উষ্ণ ছোঁয়া নেই—সূর্যের কোমল আলোও নেই। তাই অন্যরকম অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সব। যেখানে কেবল বিনিময়, বিকিকিনি, লেনদেন। কারুর প্রতি কারুর কোনও দয়া স্নেহ শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রেম ইত্যাদি নেই কিন্তু। আর যেখানে আছে সেখানের গভীরে স্বার্থ নিশ্চিত। এই যে জীবনধারণ জীবনবোধ এখানে মানুষের কাছে মানুষের কোনও আশ্রয় নেই। তাই কবি দেখছেন রাতে দুঃস্বপ্ন, মৃত্যুভয়, চোখ মৃত, মৃত মানুষ। কিছু মানুষেরা আবার এই সব থেকে অনেক উপরে বেঁচে আছে—মৃত্যুহীন ভয়হীনভাবে। কবি পাটাতনে উঠতে গেলেই ভেঙ্গে যায় তার সিঁড়িটা। অর্থাৎ কবি ঐসব মানুষের মতো বাঁচতে পারছেন না নিজেরই মুদ্রাদোষে। কখনও হাত থেকে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, রেনোয়ার ছবি। অর্থাৎ এখানে রবীন্দ্রনাথের বা সাহিত্যিক চিন্তাধারা সহজ সরল মন নিয়ে বেঁচে থাকার কোনও সুযোগ নেই। তার মানেটা দাঁড়ায় যে যত বেশি যান্ত্রিক সেই এখানে বাঁচতে পারে। অন্যরা কেবল মানসিক রোগে ভোগে মরে মরে বেঁচে আছে—বেঁচে থাকতে হয় বলে। তবুও কবি একেবারে নিজের মতো করে বাঁচতে চান—

"কাদায় চড়িয়ে
তবু বলতে চেষ্টা করি, পেল গগাঁর চোখ দুটি ধার দাও আইব্যাঙ্ক?
কয়েক ঘণ্টার জন্যে, কয়েক ঘণ্টাই শুধু বেঁচে থাকা প্রসন্ন আলোয়
এমন কি এই উনিশ শো উনসত্তরেও।' বলতে চেষ্টা করি
অসুনীতে পুনরষ্মায়ু চক্ষু পুনর্প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্
'হে প্রাণনেতা, আবার প্রাণ দিহ, আবার চক্ষু দিহ,
আবার দেখিবা দিহ, আবার।'
শেষরাত্রে ঘরে ফিরে যেতে চাই, মহাবল মন্দিরের কাছে
হঠাৎ এক বাহুবলী পথ আটকায় আমি সভয়ে পকেট
হাতড়ে দেখে নিই সেই দায়িত্ববোধের টর্চলাইট
জায়গা মত আছে কি না। মৃদু কণ্ঠে তার
আরক্ত চোখের দিকে চেয়ে বলি, 'নিজের রক্তের
জবানবন্দী দেওয়া ছাড়া অন্য কারো কাছে
আমি বাধ্য নই। তুমি যা খুঁজেছ সেও
এখানেই আছে তবে, মুদিত চোখের
অতল সমুদ্রে তাকে দেখে নিও, রক্ত সত্যভাষী।"

এই সব পঙ্কিল জীবনে জড়িয়েও বলতে চেষ্টা করেন পেল গঁগার দুটি চোখ কি ঋণ দিতে পারে আইব্যাংক? কারণ এত সব জঞ্জাল ব্যথা কন্টকময় জীবন পরেও কবি কয়েক মুহূর্ত কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকতে চান এই উনিশ শো উনসত্তরেও। যদিও এই সালে বাঙালির অস্তিত্বে বড় একটা ফাটল দেখা দিয়েছিল যুগযন্ত্রার দহনে। তবুও কবি এখানেও কয় দণ্ড বেঁচে থাকতে চান।

তারপর ফিরে যেতে চান নিজস্ব দায়িত্ববোধের টর্চলাইট নিয়ে। কারণ তিনি নিজের রক্তের কাছে কেবল বাধ্য—আর কারুর কাছে নন। বাহুবলী যারা কবির পথ রুদ্ধ করে আটকে দাঁড়ায়। তাদের মুখে চুন কালি দিয়ে উত্তর দেন যে নিজের রক্তের পরিচয় ভুলিও না। কারণ রক্ত কখনও মিথ্যা কথা বলে না—সে সত্যভাষী। সে নিজের পরিচয় দিয়েই থাকে—শরীরে বয়ে চলে শিরায় ধমণীতে। আসলে কবি সেই সব দুর্নীতি পরায়ণ চোর গুণ্ডা নেতাদেরকে তাদের রক্তের পরিচয়ের কথা স্মরণ করে দিতে চাইছেন। কারণ তারা পৃথিবীটাকে যতই ঘোলাটে করুক না কেন—মূলত তাদের রক্তই সে রকম। কিন্তু শেষ স্তবকে কবি অন্যরকম একটা ভাব দিয়ে কবিতাটি সমাপ্ত করলেন—

''শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ছেঁড়া পাটি, কম্বল তোষক
পুরনো তোরঙ্গ গেঞ্জি রেশনের খয়রাতি পাথর
রৌদ্রে মেলে দিচ্ছে, তীক্ষ্ণ শান্তনু ঘোষের নীল ঘুড়ি
বিদ্যুতের মতো দেখি আকাশ দু'ভাগ করে চলে যায় এবং রুচিরা
মিষ্টিহাতে রূপকথার সুগন্ধ পল্লব নুইয়ে আনে, শান্ত বিমল চৌধুরী
চুপিচুপি উপড়ে আনে শিলচরের অসুস্থ হৃদপিণ্ড
না রৌদ্র না অন্ধকারে একাকী দাঁড়িয়ে আমি সভয়ে চিৎকার করে উঠি
এত রাতে একা একা কোথায় দাঁড়াব?''

বরাক উপত্যকায় চারজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির স্বাতন্ত্র্যতা প্রকাশ করে বলছেন যে এদের সৃষ্টি জগৎ কত গভীর। চারজনের এই প্রকাশ শৈলীকে দেখিয়ে একটা সামগ্রিকতা দেখাচ্ছেন কিন্তু। শক্তিপদর ঐতিহ্যপ্রিয় প্রাকৃত জীবনের অনুসঙ্গ মাটির গন্ধ দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রী ভাববস্তু, বিমল চৌধুরীর শান্ত শিষ্ঠ ভাষায় শিলচর শহরের অসুখ আর অসুস্থ হৃদপিণ্ডের কথা, শান্ত্বনু ঘোষের তির্যক ভাষায় নাগরিক জীবনের কাঁটার প্রকাশ আর আধুনিকতার প্রকাশ, আর রুচিরা শ্যামের মিষ্টি ভাষায় রূপকথার উজ্জ্বল প্রকাশ। এই সব মিলিয়ে এখানে একটা অখণ্ডতার প্রকাশ পাচ্ছি। এতসব থাকা সত্ত্বেও এখানে না রৌদ্র আছে না প্রাকৃতিক দান অন্ধকার আছে। এই রোদে এই অন্ধকারে কবি একা চিৎকার করে ভয়সহকারে বলছেন এলিয়টের মতো তিনবার—

''এত রাতে একা একা কোথায় দাঁড়াব?
এত রাতে একা একা কোথায় দাঁড়াব?
এত রাতে একা একা কোথায় দাঁড়াব?''

কবিতাটির সমাপ্তিতে কবি উদয়ন ঘোষের বহুমাত্রিক চরিত্রের স্বীকৃতি স্বরূপ মনে করতে পারি কবি রণজিৎ দাশের মন্তব্য—

> ''উদয়ন ঘোষ—এক অতিকায় জীবনপাত্র, যাঁর মধ্যে তীব্র নিয়ান্ডারথাল রোমান্টিকতা কোনো অজ্ঞাত স্কুলিঙ্গের স্পর্শে বিস্ফোরিত হয়েছে।''[৪৫]

জন্মান্ধের লণ্ঠন

> *''তিনি (উদয়ন ঘোষ) শুধু যে কাব্য ভাষার পরিসরকে বাড়িয়ে দিলেন, বিচিত্র কৌনিকতা যুক্ত করলেন—তাই নয় কেবল, অতন্দ্রবৃত্তের নবীন কবিতাকে নিয়ে গেলেন যেন টেক অফ্ পয়েন্টে।''*[৪৬]

সমালোচকের এই একটি মাত্র মন্তব্যে উদয়ন ঘোষের কবি ব্যক্তিত্বের সামগ্রিকই একটা পরিচয় ফুটে উঠছে। তাঁর সামাজিক অবস্থান এবং ঐতিহ্যের দান তাকে অনেকটা সমৃদ্ধ করেছিল। এই জিনিসটা তাঁর কবিতায় গভীরভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তবুও 'জন্মান্ধের লণ্ঠন' কবিতায় অন্যরকম করে তিনি স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছেন আমাদের অর্জিত

জীবনের রূপকে—

> ''পুঞ্জিত শব্দেরা আজ বন্দীশালা হয়ে ঘিরে আছে।
> পরিবর্তমান তবু দূরাগত সংযোগী ইঞ্জিনে
> কৌতুক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, সম্মোহন, পরম্পরাগত
> আম কাঁঠালের গন্ধ, মেঘমালা, উড্ডীন কার্পেট
> কম্পোজিটরের টাইপ বাক্সের কাছে ছুটে যায়, জেগে ওঠে নদী
> গহন লাবণ্যময়।"

আমাদের এতদিনের বোধ ভাব কথা চিন্তা আজ বন্দিশালায় বন্দি হয়ে ঘিরে আছে আমাদেরকেই। তারপর সবকিছু অন্য রকম করে পরিবর্তনশীল। মানুষের হিতের জন্য নয়—মানুষের হিতের দিকে নয় বিপরীতে। তাই ক্রমে কৌতুক ক্ষুধা তৃষ্ণা, সম্মোহন, আম কাঁঠালের গন্ধ ইত্যাদি চারদিক দিয়ে ঘিরে আছে। আর আমরা দেখি ভোতা চোখে সকল পথই গভীর লাবণ্যময়।

আমাদের সমাজের ঐতিহ্যের বোধের পরিসর কত বেশি সংকীর্ণ। সেই জিনিসটা বোঝাতে গিয়ে কবি প্রথম দিকে এইরকম বয়ান তুলে ধরেছেন। আমাদের বন্দিত্বের অনুভবটা তুলে ধরেছেন—জীবনের পথে পথ হেঁটে। তারপর কবি বলছেন—

> ''... তোমাকে কখনও
> যদি বলি এই বাপ্তিস্মের জলে স্নান করে আদ্যন্ত নতুন
> মানবী হয়ে উঠে এসো তাহলে যে হাজার বছর
> বয়সী এই ভাষা তার হাজার মায়াবী
> আলোর লণ্ঠন দেখবে তুমি যে জন্মান্ধ।"

এখানে কবি তাঁর প্রিয়া বা উদ্দিষ্ঠ মানবীকে বলছেন উপরের পথে চলে পথ হেঁটে আজ তাকে যদি বলেন 'নতুন মানবী' হয়ে আসতে সে কী পারবে? না। কারণ আমাদের এতদিনের অর্জিত অভিজ্ঞতা আর অভ্যাস কী বদলাতে পারব? বা এতদিনের বোধ ভাব চিন্তা চেতনা ইত্যাদি কী এত সহজে পরিবর্তনশীল হবে? এই রকম পরিসরে সে দেখবে 'আলোর লণ্ঠন' জন্মান্ধের মতো। যার কোনও রঙ নেই নেই কোনও মানে অর্থও। আর সে আলোটা হবে 'হাজার মায়াবী'। এতদিনের মায়ায় নির্মিত বিনির্মিত।

কিন্তু এর পরেই কবি আরও সুষ্ঠভাবে বলেছেন জীবনবোধটাকে নিজের অর্জিত উপলব্ধিতে—

> ''আর তোমাদেরও হাজার বছর
> নিংড়ানো নাচ, কিংবদন্তী, পল্লীগাথা, পার্বত্য উৎসব
> চড়াই উৎরাই বেয়ে পূর্বপুরুষের গাঢ় অরণ্য ও খরস্রোতা নদী
> পেরিয়ে আসার মুগ্ধ ইতিহাস...স্মৃতির নির্যাসে
> আপ্লুত সত্তার থেকে উঠে আসা অনুষঙ্গময়
> শব্দমালা আমাকেও পাবে না জাগর।"

এখানে প্রাকৃত জীবনের স্মৃতি গ্রন্থিত বয়ানে হাজার বছরের পরিবর্তনের কথা বলছেন। যে পরিবর্তন কিন্তু হাজার বছর নিংড়ানো নাচ পল্লীগাথা পার্বত্য উৎসব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষ স্রোত বেয়ে যে ইতিহাস নির্মাণ হয়েছে আজ বিস্মৃতির নির্যাসে। তার অনুষঙ্গময় মালা জাগর ভাবে কবিকে পাবে না। কারণ এই রকম যান্ত্রিকতাচ্ছন্ন জীবনবোধে ঢাকা ঐতিহ্য থেকে অনেক উপরে। বলা যায় অবক্ষয়ী পরম্পরা থেকে অনেক বেশি প্রগতিশীল।

জীবনের সঙ্গে উপরের স্তবকের বাস্তবতা, অনুষঙ্গ, প্রসঙ্গ, সংযোগ বড় গভীর। কিন্তু এই সব পরম্পরা কেন আজ

ক্রমে অসুখে ভরে যাচ্ছে বড় সহজে। সেই সব নেতিবাচক দিকটাকে তুলে ধরেছেন তিনি, যাতে আধুনিকতাটা, প্রগতিটা, উন্নতিটা অবক্ষয়ের আগ্রাসন থেকে মুক্তি পায়। তা না হলে একদিন সেই দিকটা হারিয়ে যাবে অবক্ষয়ের অতলে। সব মিলিয়ে 'জন্মান্ধের লণ্ঠন' কবিতায় এই জিনিসটা তুলে ধরেছেন ভিন্ন এ কৌনিকতায়।

জিতেন নাগ

অবনীশ-কে

''কবি জিতেন নাগ যৌবনের উদ্দামতা নিয়ে অতন্দ্র বলয়ে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছিলেন সে কথা স্বীকার করতে হয়। পশ্চাত্য আধুনিকতার ঢেউ তাঁর মননে আলোড়ন তুলেছিল। তাঁর 'না আলোয় না অন্ধকারে' (১৯৮৮) প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও পরিণত কাব্যচর্চার ফসল।''[৪৭]

কবি জিতেন নাগের এই কবি মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায় 'অনীশ-কে' কবিতায়। কবি বলছেন—

''অবনীশ, উষ্ণতার আশ্রয়ে হিম হয়ে গিয়ে
আমি আজো টিকে আছি।
কি করে আমি নিজেই জানি না।
পৃথিবীর সবকটা শ্যামল মাঠ আমি চষে দেখেছি,
শুধু আত্মরতির হলুদ বিবর্ণতা।''

অবনীশ হয়তবা তাঁর কোনও বন্ধু বা নিজের সত্তা বা ভেতরের 'আমি'। সেই অবনীশকে কবি বলছেন যে উষ্ণতার আশ্রয়ে হিম হয়ে গিয়ে তবু আজও বেঁচে আছেন। কিন্তু কি করে তা জানেন না। অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচার জন্য একটু বেশি আধুনিক হতে গিয়ে একটু অন্যরকম হতে গিয়ে আমরা সমাজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম রীতিনীতি থেকে জীবনচর্চা চর্যা থেকে কোথায় হারিয়ে গেছি। যে রকম হতে চেয়েছি সে রকম পারিনি। আরও অন্যরকম হয়ে গেছি। পৃথিবীর মানুষ সমাজ ধর্ম ইত্যাদির যাতাকলে আমাকে নির্মাণ করেছে তার কাঠামো অনুযায়ী। তাই কি রকম করে বেঁচে আছি তা জানি না। এটা তো তোমার আমার বাঁচার কথা, টিকে থাকার কথা। কিন্তু কি আমরা জানি কি রকমভাবে বেঁচে আছি এই পৃথিবীতে!

''আমি ক্লান্তির আগুণে পুড়ে পুড়ে সোনা হতে চেয়েছি,
আমি ঝিনুকের সাথে ভাব করে মুক্তোর সাধে মেতেছি,
আমি হাজার প্রেমপত্রে প্রেমিক হতে গিয়ে
সত্যি বলছি দালাল হয়ে উঠেছি।''

মানুষ আজ কি করে কি রকম করে বেঁচে আছে সেটা কে জানে! কবি বলছেন যে পৃথিবীর সব শ্যামল মাঠ চাষ করে দেখেছেন এখানে শুধু আত্মরতির মত স্বার্থপর সুখ—আর কিছুই না। এখানে সব বর্ণ বিবর্ণ। সব সবুজ মাঠের পটভূমি খুঁজলে অনেক নিহত ভাইবোনদের রক্ত পাওয়া যায়। মানুষ নিজস্ব স্বার্থের জন্য এই সব মানুষের খুন করেছে। এইসব কথা কবির না আসলে তোমার আমার আজকের আসল বাস্তব রূপ।

ক্লান্তির আগুনে পুড়ে পুড়ে কবি সোনা হাতে চেয়েছিলেন। কবি ঝিনুকের সাথে সম্পর্ক করে মুক্তার লোভে মেতেছিলেন। হাজার পত্রে প্রেমের কথকতা লিখে প্রেমিক হতে গিয়ে দালাল হয়ে গেছেন। অর্থাৎ আধুনিক মানুষের ভেতরের জটিলতা যান্ত্রিক কৃত্রিমতায় মানুষ আজ কোথাও কোনও শান্তি পাচ্ছে না—শুধু ক্লান্তি হতাশা নিরাশা বিষাদবোধ এইসব। প্রেমের বন্ধনে বেঁধে নিজেকে খুঁজে দেখেন যে এখানে প্রেম নেই... শুধু দালালি। এটা প্রেমের উশৃঙ্খল রূপ। আসলে মানুষ কি চায় সে নিজেই বুঝে উঠতে পাচ্ছে না। সেই অবক্ষয়ী আধুনিক মানুষের বিভ্রান্ত রূপকে তুলে

ধরেছেন সাংকেতিক ভাষায় 'অবনীশ-কে' কবিতায়।

''আমি পৃথিবীর গুটিকতক অন্ধকার রাতকে নারীর
আলোয় দেখেছি
মনুষ্যত্বের উত্তরাধিকার ভুলে আমি পিশাচ হয়ে হেসেছি
আমি কৃষ্ণচূড়া ভুলে নিমের তলায় বসে, নিম হয়ে গেছি।
অথচ কি আশ্চর্য্য, সেই আমি আজো টিকে আছি।
অবনীশ, উষ্ণতার আশ্রয়ে হিম-হয়ে গিয়ে
আমি আজো টিকে আছি।''

মানুষ যখন তার জীবনের হিসেব নিকেশ করে তখন দেখে কিছু নেই শূন্য—আর শূন্যতায় ভরা কিছু দিন আর রাত থাকে। এটা অস্থির জীবনের অবক্ষয়ী আধুনিক মানুষের জীবনের রূপ। কবিও বলছেন পৃথিবীর কতটি অন্ধকার রাতকে নারীর আলোয় দেখেছেন। মানুষের সভ্যতায় সম্ভাবনাময় উত্তরাধিকার ভুলে পিশাচ হয়ে গেছেন। অর্থাৎ কবি নির্মম নির্দয় হয়ে কঠিন হয়ে গেছেন তাই তিনি হাসছেন। মানুষের দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা তাকে দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা দেয় না। কারণ 'There is no water but only rock'[15]

কবি কৃষ্ণচূড়া ভুলে গিয়ে নিমগাছের মতো হয়ে গেছেন। অর্থাৎ যেখানে ফুল প্রজাপতি একটু মধুরতা ইত্যাদিতে জীবন উজ্জ্বল তিনি সে রকম হতে পারেননি। তিনি নিমের মতো তিতা হয়ে গেছেন। এত সব হওয়ার পর কবি আজও বেঁচে আছেন। এ রূপ সত্যিকারের আমার তোমার। আমি তুমি আজ এই অবক্ষয়ী আধুনিকতায় রঙিন হয়ে এভাবে বেঁচে আছি। কবি নিজের কথার মধ্য দিয়ে আসলে আমাদের আসল রূপটা তুলে ধরতে চেয়েছেন। উষ্ণতার আশ্রয়ে অর্থাৎ অন্যকে অনুকরণ অনুসরণ করতে গিয়ে নিজের সবকিছু হারিয়ে শেষে নিঃস্ব হয়ে বেঁচে আছি তুমি আমি। 'অবনীশকে' কবিতায় মানুষের সেই শূন্য ফাঁকা রূপটাই তুলে ধরেছেন কবি—যা আজকের বাস্তব আসল রূপ আমাদের।

সময়ের শতচ্ছিন্ন পাতা

সময় সচেতন কবি সময়ের পাল্লায় মেপে আমাদের আজকের আসল বাস্তব প্রকৃত রূপ দেখানোর জন্য কবিতা লেখেন। তাঁর 'একা তো কিছুতেই নয়' (১৯৯৭) কাব্যের 'সময়ের শতচ্ছিন্ন পাতা' কবিতায় সেই রূপটি বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। আসলে এই কবিতাটি কবির সময় সচেতনতার একটি সংকেতবিশ্ব। এখানে কবি সময় কিভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পাতার মতো। এবং তাঁর সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ মানে অর্থ সংজ্ঞাও। কবি বলছেন—

''তুমি আমাকে যতো খুশি যতোখানি পারো পোড়াও। আসলে মোবাবাতির
আগুনে তর্জনী পোড়ানো খেলায় এক ধরনের সুখ-যন্ত্রণা, ভালোই লাগে,
কাজেই ছাড়ছি না।''

সময়কে কবি উল্লেখ্য করে বলছেন যত পারো যতখানি পারো পোড়াও। আসলে মোমবাতির নরম আগুনে তর্জনী আঙুল পোড়ানো খেলায় এক রকম সুখযন্ত্রণা পাওয়া যায়। ভালো লাগে আমাদের। তাই সে খেলা ছাড়তে পারছি না। অর্থাৎ সময় আমাদেরকে যেভাবে পোড়াক না কেন আমরাও সে রকম অব্যস্থ হয়ে গেছি—হয়ে যেতে হয় বলে। কবি এখানে নিজের অস্থির সন্ধান করছেন। সময়ের ছিন্ন বিচ্ছিন্নতায় আমাদের যা হারিয়ে গেছে কবি সেই অস্থির খোঁজ করছেন এখানে।

''আমার এই রক্তমাংসে তীব্র হলাহল, দেখো ছোঁবে না আগুনও।''

আমরা কি ছিলাম আর কিসে পরিবর্তিত হচ্ছি। আমাদের রক্তে তীব্র হলাহল কবি বলছেন তার সাথে আগুনও।

যে আগুন তোমাকে জ্বালিয়ে নেবে। কবি বলছেন তাই আমাকে কেউ ছোঁবে না। অর্থাৎ আমাদের জীবনে রক্তেমাংসে একটা আগুনের বেড়া। যে আগুনে আমরা একে অন্যের থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে। মানবিকতা মূল্যবোধ বুনিয়াদ ক্রমে রোগাক্রান্ত হয়ে বিপন্ন হয়ে গেছে আসল কথা সেটাই।

''সময়কে আমরা গড়েপিটে মানুষ করে নিয়েছি, হাতের তালুতে পুতুল যেমন
নাচাও তেম্নি নাচ্‌রে, আর তুমি তো সময়ের শতচ্ছিন্ন পাতা, মধ্যরাতে
এতো অহংকার কীসের? ঝড়ো হাওয়ায় ঝাউগাছ নড়ে উঠ্‌লে যারা ভয়
পায় আমরা তাদের পুষে রাখি শুধুই সংখ্যার প্রয়োজনে। সংখ্যাটা
কখনো সখনো বেশ জরুরি হয়ে পড়ে কি না!
এখন মাটি আমাদের পায়ের তলায় সময় আমাদের
মুঠোয় দিন রাত্রির সীমারেখা
আমাদেরই মর্জিমাফিক।''

পৃথিবীর মানুষ আজ চাঁদ তারায় কবে পৌঁছে গেছে। সব কিছু মানুষের মুঠোয় আজ। কবি তাই বলছেন যে সময়কে আমরা আমাদের হাতুড়ি দিয়ে গড়ে পিটে আমাদের উপযোগী করে নিয়েছি। পুতুলের মতো নাচাতে পারি আমরা। আর সেই সময়ের শতচ্ছিন্ন পাতা তুমি। মধ্য রাতে এত অহংকার কিসের? অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে অনেক স্তরের মানুষ। তাদের এই সময়ের ছিন্নবিচ্ছিন্নতায় কিসের অহঙ্কার। যদি সময়ের সামগ্রিক রূপকে না ধরতে পারো—সময়কে যদি না জয় করতে পারো! কিছু মানুষ যারা একটু বড় ঝড়োবাতাসে তাদের ভিত ছেড়ে চলে যায়। তাদেরকে এ রকমভাবেই রাখে আমাদের মতো মানুষ আমাদের নিজস্ব প্রয়োজনে। তাদের সংখ্যাও আমাদের কখনো দরকার হয়। মাটি আমাদের নিচে পায়ের তলায় সময় হাতের মুঠোয় দিনরাতের সীমানা আমাদের মর্জিমাফিক করে নিয়েছি। মানুষ পৃথিবী জীবন সময় ইত্যাদিকে বিনির্মাণ করে বারবার নিজে বাঁচার জন্য। এই বাঁচা সময়ের তালে তালে। কারণ মানুষ প্রকৃতি পৃথিবীকে এক রকমভাবে বশ করে নিয়েছে তার ক্ষমতায়—বিজ্ঞানের আবিষ্কারের দ্বারা। এখানে মানুষের পৃথিবী, প্রকৃতি ও সময় জয়ের চেয়ে বড় কথা হল নিজে হারিয়ে গেছে মানুষ—কোথাও যন্ত্র হয়ে কোথাও যান্ত্রিক হয়ে।

''সময়কে আমরা হাত করে নিয়েছি, অবশ্য এর জন্যে বিস্তর কাঠ খড়
পুড়িয়ে অমানুষিক পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌তে হয়েছে, এখন
চারদিক থেকে ফসল তুলবো এ আর এমন বড়ো কথা কি!''

মানুষের, ব্যক্তির তখনই পরিবর্তন আসে যখন তার সময় পরিবর্তন হয় বা বদলাতে শুরু করে। কিন্তু আমরা তো সময়ের মধ্যে মিশে গেছি। আর এই মিশে যেতে গিয়ে অনেক কাঠ খড় জ্বেলেছি অমানুষিক পরিশ্রম করে। এই মানুষত্বহীনভাবে সময়ে মিশে গিয়েছি। সমাজে, পৃথিবীর পথে, বিভিন্ন সময়ের টুকরোতে, জীবনের বিভিন্ন মাত্রায় কখন ঘুষ, সুদ খেয়েছি, খুন করেছি কোনও ভাইবোনকে। আমাদের প্রতাপে যে কাঁপে তাকে শোষেছি—অমানুষিক কাজ করে ঘাম ঝরিয়েছি তাই চারদিক থেকে ফসল তুলব এখন এটা বড় বিস্ময়ের কিছুই নয়। কারণ আমরা এই রকমভাবে লালিত হয়েছি পূর্বপুরুষের এইভাবে রকম হাওয়ায় প্রতিপালিত হয়েছি। তাই আমরা সময়কে আমাদের বাঁকে বাঁকে মোড় ফেরাই আমাদের সুবিধামত আমাদের স্বার্থের জন্য।

''আমাদের এখানে তাবড় তাবড় ডিগ্রি-ফিগ্রিওয়ালা ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়াল্‌
থেকে শুরু করে গবেট মুখ সবই আছে ফারাক্‌ নেই কোনো। ফারাক্‌
আছে সে আর এক কথা, তবে হ্যাঁ, এলেম্‌ থাকা চাই।
সোনারপুরের অনাথবন্ধু, কেমোফ্লজ্‌ রোদের মতো হাসি, অনাথবন্ধু উঠে
গেলেন। এলেম্‌ না থাক্‌লে এ লাইনে ঠোক্কর খেতে খেতে একেবারে

প্রত্নতত্ত্বের ভাগাড়ে। তা যা বল্‌ছিলাম, হাত করা নিয়ে কথা। কে কতোটা
হাত করতে পারে ওইটেই মোক্ষম। তারপর আর চিন্তা নেই তরতর করে উঠে
যাও, যতো বেশি হাত করতে পারবে ততোটাই উপরে, গোটা মনুষ্যলোক
তোমার পায়ের নিচে, কাজেই বেজ্‌ শক্ত পড়ে যাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই"

আমাদের মাঝখানে আমাদের সমাজে অনেক বড় বড় ডিগ্রিধারী বুদ্ধিমান থেকে শুরু করে একেবারে মূর্খ সকল ধরনের মানুষ আছে। কোনও ধরনের তফাৎ নেই তার মধ্যে। ফারাক্‌ আছে তবে অন্য জিনিসের তা হল এলেম্‌। এলেম্‌ শব্দটি আরবি ভাষার 'ইল্‌ম' থেকে নেওয়া। যার অর্থ হল জ্ঞান। অর্থাৎ শুধু ডিগ্রি থাকলে হবে না জ্ঞান থাকা চাই। যে জায়গা সোনাপুর। সেখানে কি কেউ অনাথ হয়ে থাকতে পারে?

অনাথ কেউ নেই ওখানে। জ্ঞান না থাকলে সময়ের সাথে চলতে পারবে না পৃথিবীর পথে। বারবার এখানে ঠোক্কর খেতে খেতে মাটির নিচের প্রত্নতত্ত্বের মতো সবার নিচে পড়ে রবে। তবে কবি যা বলছিলেন সেটা হল হাত করে নেওয়ার কথা যে কে কতটা হাত করতে নিতে পারে। তার মানে হল নিজের আয়ত্তে করে নেওয়া দখল অধিকারে নেওয়া এটাই মূল জিনিস—উদ্দেশ্য লক্ষ উপলক্ষও। তারপরে কোনও চিন্তা থাকে না। অনেক উপরে উঠে যেতে পারবে। যার যত বেশি হাত লম্বা সমাজে ধর্মে উপরতলার সাথে। সে ততটাই উপরে। তারপর গোটা মনুষ্যলোক তোমার পায়ের নিচে থাকবে। কত মানুষ পায়ে এসে তেল দেবে। কারণ তোমার ভিত শক্ত হয়ে গেছে। পড়ে যাবার কোনও আকাঙ্ক্ষা বা সম্ভাবনা নেই।

উপরের এই সব কথার মানে হল দুর্নীতিতে আমরা এতই লন্ডভন্ড হয়ে গেছি। মানুষের গুণ দাম ওজন অনুযায়ী কাউকে দাম দিতে পারি না। গুণ থাকলেও হয় না হাত লম্বা থাকতে হয়। অফিস আদালত বিদ্যাশিক্ষা থেকে শুরু করে সবকিছুতে দুর্নীতি এমনভাবে আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছি। এই সব কথার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের আজকের ছবি দেখতে পাই সভ্যতা কোন দিকে যাচ্ছে আর কিরকমভাবে আমরা বেঁচে আছি—এই পৃথিবীতে রক্তহীন হয়ে।

"একবার ঠিকঠাক হাত করে নিতে পারলেই হিপনোটাইজড। তারপর
দ্বৈত অদ্বৈতের খেলা অবিরাম চালিয়ে যেতে পারো, কেউ বারণ করবে না।

আমরা যেভাবে কপটতায় নিজের ভিত গেড়ে নিয়েছি তা আর নড়বে না কখনও। আমরা একবার ঠিকঠাক করে হাতের মুঠোয় ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারলে আর চিন্তা নেই। তারপর অনেক রকম খেলা করতে পারি ইচ্ছামত কেউ বাধা দেবে না। কারণ প্রতাপের চেয়ে বড় কোন তাপ নেই। আজকাল যেটা হয় ক্ষমতার খেলা মন্ত্রী নেতারা গুণ্ডা পালিয়ে রাখে ক্ষমতা আদায় করার জন্য ক্ষমতাহীনদের কাছ থেকে—কলে কৌশলে ছলে বলে। একবার সিটে বসে গেলে ব্যস্‌ আর লাগে না রাজার উপরে কোনও রাজা নেই। সব রকম খেলা করতে পারে ইচ্ছা মতো। আমাদের চারপাশে কি এ রকম ছবি চিত্র নেই? এ সব তোমার আমার কথা ছাড়া আর কারুর নয় কিন্তু।

"বিদেশের চাটুকার সারমেয়রা এখন নতমুখে স্বদেশাভিমুখে, কেননা ওখানে
এমন চলছে তড়িঘড়ি ছালবদলের পালা। এই সুযোগে আমরাও ওদের
ছাল ছাড়িয়ে একেবারে সারমুক্ত করে নেবো, ব্যাস্‌ ল্যাঠা চুকে গেলো!
বুঝতেই পারছো পাটাতন আমাদের কতোটা মজবুত! কাজেই পথে
তোমাদের আসতেই হবে। সময়ের শতচ্ছিন্ন পাতারা, আমরা ঝাঁট্‌ দিয়ে
তোমাদের এককাট্টা করবো; ছিঁটে ফোঁটা দেবো, তোমরাও তোমাদেরকে
আমাদের দেবে, তারপর জাতীয় সংহতি, সে তো রইলোই আমাদেরই হাতের মুঠোয়!"

পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমরা বিদেশী হয়ে পড়েছি বিশ্বায়নের পৃথিবীতে। অবশেষে খুঁজে

দেখি আমাদের বৃক্ষ ফলহীন। ব্ল্যাক ইংলিশ হয়েছিল যারা তারা ক্রমে ছাল বদলাচ্ছে এখন। তাদের এই বদলানোর পালা এখন। কবি বলছেন এই সুযোগে আমরাও তাদের হাল ছেড়ে একেবারে সারমুক্ত অর্থাৎ অনুকরণ করে কিছু করব না আর। কিন্তু এতদিনের এই জীবনচর্চা চর্যায় আমাদের ভিত কি মজবুত হয়েছে! এসব ছাল কি খুলে ফেলা কি এত সহজ! কাজেই কবি ভাবছেন সময়ের সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন টুকরা ঝাড়ু দিয়ে জমিয়ে নেব আর আমরা পর পর পরস্পরকে দেওয়া নেওয়া করে ঠিক হয়ে যাব। তারপর জাতীয় সংহতি ইত্যাদি তো আমাদের হাতের আওতায় রয়েই গেছে।

অন্যরকম করে এই সব কথা বললে এরকম হবে। বিদেশে আমাদের যত চাটুকার স্যারমেম্‌রা আজকাল সব মুখ নত করে নিজের দেশে ফিরছে। তার নিজের শিকড়ের দিকে দেখছে। এখানে মহাত্মা গান্ধীর সাউথ আফ্রিকার (১৮৯২-১৯১৪) লাঞ্ছনার ঘটনা মনে করতে পারি। আমরা তখনই নিজেকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হই যখন অন্য কেউ আমাদের চামড়ার (ভিতের) পরিচয় করিয়ে দেয়। কবি বলছেন আমরাও সেই সুযোগে নিজেকে বদলে নেব। বিদেশের সারমশলা বদলে একান্ত নিজস্ব হয়াটা ঠিক ভাবছেন কারণ এখানে নিজস্বতা খুব কম থাকে। তারপর বলছেন এতদিন সময়ের শতছিন্ন টুকরা যা হবার হয়ে গেছে এখন যাতে আমরা নিজের ভিতকে মাটিতে মজবুত করে রাখতে পারি। এবং আমাদের জাতীয় সংহতি তো এমনেই সুরক্ষিত হয়ে যাবে। যদি আমরা আমাদের Tradition and Individual Talent[16]—কে ভালোভাবে চাষ করি নিজস্বতায়—ঔপনিবেশিকতাকে পার হয়ে গিয়ে। তখনই আমরা স্বাধীন ও মুক্ত হয়ে জীবনযাপন করতে পারব।

অতীন দাশ

গোর্কীর মায়ের মত অরুন্ধতী

> *" বক্তব্যের দিক থেকে অতীন দাশের কবিতাগুলি খুব স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। অযথা কুহেলিকার আবরণ সৃষ্টি না করে তিনি কঠিন কথা সোজাভাবেই পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন। ব্যক্তিগত জীবনের রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তাও তাঁর কবিতায় যত্রতত্র ঢুকে পড়ে। বাস্তবজীবনের সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাঁর রচনায় সুন্দরভাবে প্রকাশিত।"*[৪৮]

কবি অতীন দাশের কবিতা আলোচনার আগে এই কথাটি একবার স্মরণ করে এগিয়ে যেতে পারি। কারণ সমালোচক খুব সহজ ভাষায় অতীন দাশের কবি ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দিয়েছেন গভীরভাবে।

অতীন দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা হল 'গোর্কীয় মায়ের মত অরুন্ধতী' (১৯৮২) কবিতাটি। এই কবিতার ভেতরের অর্থ এত প্রসারিত যে কম কথায় প্রকাশ করা বড় কঠিন। কবিতাটির নামের এক বিশেষ অর্থ আছে। ম্যাক্সিম গোর্কীর আসল নাম আলেক্সি মাক্সিমভ্ পোশকভ্। এক সময় জীবনযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। পরে জখম অবস্থা সারিয়ে উঠেন এবং বেঁচে যান। তারপর তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন এবং সেই সময় নাম গ্রহণ করেন ম্যাক্সিম গোর্কী। যার অর্থ হল 'চরম তিক্ত'। গোর্কীর আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় তার মার যে অবস্থা হয়েছিল অরুন্ধতীর অবস্থাটা তার সাথে তুলনা করে কবি এই কবিতার নাম দেন 'গোর্কীর মায়ের মত অরুন্ধতী।' কবিতাটির শুরু এরকম—

> "দেখেও মিটেনা স্বাদ—ঝাপ্‌সা চোখে শাড়ীর আঁচল
> পরম আদরে মৃদু চুমু খান—দুরন্ত নিঃশ্বাস
> কখন বেরিয়ে আসে, হকচকিয়ে তাকান পেছনে,
> না, কেউ দেখেনি তার দুর্বলতা, দুই হাত চেপে ধরে বুকে

কি যেন লুকান তিনি, না, এ লুকানো নয়—
আলিঙ্গন, স্মৃতির ছায়ারা করে ভীড়—
একই ফ্রেমে দুই ছবি—অবিনাশ আর অনুপম।"

কবিতাটির মধ্যে একটা কাহিনি আছে আর তাতে তিনটা জীবনের কথকতা। একটা নাটকীয়তার মাধ্যমে এই গল্প প্রকাশ পেয়েছে। দেখতে দেখতে মিটে না স্বাদ—বয়স হয়ে গেছে গোর্কীর মায়ের মতো চোখে আলো ঝাপসা দেখেন। শাড়ীর আঁচলে মাথাটা ঢাকা। দুরন্ত নিঃশ্বাস কোন সময়ে বেরিয়ে আসে টের পাননি। কখন পিছে তাকান কেউ দেখে না যেন তার এই দুর্বলতা। দুটা হাতে তার বুকে চেপে ধরে কী যে লুকান কিন্তু এটা লুকানো নয়। আলিঙ্গন অতীতের স্মৃতিরা ভীড় করে তার মনের মধ্যে অবিরাম। 'একটা ফ্রেমে দুই ছবি—অবিনাশ আর অনুপম।' এই লাইনেই উপরের ঝাপসা কথাগুলি একেকার পরিস্কার হয়ে যায়। এই স্তবক যেন কবিতাটির ভূমিকা। একটা ফ্রেমের মধ্যে দুটা ছবি বুকে চেপে ধরে এক বৃদ্ধা কাঁদছেন অহরহ আর অতীতের সকল স্মৃতি তার মনে উঠছে আর পড়ছে। মৃত সন্তানের ছবি দেখে যে রকম কোনও মা কাঁদেন তার ছেলের জন্য। অরুন্ধতীও কাঁদছেন সে রকম গোর্কীর মায়ের মতন। নিজের সন্তানের কথা বলতে গিয়ে বলছেন তিনি—

"আজন্ম বিপ্লবী ছিলেন অবিনাশ, পরাধীন দেশের শৃঙ্খল
গুরুভার বুকে যেন, অহর্নিশি একই ধ্যান
সংগ্রামের সহস্র উদ্যোগ, জেলখানা, লাঠি-গুলি
শরীরের সর্বত্র চিহ্নিত;
এরই মধ্যে বুকে এলো
অনুপম, কি আশ্চর্য, পিতারই প্রকৃষ্ট প্রতিচ্ছবি
প্রতিলোমে উদ্ভাসিত উত্তরাধিকার।"

অরুন্ধতী বলছেন তার ছেলে অবিনাশ যার বিনাশ হয় না। সে আজন্ম ছিল বিপ্লবী। পরাধীন দেশের সকল দ্বায়িত্বভার ছিল তার বুকে বঙ্গ সন্তান হিসেবে। সবসময় একটা ছিল ধ্যান সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া, জেলখানা, লাঠি, গুলি শরীরের অসংখ্য চিহ্ন। এই সবের মধ্যে তার বুকে এল অনুপম যার কোন তুলনা হয় না। অনুপম তার পিতার মতো ছিল বলিষ্ঠ এবং পিতার যোগ্য উত্তরাধিকার।

অবিনাশ ছিল বিপ্লবী তাই তার শরীরে অনেক দাগ লাঠির গুলির। অবিনাশের এই অবস্থায় মায়ের বুকে এল অনুপম। কিন্তু সময় তো আর থেমে থাকে না। সব কিছুকে পার হয়ে গিয়ে স্বাধীনতা এল দেশে। এই দেশ কিন্তু ভারতবর্ষ বাংলাদেশ— গোর্কীর রাশিয়া নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাশিয়ার চিঠি' প্রবন্ধে রাশিয়া সম্পর্কে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন অনেক আগে। আমাদের ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অন্যরকম। অবিনাশ জীর্ণ দেহে মনে তবুও তার কোনও ক্লান্তি নেই। চারদিকে নয়া স্লোগান কাকদ্বীপ তেলেঙ্গানা ইত্যাদি নয়া রাজ্যের দাবি। স্বাধীন স্বদেশে রক্ত বইছে (গত দু'বছর আগে তেলেঙ্গনা একটা স্বতন্ত্র রাজ্য হয়ে গেল অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে) দেশের এই সব টালমাটাল অবস্থায় দেশের অবিনাশ ক্রমে বিনাশ হচ্ছে দিনদিন। কবি বলছেন দেশকে এই টুকরো টুকরো করে দুর্বল করছে। এবং সেই থেকে অবিনাশ আজও নিরুদ্দেশ—কোথায় হারিয়ে গেছে। কবি বলছেন—

"নাকি মৃত? শুধুই সন্দেহ জাগে—
সন্দেহ জাগায় অনুপমও, কি যে করে সারাদিন
কখনবা ফিরে, বাড়িতে গম্ভীর মুখ
সারাক্ষণ বই আর বই
কখনো বন্ধুরা আসে,—অনুচ্চ কথায়ও উত্তেজনা।"

অবিনাশ কি আজ বেঁচে আছে নাকি সে মৃত? আজ কেবলই সন্দেহ জাগে। অনুপমও আজ সন্দেহ জাগায়,

সারাটাদিন কি যে করে। কখনও বাড়িতে আসে গম্ভীর মুখ কখনও। সারাদিন বই নিয়ে ব্যস্ত। কখনও বন্ধুরা আসে তাদের সাথে ছোট্ট ছোট্ট কথায় উত্তেজনায় মেতে ওঠে। অর্থাৎ যে অনুপম আজ বেঁচে আছে সেও সন্দেহ জাগায় কি রকমভাবে বেঁচে আছে! অনুপমের মানসিক অবস্থাটা একেবারে বিকৃত এক রকম। যে অনুপম এ রকম ছিল না সে আজ সময়ের ক্ষয় রোগে আক্রান্ত ক্ষয়রোগী। আধুনিক মানুষের মতো কোথাও সে শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না। মানসিকভাবে অস্থির, মানসিক রোগে ভোগছে সে। কিন্তু তারপর কি হল—

> ''তারপর এক রাতে সশস্ত্র পুলিশ ঘরে এলো
> তছনছ, অনেক জিজ্ঞাসা—
> দুশ্চিন্তা প্রবল হয়, অনুপম আজও ফেরে নাই।''

অবিনাশ বিনাশ হয়ে যাওয়ার পর অনুপমের অবস্থাটা বিপন্ন হয়ে গেছে। এরই মধ্যে অনুপম কি যে করেছে! এবং এক রাতে পুলিশেরা এসে ঘরে সবকিছু তছনছ করে তল্লাসি নিয়েছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সবাই অনেক দুশ্চিন্তা করছে। পুলিশেরা অনুপমকে নিয়ে গেছে। তারপর অনুপম সেদিন থেকে আজও ফেরেনি তার ঘরে। ক্রমে সময়ের তাপে অনুপমও হারিয়ে গেল তার কৃতকর্মের জন্য। যে কৃতকর্ম সরকারের System-এর বিরুদ্ধে ছিল কিন্তু মানুষের হিতে ছিল। অবিনাশ যেভাবে হারিয়ে গেল বিপ্লবী সত্তা নিয়ে। অনুপমও নিরব বিপ্লবী সত্তা নিয়ে হেরে যায় রাজশক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু মানুষের মনে একটা সুর জাগিয়েছে তারা—জাগিয়ে ছিল একটা সংগ্রামী বোধ। যে বোধের মানে ছিল নিজের মতো করে বাঁচা। ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশ বলো স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী সাধারণ মানুষের প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল। অবিনাশ ও অনুপমও তাদের প্রতীক কিন্তু।

> ''বয়স গড়িয়ে চলে, ঝাপসা চোখ, বুকে বসে জমাট পাথর
> গোর্কীর মায়ের মত অরুন্ধতী, গুণে যান অতন্দ্র প্রহর।''

অবিনাশ নেই অনুপমও নেই। কিন্তু সময় গড়িয়ে চলছে। তাদের মা এখন বয়স্ক বৃদ্ধা। চোখে ভালোভাবে দেখতে পান না সবকিছু—ঝাপসা লাগে। বুকে ছেলেদের হারিয়ে যাওয়ার করুণ কাহিনি জমে পাথর হয়ে গেছে। গোর্কীর মা যেভাবে গোর্কীর জন্য হয়ে গেছিলেন অরুন্ধতীও আজ ঠিক সেরকম শুধু দিন গুণে যাচ্ছেন। আর কিছুই না। যে সময়ের কোনও ক্লান্তি নেই, তন্দ্রা নেই। অর্থাৎ অবিরাম জ্বলন্ত সময়। এ জ্বালা কিন্তু পুত্রদের হারিয়ে যাওয়ার—অন্য কিছুর না।

কবিতাটির মধ্যে একটা নাটকীয়তা আছে। আর এই নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে এবং আড়ালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটা রূপ ফুটে ওঠেছে। যারা স্বাধীনভাবে নিজের মনের মতো বাঁচতে চেয়েছেন তাদের একটা কাহিনি আর পাশাপাশি তাদের মায়ের করুণ অবস্থা। যে অবস্থা স্বাধীনতার জন্য হারিয়ে যায় অসংখ্য শহীদ সন্তানের মায়ের। সেই করুণ অবস্থা। যে মায়েরা নিজের সন্তানকে নিজের হাতে কবর দিয়েছেন—শ্মশানে নিয়ে গেছেন অন্তিম যাত্রায়। তাদের ভেতরের হাহাকার। এটা কী কম যন্ত্রণাদায়ক— হৃদয়বিদারক বাস্তব!

অতীন দাশের কবিতায় রাজনীতি খুব গভীরভাবে সজীব। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে খুব মেলে—একটা মিল পাওয়া যায়। তবে কবিতাটিতে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের জন্য/ মধ্যে কিভাবে সাধারণ জীবন হারিয়ে যায় তার ছবিটা বেশি প্রকট ও স্পষ্ট।

অন্যদিকে যদি বলি কবিতাটিতে অনুপম ও অবিনাশ দুই মানুষের হারিয়ে যাওয়া ও তাদের মায়ের পুত্রকাতরতা পুত্রশোকে বিলাপ এই সবের একটা সুস্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠেছে। এই দুটি ব্যক্তি ও তাদের জীবন যাত্রা আসলে আজকের মানুষের প্রতীক। এই সংকেতের আড়ালে কবি দেখিয়ে দিচ্ছেন আমাদের বহুমুখী চরিত্রের রূপকে।

করুণাসিন্ধু দে

নুলিয়া, কাণ্ডারী

''কবিতাটির সর্বাঙ্গে, বলা ভালো কোষে কোষে, সঞ্চারিত হয়ে গেছে স্থানিক পরিসরের সূদ সংবেদনা অথচ কোথাও কোন আরোপিত সপ্রতিভতার প্রয়োজন পড়েনি। কবিতাটি কয়েকটি ভাবগত এককে বিন্যস্ত, আবার সব মিলিয়ে, তাতে রয়েছে সামগ্রিক সুরসাম্যের দ্যোতনা।''[৪৯]

'নুলিয়া কাণ্ডারী' কবিতাটির আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক এই কথাগুলি বলেছেন। এই কবিতাটি বিশ্লেষণের প্রাক্‌মুহূর্তে এই কথাগুলি একবার স্মরণ করে নিতে পারি। কারণ খুব কম কথায় তিনি কবিতাটির বাইরের অনেক কথা বলে দিয়েছেন। এখন ভেতরগত আলোচনায় আমরা এগিয়ে যেতে পারি। কবিতাটির শুরু একটা প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে—

''যাব রে নুলিয়া যাব, তোর ভাঙা নৌকার ভিতরে
সাজাব সম্পন্ন ঘর। দূরাগত কঙ্কণের ধ্বনি,
নাকের নোলক, হাসি, দুরন্ত শিশুর কণ্ঠস্বরে
নিথর মুহূর্ত পাবে বিপ্রলব্ধা ঘনিষ্ঠ ঘরণী।''

'যাব রে নুলিয়া' কোথায় যাবেন কবি? কেন? কেন একটা প্রতিশ্রুতি? আমরা বিশ্বাস করি কবি যেখানে এতদিন যাননি অর্থাৎ যেতে পারেননি সেখানে যেতে চান। নুলিয়ার কাছে একেবারে প্রাকৃত জীবনে আবার ফিরে যেতে চান। আর এই প্রাকৃত জীবনকে ধারণ করে নুলিয়ার মতো প্রাকৃতিক অর্থাৎ অকৃত্রিম যান্ত্রিকতাহীনভাবে বেঁচে থেকে জীবন সমুদ্র পাড়ি দিতে চান।

নুলিয়ার নৌকায় সম্পন্ন ঘর সাজাতে চান। তার মানে নুলিয়ার জীবনটি একটি অনুপ্রেরণা। তিনি দেখেছেন আধুনিক অবক্ষয়ে যখন সবকিছু তিল তিল করে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে— সম্পর্ক, সম্বন্ধ, সভ্যতা, মানুষের বোধ এই মানবিক বৈশিষ্ট্য। ঠিক তখন তিনি নিজের অস্তিত্বসহ নুলিয়ার মতো ঘর বাঁধতে চেয়েছেন। কারণ দূর থেকে কঙ্কনের ধ্বনি আসছে তিনি শুনছেন। হয়তবা তাঁর প্রেমিকার নাকের নোলক, হাসি এই সব মনে পড়ছে। কিন্তু এগুলিকে সজীব করে রাখতে হলে একটা ঘর চাই। যেখানে এইসব বৈশিষ্টসহ জীবন উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তাই কবি নুলিয়ার কাছে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। কবি ভাবছেন দুরন্ত শিশুর কণ্ঠস্বরে যখন উচ্চারণ হবে তখন 'বিপ্রলব্ধা' ক্ষণিকের মধ্যে একটা জীবনবোধের কথা মনে পড়ে। মনে হয় তিনি বেঁচে আছেন। সেই মুহূর্ত হবে ঘনিষ্ট ঘরণী। জীবনটা তখন নুলিয়ার জীবনের মতো স্বীকৃতি পাবে নিজের কাছে।

''যাব রে নুলিয়া যাব, তোর জীর্ণ পালের মাস্তুলে
নির্মাণ, গড়াব হাড়ে। এবং প্রসন্ন মনোলোভা
উজ্জ্বল শালিক এসে গান গাইবে দয়ার্দ্র বকুলে,
শিরোপরে, অঞ্জলিতে, গন্ধধূপ নিসর্গের শোভা।''

'নুলিয়া কাণ্ডারী' কবিতায় প্রাকৃত জীবনে অনুষঙ্গয় সবচেয়ে বেশি। তাই এখানে নিম্নবর্গী মানুষের জীবনছবি একেবারে স্পষ্ট ফুটে ওঠেছে নুলিয়ার জীবনতরীর প্রহরী। ঘাটের অসংখ্য মানুষকে সে এপারে এনে দেয় ওপারে নিয়ে যায়। জীবনকে এক নয়া মাত্রা দান করে—যেটি অস্তিত্বের কথা বলে।

কিন্তু কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে কবি অন্যরকম একটা উদ্দেশ্যও প্রকাশ করলেন। প্রথম স্তবকের ভাঙা নৌকাকে

তিনি এখানে নির্মাণ করতে চান নিজের হাড় দিয়ে। আর অস্তিত্ববাদ হাড়ের কথাই সবচেয়ে বেশি করে বলে। নুলিয়ার জীর্ণ পালের মাস্তুলে নির্মাণ গড়াতে চান নিজের হাড় দিয়ে। নিজের শারীরিক পরিশ্রমে ঘামেরক্তে প্রাকৃত নিম্নবর্গীয় মানুষের মতো কাজ করে। এই নির্মাণ গড়ার পর দেখবে মনোলোভা উজ্জ্বল শালিক এসে গাবে গান তার পাশে বকুলের ডালে। তার মাথার ওপারে থাকবে গন্ধধূপে মেশানো শোভা—ঠিক যেরকম দেবতার কাছে অঞ্জলি থাকে। কবির গভীর বিশ্বাস তখন প্রাকৃতিক এইসব বৈশিষ্ট্য নুলিয়ার মতো তাঁর জীবনকে স্বার্থক করে তুলবে।

কবিতাটিতে ভেতরে ভেতরে অন্যরকম একটা ভাব কাজ করে যে যান্ত্রিক জীবন কৃত্রিম জীবনযন্ত্রণায় দহণ হতে হতে কবি কোনও একটু সম্ভবনা দেখতে পাচ্ছেন না। তাই তিনি আবার ফিরে যেতে চাইছেন প্রাকৃত জীবনে। যেখানে তাঁর প্রিয়া থাকবে প্রিয়তমা হয়ে আর থাকবে 'ঘনিষ্ট ঘরণী'র সংসার। 'মনোলোভা' স্বপ্ন থাকবে চারদিকে। জীবনকে উপভোগ করার মতো অসংখ্য উপদান থাকবে তাদের চারপাশে। তখন নিজের অস্তিত্ব নুলিয়ার মতো টিকে থাকবে। সমুদ্রের স্বাদ পাওয়ার জন্য নুলিয়ার নৌকা যাত্রায়।

> ''প্রহরী নুলিয়া, শুধু শক্ত হাতে ধরে রাখ্ হাল।
> বিশ্বাসঘাতক হাওয়া, মায়াবিনী তরঙ্গেরা যদি
> গোপন মন্ত্রণা করে একই সঙ্গে ডুবায় কপাল,
> চতুরা নারীর মতো জিহ্বায় গরল তোলে নদী
> বজ্রের নির্ঘোষে; ভাঙে সাজানো সংসার, ঘর, বাড়ি,
> বুকের পাঁজরে তুই মুখোমুখি, নুলিয়া কাণ্ডারী।"

সনেটাকারে রচিত এই কবিতাটির তৃতীয় স্তবকে অন্যরকম একটা সংকেত পাই। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে কবি সম্পন্ন ঘর— হাড় দিয়ে নির্মাণ করেছেন। এবং তৃতীয় স্তবকে এই জিনিসটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। প্রহরী নুলিয়া আর কবি এক হয়ে গেছেন। প্রহরী নুলিয়ার মধ্যে কবি নিজে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। আর বলছেন শক্ত হাতে হাল ধরে রাখতে। যাতে বিশ্বাসঘাতক হাওয়া অর্থাৎ পথ চলার বেগ স্রোত ও মায়াবিনী তরঙ্গেরা কোনও মন্ত্রণা দিয়ে তাকে হালচ্যুত করতে না পারে। যেন তার ভাগ্য না ডুবায় কোনও বাইরের শক্তি। চতুরা নারীর মতো যদি সময় বজ্রের নির্ঘোষে প্রতিকূল করে তুলে নুলিয়ার পথ তবে যেন সে তার মোকাবিলা করতে পারে। সে জন্য কবি তার নুলিয়াকে উজ্জ্বল শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। জীবনের গতিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট। জীবনের পথে চলতে চলতে জীবনসমুদ্রের পথে যেন তার না ভাঙে সাজানো সংসার ঘর বাড়ি। তার জন্য কবি বারবার নুলিয়াকে হুঁশিয়ার করছেন এবং সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করছেন। এত সব উপমা উদাহরণ তুলে ধরে নুলিয়াকে তার অস্তিত্ব টিকে রাখার জন্যই বলছেন—

> 'বুকের পাঁজরে তুই মুখোমুখি, নুলিয়া কাণ্ডারী।'

এই শেষ লাইনের মধ্যে কবি ও নুলিয়া একাকার হয়ে যান। এখানে কেউ নেই 'বুকের পাঁজরে' শুধু নুলিয়া তার নিজের মুখোমুখি। সে এখানে নিজেকে জয় করতে হবে এবং কাণ্ডারী হয়ে পাড়ি দিতে হবে জীবনমুদ্রে। বায়রণ বলেছিলেন তাঁর 'Don Juan'[17] কাব্যের শুরুতে 'I want a Hero'। আমাদের মনে হয় করুণাসিন্ধু দে-ও চান একজন নুলিয়া কাণ্ডারী। এই চাওয়াটা কিন্তু এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যই—নিজের অস্তিত্বসহ, ব্যক্তিত্বসহ, আত্মমর্যাদাসহ। 'কাঠ পারিপার্শ্বিকের মালা' (১৯৬৩) গ্রন্থটি অস্তিত্ব টিকে রাখার জন্য সংগ্রাম করার একটি সজ্জিত মাঠ। সমালোচকের ভাষায় এই কবিতাটির কথা শেষ করছি—

> *''কবিতার ভাষায় এই যে বিরল গাঢ়তা অর্জিত হল, এর কারণ, করুণাসিন্ধু*
> *শব্দ সমবায়কে নৈঃশব্দ্যের পরিপূরক করে তুলেছেন।"*[৫০]

শান্তনু ঘোষ

এত ধৈর্য কিসের, আমায় তুমি ধৈর্য শেখাবে

"উন্মুল নাগরিকতা, তুমুল নতুনত্ব, আত্মবিদারক ভাষা ঃ এই সব ছিল শান্তনুর অয়ুধ। জলপ্রপাতের মতো তাঁর কবিতা বরাকের সামন্ততান্ত্রিক বদ্ধতার দুর্গে আছড়ে পড়েছিল। চেতনা ও অবচেতনার মধ্যবর্তী নিঃশব্দ শূন্যয়াতন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল যেন। সম্ভবত বলা উচিত, ঝল্‌সে গিয়েছিল।"[৫১]

সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে বরাক উপত্যকার মাটিতে কবি শান্তনু ঘোষের কবিতা এক নয়া সংযোজন। তাঁর কবিতা তাঁর সময় থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। তাই আমরা আজ বুঝতে পারি শান্তনুর কবিতা শুধু শান্তনুর মতই। অন্যান্য কবির থেকে অন্য রকম কবিব্যক্তিত্ব খুব ভালো করে ফুটে ওঠেছে তাঁর কবিতায়। 'এত ধৈর্য কিসের, আমায় তুমি ধৈর্য শেখাবে' এই কবিতা আলোচনায় এগিয়ে যাই দেখি কি পাওয়া যায়।

'এত ধৈর্য...' কবিতাটি প্রেমের কবিতা। যেখানে শুধু প্রেম নয়। জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছুকেও অনুধাবণ করা যায়। কিন্তু প্রেমের মাত্রাটা একটু বেশি— যে প্রেম নাগরিক। কবিতাটির শুরু এভাবে—

"তুমি কেমন ঐ ডাইনিং টেবিলের মোড়টিতে
ঘড়ির কাটার মতন অমন টিকটিক
নীরব হয়ে বসে থাক, আমি তো পারি না,
সামরিক শাসনের সমান তোমার ঐ অমিত প্রতাপ ধৈর্য
ইস, কাঁটা চামচের মতন অমোঘ হয়ে বসে থাক,
মায়ের পায়ের আশেপাশে বিড়াল যেমন ঘুরে তুমি
ঐ চক্ষু নামালে,"

'তুমি' শব্দ দিয়ে কবিতাটির শুরু। তুমি কি রকম করে ডাইনিং টেবিলের মোড়টিতে ঘড়ির কাঁটার মতো টিকটিক নীরব হয়ে বসে থাকো। অর্থাৎ সময়ের সাথে তুমি চলছ অথচ এক সার্কুলের মধ্যে বন্দি 'তুমি'। এই তুমির পূর্ণ আধার আমরা একটু পরে পাব। কবি বলছেন যে তিনি তো পারেন না। সামরিক শাসনের মত তোমার শক্তি ও ধৈর্য। তার মানে সময় তোমাকে এভাবে প্রস্তুত করেছে, নির্মাণ করেছে তোমাকে। এভাবে ডাইনিং টেবিলের কাঁটা চামচের মতো চুপ হয়ে বসে থাকো। আবার কখনও মায়ের পায়ের চারদিকে বিড়ালের মতো ঘুরতে থাকো। এই সব কথার অর্থ কবির 'তুমি' একটা System এর ভেতরে বন্দি। কবি চান তাকে সেই বৃত্তকে ভেঙে মুক্ত করতে। কারণ এখানে তার নিজস্বতা নেই কোনও। কবির উদ্দেশ্য বেড়াজাল ভেঙে খোলা মাঠের সন্ধান দেওয়া।

"আমার ইচ্ছে হয় রবারের বল ভেঙে মুচড়ে দিই, ভেঙে দিই
রেডিয়োর নব, আমি ধৈর্যটিকে
উল্টে পাল্টে বিমান হত্যাকাণ্ডের মতন
ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে করি, কিন্তু সেও তো পারি না
তুমি এখনও ঐ আইসক্রিমের শূন্য কাপটির মত বসে আছো"

কবির ইচ্ছে হয় রবারের বল ভেঙে মুচড়ে দিয়ে, রেডিওর নব ভেঙে, সেই ধৈর্যকে বিমান হত্যাকান্ডের মতো উল্টোপাল্টে ধ্বংস করে দিতে। কিন্তু তা পারেননি। এই সংকেতবার্তার মাঝে যে সার্কুলেশন 'তুমি'-কে ঘুরাচ্ছে গোলকধাঁধায়। সেই যান্ত্রিকতাকেই ভেঙে দিয়ে এক নয়া জীবনের বার্তা দেওয়া। কিন্তু কবি পারেননি। কারণ এখনও সে আইসক্রিমের শূন্য কাপের মতো নিঃস্ব হয়ে বসে আছে। সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে ধৈর্য ধরে। কবিতার ভাষা সংকেতের ভাষা। সাংকেতিকতার মধ্য দিয়ে কবিতা কথা বলে। আমরা পাঠককে তা সে রকমভাবে বুঝতে হয়। আর

শান্তনু ঘোষের কবিতা অনেক বেশি আধুনিক, অনেক বেশি প্রগতিশীল। তাই আমাদেরকে একটু বেশি সচেতনভাবে পথহাঁটতে হবে। তারপর বৈষ্ণব কবির মতো বলছেন—

''সখিরে, তোমার কিসের দুঃখ
আমি কি তোমার ধৈর্য বুদ্ধি না,
আমায় বলো না, সখা, তোমার কিসের দুঃখ
তোমার চঞ্চলতা আমি কি বুঝি না,
সখিরে, কেন তুমি অকারণ মায়ের পায়ের কাছে কাছে,
কেন তুমি দেওয়ালের আয়নাহীন চুপ বসে আছো''

এই স্তবকে কবি প্রথম স্পষ্ট করে 'তুমি'র পরিচয় দিয়েছেন সখি বলে। অর্থাৎ কবির প্রেয়সী যাকে কবি মুক্ত করতে চান সময়ের যান্ত্রিকতা থেকে গোলকধাঁধা ভেঙে। সখি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবাপন্নতা ওঠে আসছে। হয়তবা বৈষ্ণবপ্রেম কবির মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

কবি এখানে একটা জিজ্ঞাসা ছুড়ে দিয়েছেন 'সখিরে তোমার কিসের দুঃখ' 'আমি কি তোমার ধৈর্য বুঝি না'! কবি স্বীকার করছেন যে এই বন্দিত্বে কবির প্রেয়সীর কোনও দোষ নেই। সময় সমাজ পূর্বপুরুষেরা তাকে এভাবে নির্মাণ করেছে। তাই তিনি এক রকম আক্ষেপ করে বলছেন আমি কি এইসব বুঝি না! কবিও সেই রকম সহানুভূতি ও আশ্রয় চান। তাই প্রিয়ার উদ্দেশ্য বলছেন যে আমাকেও বলো তুমি, সখা তোমার কিসের দুঃখ! এই দুঃখের জন্য চঞ্চলতা কি আমি বুঝি না। সখিরে তুমি বিনা কারণে যে পূর্বপুরুষের সেই বন্দি পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে হেঁটে যাও এবং চুপ করে সবকিছু মেনে নেও বন্দিত্ব।

''সখারে, কেন তোমার ঐ ইয়াংকি শয়তানের মত আলাদিন চোখ
কেন তুমি ঐ দেয়াল ভাঙা মথের মতন উড়াউড়ি
আর হাতছানি
নদীর গহন থেকে কেমন ছিপটি চুরি গেল''

আলাদিনের কিছুই ছিল না। কিন্তু সে তার ইয়াংকি শয়তান বা জিনের সাহায্যে একটা ছায়া পৃথিবী আবিষ্কার করেছিল। আর নিবিড় চোখে সেই পৃথিবীকে সে দেখেছিল। তবে কেন তুমি দেয়াল ভাঙা মথের মতো উড়াউড়ি করো। নদীর গভীর থেকে কেমন যেন তার ছিপটি চুরি হয়ে গেল। সেই ছিপ খুঁজের দিকে নজর দিতে বলছেন। অর্থাৎ তোমার ছিল যা সেগুলি হারিয়ে গেছে। তার দিকে একটু খেয়াল করে যা আছে তাকে আবিষ্কার করো নতুন করে।

''ইচ্ছে হয় তোমায় নিয়ে দূরদেশে উড়ে যাই, যেমন কানাডা
শংকরাচার্যের মতন আমার এই হাত দারুণ মেধাবী
তোমায় আমি নতশির তুলে নেব, উল্টেপাল্টে আগুনের
ফুল্কির মতন শূন্যে, নামিয়ে
নামিয়ে আবার টোরান্টো হ্রদের তীরে, ইচ্ছে হয়
আবার দেশে ফিরব, ট্রাফিকের চাকায় যদি কোনো
সংঘর্ষ, তবে হবে,''

কবি তার প্রিয়ার সেই বন্দিদশা দেখে ইচ্ছা করেন তাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে কানাডায়। শংকরাচার্যের মতো তাঁর হাত ধারুণ মেধাবী। প্রিয়ার কাছে নতমাথা তুলে দিতে পারেন আকাশের দিকে আগুন যেভাবে তার মাথা শূন্যে উপরের দিকে তুলে দেয়। আবার নামিয়ে আনতে চান টোরন্টো হ্রদের তীরে, নিজের দেশে। তখন যদি কোনও গোল বাঁধে বাঁধুক—সংঘর্ষ যদি হয় তবে হোক। তার মানে গোলকধাঁধা ভেঙে বাইরের পৃথিবীকে দেখিয়ে এনে আবার নিজের অবস্থানের মুখোমুখি করে দিলেন প্রিয়া বুঝবে সে কে? তার অবস্থান কোথায় ছিল বা আজ কোথায়!

এইভাবে শব্দের সাথে শব্দের জোড়া দিয়ে নৈঃশব্দ্যকে সৃষ্টি করেছেন শান্তনু ঘোষ। এবং এই নৈঃশব্দ্যের ভেতরে ফুটে ওঠেছে অনেকার্থদ্যোতনা—জীবনের বিনির্মাণ। আধুনিকতার ভাঙাগড়ার দ্বারা আধুনিক প্রেমও যে একটা নয়া মাত্রা পেয়েছিল। তার সম্পূর্ণ একটা রূপ ধরা পড়েছে এই কবিতার পরতে পরতে—কোথাও সংকেত দিয়ে, কোথাও চিহ্ন দিয়ে আর কোথাও নতুন শব্দ সংযোজন দিয়ে।

''আমি নীল পুলিশের সামনেই তোমায় চুমু খাব, খুব তাড়াতাড়ি
বাস উল্টান পথেই আমি রক্তের গন্ধ শুকব আহতের
ঐ গোল বাড়িটার উঁচু থেকে আমি দেখি নিবে যায়
অতি বড় সেন্টিমেন্টাল চাঁদের পাহারা
নীচে আর্তনাদ হয়, আর (তবুও) তোমার ছায়া
আমি অমলিন রাখি, যেন বা রক্ত নখর''

কবিতা একবাচনিক বা দ্বিবাচনিক হয় না (বিশেষ করে ভালো কবিতা) কিন্তু শান্তনু ঘোষের কবিতা বহুবাচনিক তো বটেই। সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা নাটকীয়তা তাঁর কবিতার গভীরে কাজ করে ভেতরে ভিতরে। এটা তাঁর কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

উপরের স্তবক পর্যন্ত এক প্রকার প্রস্তুতির কাজ চলছিল তাঁর প্রেমিকার। কিন্তু এখানে একটা চূড়ান্ত রূপ লাভ করল। এখানে সমাজের, ধর্মের, রীতিনীতি, আইনকানুনের পরোয়া না করে সকল বেড়াজাল ভেঙে বললেন যে তিনি 'নীল পুলিশের সামনে' তার প্রিয়ার চুমু খাবেন। বরাক উপত্যকার অনুর্বর মাটিতে এ রকম একটা Challange কম বড় কথা না কিন্তু। শান্তনু ঘোষের কবিতায় সেই বিস্ফোরণ বা ঝড় ছিল বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতায় একটা নয়া মাত্রা ও নয়া সংযোজন।

খুব তাড়াতাড়ি বাস উল্টান পথে তিনি রক্তের গন্ধ পাবেন। আর ঐ গোল বাড়িটার উপর থেকে নিবে যায় খুব বড় সেন্টিমেন্টেল চাঁদের প্রহরা— নিচে আর্তনাদ হয়। আধুনিকতার দ্বারা জীবন যখন খুব দ্রুত বদলে যেতে লাগল। তখন বড় বাড়ির সকল আলো সেন্টিমেন্ট চুরমার হয়ে যেতে লাগল। কারণ আধুনিকতার সূর্যের আলো সব জায়গায় পৌঁছাতে লাগল। তবুও কবি তাঁর প্রেমিকার ছায়া অমলিন রাখেন। যদিও বড় বাড়ির নিচে অসংখ্য আর্তনাদ চিৎকার শুরু হয়ে পরিবেশ অনেকটা বদলে গেছিল।

''পাহাড়তলি থেকে নেমে আসছে আস্তে আস্তে নেপালের
রমণীরা বেত্রবতী,
আমি চাই তুমি হাততালি দাও দেখাও অঙ্গুলি তুলি
ঐ যে ঐ যে বাজপাখী
সফল কৃষির মাঠে চাষীরা পিঠ থেকে ঘাম তুলে নেয়,
আমি চাই, তুমি বল, ঐতো এই যে সুন্দর''

এতদিন যারা পাড়ারতলিতে ছিল আজ তারা নেমে আসছে আধুনিকতার আলো দেখে নিজের জীবনকে উন্নত করতে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় পর্বত হিমালয় নেপালকে ধরে আছে দুহাত দিয়ে। তাই কবি বলছেন সবচেয়ে বড় পাহাড় থেকে নেমে আসছে জীবনে খুঁজে। কবি চান তাঁর প্রিয়া এই প্রগতি দেখে হাততালি দিতে আর হাতের আঙুল দেখিয়ে আহ্বান করে কবি দেখিয়ে দিতে চান 'ঐ যে বাজপাখী'। যারা এতদিন শুধু শুষেছে আজ যেন আর শুষতে না পারে। সকল কৃষির মাঠ থেকে চাষীরা পিঠ থেকে ঘাম তুলে নেয় জীবনকে নতুন রঙ দিয়ে রাঙাতে। কবি চান তাঁর প্রিয়া বলে উঠুক এটাই তো জীবন এটাই তো সুন্দর।

এই স্তবক পর্যন্ত কবি তাঁর প্রিয়াকে সার্থক সফল এক ব্যক্তিত্বশীল মানুষ হিসেবে অন্য সকল রমণীর কাছে উদাহরণ স্বরূপ দাঁড় করাতে চাইছেন। নারীচেতনার একটা হালকা মেজাজ ধরা পড়ছে এখানে।

''নবীন মেঘের মত ফেটে পড়ে ঐশ্বর্য জটিল বাড়ির কিনারা
সংবাদ কাগজ থেকে লম্বা ট্রেনের লাইনের মত
সোজা চলে আসে দ্রুততর মায়াবী দুঃখ,
রডোড্রেনড্রন শুকায়, বেতের পাতা ফলময় নড়ে উঠে
আর অমনি তুমি চমমক করে সাদা বুক পেঙ্গুয়িন
পাখির মতন, ডাইনিং টেবিলের সাদা মোড়টিতে
নীরব বসে থাক''

এই স্তবকে কবি আবার একটু দুঃখের ভারে ভারি হয়ে পড়েছেন। নয়া মেঘের মতো ফেটে পড়ে ঐশ্বর্য জটিল বাড়ির কিনারা। অর্থাৎ এতদিনের সকল ধ্যান ধারণায় নির্মিত সকল ঐশ্বর্য ভেঙে পড়ছে। ঐশ্বর্য জটিল বাড়ির ভিত নড়ে গেছে আধুনিক যুক্তিবাদী জীবনের ধ্যানধারণার আঘাতে ছোঁয়ায়। এই সব দুঃখ বড় দ্রুততর মায়াবী রূপ ধরে আসছে চলে সোজা। বেতের পাতার ফলমূল নড়ে ওঠে। আর এইসব দেখে তুমি পেঙ্গুয়িনের মতো সাদা বুক লয়ে ডাইনিং টেবিলের সাদা মোড়টিতে একা নীরব হয়ে বসে থাক। তার মানে কবির প্রিয়ার কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। কিন্তু কবি চান সে যে তার ব্যক্তিত্বে অসংখ্য রমণীকে অন্ধকার থেকে টেনে আনে আলোর দিকে। আধুনিক জীবনের কিছু যন্ত্রণাময়তা তাকে আচ্ছন্ন করে আছে। সেই নেতিবাচক অর্থাৎ তাঁর প্রিয়ার জন্য হানিকারক, অচল অবস্থাটা যেন ভেঙে বার হয়ে আসে সে।

''আমি চাই তুমি অন্যরকম হও
শাড়ির বাতাসে বাতাসে নিহত চঞ্চল, হাসি কুলকুচো করো
সাবানের ফেনার মত বিষাদ নাড়াও, হায় লুণ্ঠিত ভৈবব
শুধু কণ্ঠ তুলে, 'তুমি দেখ'
আর অমনি তুমি মায়ের পায়ের কাছে কেবলি থমকানো চোখ
এত ধৈর্য কিসের, আমায় তুমি ধৈর্য শেখাবে।''

কবিতাটির শেষ স্তবকে এসে কবি উপসংহার স্বরূপ বলছেন যে তিনি চান তাঁর প্রিয়া ঐ রকম একটা সত্তা/ব্যক্তিত্ব হোক— যেন অন্যরকম হয়। যে রকম কবি চান। শাড়ির বাতাসে বাতাসে মৃত চঞ্চল হাসি কুলকুচো করো, বিষাদ নাড়াও সাবানের ফেনার মতো, হার লুণ্ঠিত ভৈবব। তার মানে তোমার অনেক কিছু লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। কবির সেই ইপ্সিত হওয়াকে তিনি একটা নয়া রূপ দিতে চেয়েছেন এই কবিতায়। শুধু কণ্ঠ তুলে অর্থাৎ জোর করে তুমি দেখ। কারণ কবি তাঁর প্রিয়াকে নিজস্ব অবস্থান পরিসর দেখিয়ে দিচ্ছেন তিল তিল করে। যাতে সে নিজেকে বিনির্মাণ করতে পারে। অনেকদিন বন্দিত্ব মেনে নিয়ে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে সে। লুণ্ঠিত হয়ে গেছে তার কত কিছু। কবি চান তার সেই সব পূরণ করতে পারে যেন সে। কিন্তু কবির প্রেমিকা নিরব হয়ে থমকানো চোখে মায়ের পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে এগিয়ে যাচ্ছে। সে নয়া কোনও পথ আবিষ্কার করছে না। তাই কবি বলছেন 'এত ধৈর্য কিসের, আমায় তুমি ধৈর্য শেখাবে'। অবশেষে প্রিয়ার ধৈর্যের মধ্যে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। এটা কিন্তু আত্মসর্ম্পণ নয়—আত্ম-আবিষ্কার।

অন্য নীরবতা

''অন্যভাবে বলা যায় আধুনিকতার নিতান্ত সূচনাপর্বে তিনি আসলে বহুদূরবর্তী আধুনিকোত্তর পর্যায়ের আভাস নিয়ে এসেছিলেন।''[৫২]

শান্তনু ঘোষের কবিতা চর্চা করতে গিয়ে সমালোচক এই মন্তব্য করেছেন। পূর্বে আলোচিত কবিতা চর্চায় বলেছি যে তিনি তাঁর নিজস্ব সময় থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। এই সব কথার প্রমাণ আবার অন্য রকম করে মেলে তাঁর 'অন্য নীরবতা' কবিতায়। যেখানে কবি নিজের ভেতরের সত্তার মুখোমুখি—দ্বন্দ্বে দ্বিধায় সংগ্রামে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তিনিও যে নিজে পরিবর্তন হচ্ছেন তা তিনি বুঝেছেন। সেই উপলব্ধি ও অনুভূতিকে এক নয়া মাত্রা দিয়েছেন এই কবিতায়।

এই কবিতায় তিনি নিজেকে নতুন করে দেখতে চেয়েছেন। কবিতাটির শুরু এভাবে—

''তোমার কি মাঝে মাঝে গুরুতর কোন অসুখ হয়, শান্তনু
ইজিচেয়ারে শুয়ে আছ, তবুও তোমার কষ্ট, রেডিআের নব
ঘোরালেই সুচিত্রা মিত্রের গলা
অমনি অদূরের সাদা বাড়ি থেকে চিঠিগুলি নিয়ে দৌড়ে
আসে একটি বেড়াল, নারকেল গাছের পাতা নড়ে ওঠে, আর আমার
ব্যালকনীর
ক্যাকটাসের বড় দুঃখ
তুমি হাওয়ার পানে তাকিয়ে আছ, অমনি হাওয়ার নারী মূর্ত্তি
কপালের কাঁচাটিপ, ঘোমটায় বাঁধা রইল কেশপাশ''

কবি তাঁর চারদিক ভালোভাবে দেখেছেন। এই দেখায় যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সে কথাই বলছেন নিজের সত্তার সঙ্গে কথোপকথন করে। তোমার কোন অসুখ হয়। ইজিচেয়ারে শুয়ে থেকেও তোমার কষ্ট। রেডিওর সুইচ ঘোরালেই সুচিত্রা মিত্রের গলা। অর্থাৎ শারীরিক মানসিক সব ধরনের আরাম প্রাপ্ত হয় তোমার শান্তনু ঘোষ। তবুও তোমার কষ্ট হয়। দূর বাড়ি থেকে চিঠি নিয়ে দৌড়ে আসে বেড়াল তার ছোঁয়ায় নারকেল গাছের পাতা নড়ে। কবির ব্যালকনির কাঁটাগাছ ক্যাকটাসের বড় দুঃখ হয়। তার মানে সব কিছু তিনি পান তবুও ভেতর থেকে শান্তি নিরবতা কোথায় হারিয়ে গেছে। কারণ মানুষের এই রকম পরিবেশ আসে পরিস্থিতিও যে সময় সবকিছু উপযুক্ত ও অনুকূল থাকলেও সবকিছু বিপরীত লাগে। কারণ মানুষের বাইরের সত্তা ভেতরের সত্তার সঙ্গে ভারসাম্যতা বজায় রাখতে পারে না তখন। এর পরেই তার কণ্ঠে আবার উচ্চারিত হয়—

''ইজিচেয়ারে সন্ধ্যা সাতটায় শুয়ে আছ, তবুও বুঝি তুমি
অস্বাভাবিক, তোমারই হৃদয়ের
মধ্যিখানে বুঝি নীরবতা সন্ধ্যাপূজা করে, মন্ত্র সুর করে পড়া হয়
এই নীরবতা বুঝি অসহনীয়, তবে তোমার অন্য নীরবতা কে
কেড়ে নিল?''

সময় গড়িয়ে যায় শান্তনু শুয়ে আছে ইজিচেয়ারে। কারণ সে তখন প্রায় অস্বাভাবিক তার হৃদয়ের মাঝে নীরবতায় সন্ধ্যাপূজা করে। মন্ত্র পড়া হয় সুর করে। কিন্তু সেই নীরবতা তার জন্য অসহনীয়। এখানে কবি নিজেকে প্রশ্ন করছেন তুমি যে নীরবতা চাও সে নীরবতা কে কেড়ে নিল তোমার কাছ থেকে? শান্তনু যে নীরবতায় আছে সেটা তার নিজস্ব নীরবতা নয়। তার কাঙ্খিত নীরবতা কেড়ে নিয়েছে অন্য কেউ। সে কে? কোন চোর? আমরা তো বুঝি সময় ছাড়া কেউ নয়। সময় তাকে ঐভাবে আত্মাবিষ্কার করতে দিচ্ছে না। অস্বাভাবিকভাবে যান্ত্রিকতার জালে বেঁধে অন্যরকম নীরবতায় বন্দি করে নিচ্ছে। কিন্তু কবি সে নীরবতা চাননি। তিনি চেয়েছেন অন্য নীরবতা। যা তাকে আশ্রয় দেবে একটু প্রাকৃতিক শান্তির নীরবতায় নাতিশীতোষ্ণ কোলে।

''তোমার অমন চুলের গুছির মতন দীর্ঘ দীর্ঘ অন্য নীরবতা
অন্য নীরবতা এখন চায়ের দোকানে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে

অন্য নীরবতা এখন 'মিলন নাই, মিলন নাই' বলে কান্না করে বড়
শান্তনু ঘোষ
অন্য নীরবতা এখন হিপপকেটে ঘড়ি রেখে চায়ের কাপে
রাজেশ্বরী দত্তের গলা
'কিছুই হল না এ জীবনে'
অন্য নীরবতা এখন রাস্তায় পীচগলা পথ, ছেঁড়া চটি
'চাই বেলফুল' গলির মোড়ে ডাকপাখির ধ্বংস আর
পশিবিকতা
অন্য নীরবতা এখনত 'যৌবন যৌবন' দুঃখে আকাশময় ঘুড়িকাটা খেলা
এক ঘুড়ি কাটা গেলে অন্য ঘুড়ির জন্যে চায়ের দোকানে
সময়ের কাছে নির্বাচনের জন্যে বড় যে আকুতি
আমার ঐ অন্য নীরবতা কেন কেড়ে নিলে?"

এই স্তবকের মধ্যে অনেক রকম অন্য নীরবতার কথা বলেছেন। মানুষ সবচেয়ে সামাজিক জীব। কিন্তু সমাজই তাকে সবচেয়ে অসামাজিক জীব করে তুলে অনেক সময় তার বেড়াজালে বন্দি করে। দৈনন্দিন জীবনের ডাঙাগড়ার মধ্যে যা ঘটে তার থেকে 'অন্য নীরবতা' জিনিসটা কি রকম উপেক্ষিত তাও এখানে দেখানো হয়েছে। কখনও চায়ের দোকানে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে, কখনও 'মিলন নাই, মিলন নাই' বলে কাঁদছে, কখনও রাজেশ্বরী দত্ত হিপপকেটে ঘড়ি রেখে কিছুই হল না এ জীবনেও বলে আফসোস করছে, কখনও রাস্তার পীচগলা পথ, ছেঁড়া চটি, কখনও ডাকপাখি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে 'চাই বেলফুল' বলে ডেকে ডেকে, কখনও 'যৌবন যৌবন' এই দুঃখে কাঁদছে। এইসব কথার অর্থ এরকম দাঁড়ায় যে সময়ের যাঁতাকলে আমরা যেরকম নির্মিত হয়েছি তা আমাদের সম্পূর্ণ বিকাশের উপযোগী নয়। কারণ আমাদেরকে জোর করে অন্য রকম একটা জীবন আরোপ করে দেওয়া হচ্ছে। যে জীবনের জন্য আমরা নই, অন্য কোনও মাপ ওজন দিয়ে আমাদেরকে ওজন করা হচ্ছে হয়/মাপা হচ্ছে/হয়। তাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত 'অন্য নীরবতা' এই ভাবে দোকানে বাজারে রাস্তায় ক্ষয় হয়ে হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা কি করি সময় চলে যাবার পরে একটা ঘুড়ি কেটে গেলে অন্য ঘুড়ির জন্য সময়ের কাছে বড় আকুতি করি অন্য কোন দোকানে বসে। ঐ নীরবতা তবে কেন কেড়ে নিলে? আমরা পথহাঁটার আগেই আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় 'এই' 'এই' তোমার পথ, কাজ ইত্যাদি। তাই আমরা বুঝতে পারি না সেই বন্দিখানা কিভাবে কেড়ে নেয় আমাদের ঐ সব অন্য নীরবতা।

আমি আকাশের টেলিফোন নম্বর জানি না, আমি নকশীকাঁথা বেড কভার
নীল কি সবুজ জানি না, আমি তোমার জন্যে আয়না আনতে
মাঝপথেই ভেঙে দিই, বলো আমার শাস্তি হল কেন
কেন আমার ঐ অন্য নীরবতা কেড়ে নিলে"

এইভাবে কবিতাটির শেষ হয়। কবি সচেতনভাবে ভাবছেন যে আমি অর্থাৎ আমরা তো সময়, তোমার মতো এত জটিল নই কুটিল নই যান্ত্রিক নই কৃত্রিম নই। তবে আমাদের উপর কেন এই যান্ত্রিকতা, কৃত্রিমতা চাপাও। আর কেড়ে নেও আমাদের সরল সহজ প্রাকৃতিক জীবন— নীরবতাও।

কবি বলছেন যে আমি আকাশের টেলিফোন নাম্বার জানি না, নকশীকাঁথা বেড কভারের রঙ জানি না তোমাকে দেখার জন্য প্রস্তুত হয়েও প্রস্তুত হতে পারি না— আয়না ভেঙে ফেলি। যদিও আমি জানি কোনও অপরাধ বা দোষ নেই এখানে আমার তবে এত শাস্তি কেন হয় আমার? এই প্রশ্ন কবি নিজেকে করছেন তার থেকে বেশি সময়কে। আধুনিকতার গ্রহণ এবং পুরাতন ধ্যানধারণাকে সংশোধন, কুসংস্কারকে বর্জনে যে নয়া জীবনের দ্বন্দ্ব টানাপোড়েন। সেই ছবিটা এখানে তুলে ধরেছেন কবি। আর তার মধ্যে মানুষের উপর আরোপিত, চাপিত জীবনের ফাঁক দিয়ে আমরা যে শান্তি,

আশ্রয়, অবস্থান সর্বপরি নীরবতা হারিয়েছি তার কথকতা হল এই কবিতা। কবি শান্তনু ঘোষ এই জীবনবন্দি বা বন্দিত্ব শুধু নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলেননি বরাক উপত্যকাকেও একেবারে ধূমড়ে মুচড়ে খুলে দেখিয়েছেন। এখানেই শান্তনুর সাথে এখানকার অন্যান্য কবির তফাৎ বা পার্থক্য।

আরেকটা জিনিস শুধু শান্তনু ঘোষের কবিতায় দেখা যায় যে তিনি অনেক জায়গায় অনেক রকমভাবে নিজেকে উপস্থিত করেছেন অর্থাৎ তুলে ধরেছেন নিজের অস্তিত্ব—কোথাও আমি বলে, নিজে বা নিজেকে বলে কোথাও নিজের নাম উল্লেখ করে। আমরা জানি কবিতার মধ্যে আমি তুমি বারবার থাকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনুষঙ্গে। কিন্তু শান্তনু ঘোষের কবিতার 'শান্তনু' 'আমি' ইত্যাদি অস্তিত্ব গভীর ব্যঞ্জনা সংকেত ধারণ করে বহন করে। এই জায়গায় কবি প্রত্যেক্ষভাবে কবিতার সময়ে মিশে গিয়ে সত্যকে প্রকাশ করেছেন। এই জীবনসত্য যতটা প্রাকৃত লোকায়ত তার চেয়ে ঢের বেশি নাগরিক কিন্তু। লৌকিক জীবনের হারিয়ে যাওয়া এবং নাগরিক জীবনের আগ্রাসন এই দুই রকম টানাপোড়েনে জীবনসত্যকে তুলে ধরেছেন কবি এই কবিতার শরীরে—ভেতরে।

হার্ট ক্রেনের ব্রীজের থেকে আত্মহত্যা

কবি শান্তনু ঘোষের কবিতা পড়লে বিষ্ণু দে-র অনেক কবিতার কথা মনে পড়ে। কবি নিজেও বিষ্ণু দে-র পরম ভক্ত ছিলেন অর্থাৎ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমিয় চক্রবর্তীকে বলেছিলেন 'ওর (বিষ্ণু দে-র) কবিতা বুঝিয়ে দিতে পারলে শিরোপা দেব।' এই সব কথার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'বিষ্ণু দে' নামক কবিতায়। বিষ্ণু দে যেভাবে আমি থেকে তুমি, তুমি থেকে আমি, আমরা থেকে তোমরা, তোমাদের থেকে আমাদের এই সার্কেলে কবিতার ভেতরে অনেকবার ঘুরেন। কবি শান্তনু ঘোষের কবিতায় সে জিনিসটা দেখা যায়। অনেকবার এরকম অনেক জায়গায় তার মেজাজ মেলে। তুলনা করছি না—তুলনা তো চলেই আসে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, অনুধাবন করার জন্য, হৃদয়ঙ্গম করার জন্য।

'হাট ক্রেনের ব্রীজের থেকে আত্মহত্যা' কবিতায় কবি জীবন ও মরে যাওয়ার একটা দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। কবি হেরল্ড হার্ট ক্রেন (১৮৯৯-১৯৩২) আমেরিকার আধুনিক কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম জনপ্রিয় একজন কবি। ১৯১৭ সালের সমসাময়িক সময়ে তাঁর মা ও বাবার মধ্যে বিরোধিতা, সন্দেহ, ঘৃণা ইত্যাদিতে দুজনের সম্পর্কের ফাটলে তাঁর মনে গভীর একটা আঘাত লাগে। এবং তাঁর বন্ধুর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নিজের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেন কৌশলে। এই সব আঘাত যন্ত্রণা জখম তাঁর মনে চিরকালই একটা বিস্ময়বোধ বিপন্নতা কাজ করেছে। তারপর ২৭ এপ্রিল ১৯৩২ সালের সকালবেলা তিনি মেক্সিকোর উপত্যকায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এবং তিনি সব সহযাত্রীকে শেষ কথা বলেছিলেন 'Goodbye Everybody'। এই রহস্যময় আত্মহত্যা কবি শান্তনু ঘোষকে প্রভাবিত করেছিল। তাই হার্টক্রেনের অস্তিত্ব সত্তা ইত্যাদির ভাবনা নিয়ে কবি ভাবছেন এবং তার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠেছে এক অন্যরকম অস্তিত্ব চেতনা। জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার নায়কের মতো কিন্তু কবি বুঝেছেন এবং আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—

> ''বুকের কাছে অনেকবার একইরকম প্রতিধ্বনি
> প্রতিশ্রুতি অনেকরকম দোকান খোলার
> এরই জন্যে অনেকরকম বিদ্যাশিক্ষা, চোখের নাচন, মুখের সেই দিব্যহাসি
> বুকের কাছে অনেকবার একইরকম প্রতিশ্রুতি
> পুলিশ দেখলে নীলচক্ষু, এগিয়ে গিয়ে
> হরেকরকম দোকান খোলার দিব্য প্রতিধ্বনি''

কবিতাটির শুরুতেই বলছেন বুকের ভেতরে অনেকবার একই রকম প্রতিধ্বনি অনেক রকম দোকান খোলার প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ জীবনের আহ্বান। নিজের অস্তিত্বকে ঠিকে রাখার চেষ্টা। এই জন্যই অনেক রকম বিদ্যাশিক্ষা, চোখের নাচন মানে জীবনের উপাদানের খোঁজ, মুখে আশা ব্যক্ত করা, মিষ্টি হাসি হেসে। বুকের মধ্যে অনেক প্রস্তুতি প্রতিশ্রুতি। পুলিশ দেখলে নীলচক্ষু তার অর্থ আমাদের সরকারের কিছু বাধা নিষেধ মেনে চলতে হয়। তাই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারি না। সরকারের কাছে আমরা বাধ্য তখন। তবুও সামনে এগিয়ে যেতে চাই জীবনের অন্বেষণে, অনেকরকম দোকান খোলার জন্য ভাবি প্রস্তুত হই। কিন্তু সময়ই আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে দেয় কি করব আমরা। তবুও মানুষ আশাবাদী জীব। সে কখনও হেরে যেতে চায় না। না হেরে সবার জন্যই সে অনেকরকম দোকান খুলতে চায়।

''নদী দেখলাম, এগিয়ে গিয়ে পয়সা ছুঁড়ি
নীচে দেখি জলের নাচে ব্রহ্মপুত্র জেগে উঠলো
প্রতিধ্বনি হরেকরকম, নীলশূন্যে বজ্রপাতের হঠাৎ মেলা
হার্টক্রেনের আত্মহত্যা''

নদী মানে সময়। কবি সময়কে গভীরভাবে দেখেছেন আর সামনে এগিয়ে গিয়ে পয়সা ফেলেছেন। এবং দেখেছেন জলের নাচে ব্রহ্মপুত্র জেগে উঠলো অনেকরকম প্রতিধ্বনি হয়ে। দোকান খোলার উদ্দেশ্যে একটু প্রস্তুতিতে কবি দেখেছেন পৃথিবী সময় কিভাবে ভিড় করে তার কাছে এসে—ব্রহ্মপুত্র নদীর মতো বিশাল আকার ধরে। কিন্তু হঠাৎ বজ্রপাত হল যেন তার হার্ট ক্রেন ব্রীজ থেকে লাফ দিয়ে নিজেকে হত্যা করে নিল। জীবন সংগ্রামে সে হেরে গেল নাকি। নাকি জীবনটা তার সহ্য হয়নি! এরকম অনেক প্রশ্ন জাগে। এত প্রস্তুতি এত প্রতিধ্বনি দোকান খোলার। তারপরও সে কেন আত্মহত্যা করল?

''কেন ব্রীজের থেকে হার্ট ক্রেনের আত্মহত্যা, প্রশ্নাতীত
প্রতিধ্বনি শূন্যে গিয়ে ডাকবাংলোর ইজিচেয়ারে
নারীর কোলে উলের পুতুল বসে থাকা''

কবি প্রশ্ন করেছেন যে এত প্রস্তুতি প্রতিশ্রুতি পরেও কেন হার্টক্রেন ব্রীজের থেকে পড়ে আত্মহত্যা করল। সকল প্রতিধ্বনি নিয়ে সে চলে গেল। আসলে জীবনের বিভিন্ন উপাদানকে সে সেভাবে সাজাতে পারেনি। জীবনকে আলোকিত করতে পারেনি তার প্রতিশ্রুতি প্রস্তুতি প্রতিধ্বনি। তাই নারীর কোলের নির্জীব উলের পুতুলের মতো এখন হয়ে গেছে হার্ট ক্রেন।

''এরকমই হয়, প্রতিধ্বনি হারিয়ে গেল
প্রতিশ্রুতির নীলনিশানা ব্রীজের থেকে লাফিয়ে পড়লে
এরকমই হয়,''

সীমানা বার হয়ে গেলে আর কিছু থাকে না, কোনও কিছুকেই ধরে রাখা যায় না। কবিও বলছেন হার্টক্রেন, সে নিজেকে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারেনি—জীবনের মুখোমুখি হয়ে। একটা জবাব দিচ্ছেন কবি হার্টক্রেনের আত্মহত্যার। তাই প্রতিধ্বনি হারিয়ে গেলে প্রতিশ্রুতি নীলনিশানা ব্রীজের উপর থেকে নিচে লাফ দিয়ে পড়ে গেলে এরকমই হয়। নিজের অস্তিত্ব ও সত্তাকে বাঁচানো কঠিন হয়ে ওঠে। সে জন্য হার্ট ক্রেনও নিজেকে আর বাঁচাতে পারে নি!

''হার্ট' ক্রেনের কথাই মনে পড়ে
মনে পড়ে, প্রতিধ্বনির অবিরাম দোকান খোলার প্রতিশ্রুতি
প্রতিশ্রুতি হরেকরকম দোকান খোলার দিব্য প্রতিধ্বনি।''

কিন্তু সময় শেষ হয়ে গেলে আর কিছুই করার থাকে না। শুধু মনে পড়ে মাঝে মাঝে সেই সব প্রতিধ্বনি প্রতিশ্রুতি

ও প্রস্তুতি। যা এক সময় জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—এক সময় জীবনকে অস্তিত্বকে আরও শেকড়শীল করার জন্য প্রয়াস। জীবনের জন্য এত দোকান খোলার আয়োজন। কিন্তু সত্তা ও অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর কিছুই থাকে না। শুধু মনে পড়ে তা মাঝে মাঝে।

কবি হার্টক্রেন পারেনি ব্রীজের উপর দিয়ে দুই পারের সাথে বিনিময় বা লেনদেন করতে। কোনো পারই তাকে বাঁচাতে পারে নি, যদিও এত সম্ভাবনা, প্রতিশ্রুতি, প্রতিধ্বনি ছিল—এত দোকান খোলার কথাও ছিল। এটা আধুনিকতার জটিলতার দ্বারা আক্রান্ত জীবনের এক করুণ গল্প। যান্ত্রিকতার মাঝে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি সে। সময়ের ঢেউয়ের সঙ্গে মিলে গিয়ে দোকান খুলতে পারে নি হার্টক্রেন। জীবনের সকল পরিকল্পনা বন্ধ করে দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

এই কবিতাটির নামের দিকে লক্ষ্য করার মতো। 'হার্ট ক্রেনের ব্রীজের থেকে আত্মহত্যা'। কিন্তু হার্টক্রেন তো ব্রীজ থেকে আত্মহত্যা করেনি—সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে করেছে। বরং নিজের শ্রেষ্ঠ রচনা 'The Bridge' (১৯৩০) এর মধ্য দিয়ে জীবনের ব্রিজ আরও সম্ভাবনায় পূর্ণ করেও আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন। তাই কবি দেখাচ্ছেন একদিকে জীবন অন্যদিকে মৃত্যু—মাঝখানে একটা সেতু যা Struggle for living । এই মাঝখানের ব্রীজ থেকে হার্টক্রেন জীবনের দিকে না গিয়ে মৃত্যুর পথ বেছে নিল। তাই কবিতাটির নাম এ রকম দিয়েছেন কবি। আর আরেকটা জিনিস যে পুরো কবিতাটিতেই কবি বারবার জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ প্রসঙ্গ টেনে দোকান খোলার কথা বলেছেন। অর্থাৎ এতসব বাঁচার সংগ্রাম সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও হার্টক্রেন হেরে গেল কেন জীবনের কাছে। এই সমস্যাটা আজকের পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের সমস্যা। হার্টক্রেনের মতো তারাও মরে যেতে চায়— কিন্তু কবি দোকান খোলার কথা বলেন অর্থাৎ 'Survival for the fittest'.

তপোধীর ভট্টাচার্য

> *''তপোধীর লেখেন রূপকথা, ভাঙনের গাথা, নৈর্ব্যক্তিক পুরাণে মিলিয়ে নানা কথা... এবং নৈঃশব্দ্য, যাবতীয় হওয়া না-হওয়া নিয়ে যত দ্বিরালাপ। তিনি সব কিছুর মধ্যেও ধরে রাখতে আগ্রহী এক পরম্পরার সংস্কৃতি। ঐতিহ্যের পাশাপাশি আমাদের তিনি এক জীবনবোধের গভীরে প্রবেশেরও অনায়াস সঙ্গী করে নেন। ..... সময় ও সমাজ তাঁর কবিতায় অন্য মাত্রা নিয়ে আসে। কথার ভাঁজে ভাঁজে কত গোপন নৈঃশব্দ্য, কত শূন্যতা। কবি আজীবন বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন নিজেই নিজের ক্রুশ।''*[৫৩]
>
> *(সূচনা—'বাচন আর নৈরশব্দ্যের যুগলবন্দি তপোধীর ভট্টাচার্য্যের কবিতা')*

কবি তপোধীর ভট্টাচার্যের কবিতা বিশ্লেষণ শুরু করার প্রাক্‌মুহূর্তে সমালোচক সমীর চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যটি স্মরণ করে নিতে পারি একবার। কারণ বড় কম কথায় অনেক কথা বলে দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশের মতে যা কবিতার 'সারবত্তা'। অর্থাৎ কবির কবিতার গভীরের কথা, মর্মকথা।

ঈশান বাংলার প্রথম সারির কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন কবি হলেন তপোধীর ভট্টাচার্য। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'তুমি সেই পীড়িত কুসুম (১৯৭৮), কবচকুন্ডল' (১৯৯২), 'আসন্ন শুশ্রূষার বার্তা' (১৯৯২), 'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৯৩), 'কিংবদন্তির ভোর' (১৯৯৭), 'কবিতা সংগ্রহ' (২০০৪) ইত্যাদি। এবং তার পরবর্তী 'স্বখাত সালিল কথা' (২০০৪) থেকে 'পীড়ায়' বৈরাগে' (২০১৩) হয়ে আজও অবিরাম কবিতা লিখে যাচ্ছেন তিনি।

আমরা নির্বাচিত কিছু কবিতা বিশ্লেষণ করে এগিয়ে যাব। কারণ এ রকম একজন কবির কবিতা চর্চায় আলাদা

একটা গবেষণা দাবি করে। তবেই কবির কবিতার অনেকটা দিক বার হয়ে আসবে। আমরাও চেষ্টা করব কবির এই কয়টা শ্রেষ্ঠ কবিতা দিয়ে পথ হেঁটে যেতে। যা কবির সৃষ্টির এবং সৃষ্টিপ্রতিভার সুগভীর পরিচয় বহন করবে নিশ্চয়।

সিসিফাস

সিসিফাসের মিথ্‌কে তিনি আরও একবার বিনির্মাণ করে জীবন সংগ্রামকে তুলে ধরলেন পাঠকের দরবারে। কবিতাটার শুরু এভাবে—

''সারাজীবন পাথর বইতে হবে
সারাজীবন পাথর ছিল ভারি
সারাজীবন চোখের উপত্যকায়
অশ্রু থেকে জাগতে থাকে পাথর''

যদিও গ্রীক মিথ্‌ সিসিফাসের অনুষঙ্গ নিয়ে এই কবিতাটির সৃষ্টি। তবে কিন্তু তার মূল কথা ইচ্ছে যে আজকের মানুষও তো সিসিফাস। সিসিফাস থেকে কোনও অংশেই কম নয়। কারণ আমরাও সারাজীবন পাথর বয়ে বয়ে কাটিয়ে দেই। সিসিফাস পাহাড় চূড়ায় পাথরটি গড়িয়ে গড়িয়ে তুলে। আর আমরা অন্য রকমভাবে। এটাই তফাৎ। এখানে যে উপত্যকার কথা বলা হচ্ছে সেটা সিসিফাসের পাহাড় নয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কথা ভেতরে আছে। তবে এখানে মূল উপত্যকা কিন্তু বরাক উপত্যকা। এখানকার চূড়ান্ত ভোতা, বৃত্তবন্দি রক্ষনশীল সমাজ ও চিরাচরিত ধারায় চলে আসা জীবনযাপনের পাথর বয়ে নেওয়ার কথাই বলা হচ্ছে।

''সারাজীবন গভীর স্বপ্নগুলি
গ্রন্থিভেদে উৎসাহ দেয় তাকে
সারাজীবন পাথর গড়ার পথে
দেবাংশী মেঘ মেঘের মত ঝরে''

এখানে সিসিফাসের ভেতরে স্বপ্ন জাগায়, উৎসাহ দেয় এই তো পাথর বহন শেষ হয়ে যাবে— এই তো— এই তো। তবুও সারাজীবন পাথর গড়ে পড়ে একটার পর আরও একটা। অস্তিত্ববাদী উপন্যাসিক আল্‌বেয়ার কামু তাঁর 'দ্যা মিথ্‌ অব্‌ সিসিফাস' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে সিসিফাস নিজের অস্তিত্বকে টিকে রাখতে কী গভীর পরিশ্রম করে আসছে যুগ যুগ ধরে— সারাজীবন পাথর বয়ে বয়ে। এখানেও ঠিক তাই বলছেন কবি। তবে মিথ্‌কে বিনির্মাণ করে এ উপত্যকার মানুষের পাথর বহনের সঙ্গে মিলিয়ে। যে এখানকার মানুষেরা কিভাবে বেচেঁ আছে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে।

''সারাজীবন পাথর বইতে হবে
সারাজীবন দহন ছিল জানা
ভস্মরাশি পাথর হয়ে নেমে
উপত্যকার পথ করেছে স্নান''

কিন্তু কবিতাটির শেষের অংশে এসে কবি দহনের কথা বলছেন। কারণ কবিও গভীরভাবে জানেন এ উপত্যকার মানুষেরা পাথর বয়ে বয়ে কী দহন নিয়ে বুকে কত কষ্ট নিয়ে বাঁচে। আর এই দহন থেকে ভস্মরাশি বার হয়ে পাথর হয়ে নেমে উপত্যকার পথগুলি ম্লান করেছে। অর্থাৎ বৃত্তবন্দি রক্ষণশীল সমাজের সময়ের সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। চারিদিক থেকে পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে বাঙালির উদ্বাস্তু হয়ে বিভিন্ন জায়গায় স্থান খোঁজা এবং লাঞ্ছিত হওয়া জীবনের খোঁজ ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হিংস্র মানুষের ভয়ে ইত্যাদি সব মিলিয়ে অসংখ্য বাঙালি আজও দহন হচ্ছে প্রতিদিন— বুকের ভেতরে রেখে সেই সব দহন। এখানে সিসিফাসের জীবন যেন তার সমার্থক। এই কবিতার ভেতর দিয়ে কবি আরও অনেক কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছেন কিন্তু। সিসিফাসের জীবন থেকে এ উপত্যকায় মানুষও

মুক্তি চায়—স্বাধীনতাও। কিন্তু কোথায় সে উপত্যকা?

স্তব ঃ কোলাজ

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তুমি সেই পীড়িত কুসুম' (১৯৭৮)। এখানে তাঁর যৌবনের ব্যথা বিষাদ যন্ত্রণা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কারণ ওই সময়টাও তো অন্যরকম থাকে। সেই মেজাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি কবিতা হল 'স্তব ঃ কোলাজ'। এই কবিতাটি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রথম শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি শার্ল বোদলেয়ারের 'লেস ফ্লুর দ্যু-মাল' (১৮৫৭) (ক্লেদজ কুসুমের কথা) মনে পড়ে। পড়াটাও স্বাভাবিক কারণ আজ বিশ্বের প্রতিটা মানুষই বিশ্বের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে জুড়ে আছে ওৎপ্রতভাবে।

কিন্তু কবির এই কবিতাটি আলাদা মনোযোগ দাবি করে। কারণ বরাক উপত্যকার মতো একটা সংকীর্ণ জায়গায় এই 'পীড়িত কুসুমের' জন্ম। কবিতাটি শুরু এভাবে—

''তুমি সেই পীড়িত কুসুম
মেধার গভীরে আনো অব্যক্ত সন্ন্যাস
রহস্যের অনুষঙ্গ নিয়ে
শান্ত উদাসীন অমোঘ নীলিমা, এসো
মুগ্ধ সমতলে''

কে সেই পীড়িত কুসুম? কি রকম তার রূপ? এবং কিভাবে সে পীড়িত? আর কিভাবে সে বেঁচে আছে? এরকম অনেক প্রশ্ন জাগে কবিতাটি পাঠে।

যৌবনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে প্রেম, রোমান্টিকতা, বিষাদ বোধ, টেনশন ইত্যাদি প্রধান। এই কবিতাটি রচনার সময়ে কবির মেজাজ সেই সব বৈশিষ্ট্য দ্বারা লালিত ছিল। তাই কোনও কারণ ছাড়াও শূন্যতাবোধ কষ্টবোধ কখনও কখনও বুকটাকে ভারি করে তুলে। এবং তার সঙ্গে জীবনের না-পাওয়ার মাত্রা যোগ হয়ে এই রকম কিছু কবিতার জন্ম দেয়। তাই বলতে হয় এই পীড়িত কুসুম 'যৌবনের পীড়া' ছাড়াও আরও অনেক কিছু । তার রূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এভাবে সে বেঁচে থাকে মানুষ এবং মানুষের গভীরে। সে পীড়িত জীবনের হাতে, নিয়তির হাতে, সময়ের হাতে, সমাজের হাতে, পরিবেশের হাতে, ধর্ম নামক যাতাকলের হাতে। বন্দিত্ব, দাসত্ব, অন্ধকারত্ব, পরাধীনতাকে সে ভেঙে চুরমার করে মুক্ত আকাশে ওড়তে চায়। কিন্তু ঐসব হাতের নাটাইয়ে অদৃশ্যভাবে সে বৃত্তবন্দি হয়ে যায়। কবিতাটির মূল সুর এটাই। এই জিনিসটাই দেখানো হয়েছে এখানে।

''চোখের গভীরে তুমি শুষে নাও
মনোবীজরাশি
বিদায়ের স্তব শুনে-শুনে প্রতিমা
পাথর হলে যদি
ভাস্কর-লাবণ্য থেকে তবু গাঢ় বিহ্বলতা
কেন ফুটে ওঠে?''

সময় যখন মানুষের জীবনের বিপরীত হয়ে যায় তখন জীবনযুদ্ধটা অন্যরকম হয়। চোখের গভীরের শক্তিও ঠিক যতটুকু কাজ করার ততটুকু করে না। বলতে বাধ্য, সময় করতে দেয় না। মৃত্যুকালীন গান শুনে শুনে আমরা কসাইয়ের মতো পাথর হয়ে গেছি। মানুষের মনে মানুষের প্রতি আজ কোনও করুণা নেই কোনও সহানুভূতিও— বরং বিদ্বেষ, হিংসা, ষড়যন্ত্র, হত্যা, খুন ইত্যাদিতে পূর্ণ আজ মানুষের প্রতিটাদিন। আমরা পাথর হয়ে গেছি আজ কবি বলছেন তবুও এই

ভাস্কর লাবণ্য থেকে গাঢ় বিহ্বলতা ফুটে ওঠে কেন? কারণ আমরা মানুষ তাই এই বিহ্বলতা জাগে ওঠে এই পাথর হওয়া শরীর থেকে। আসলে কবি বিশ্বাস করেণ 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'।

কিন্তু কবি তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর সব ক'টি কাব্যগ্রন্থে সমকালকে গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলে ধরতে পেরেছেন। যান্ত্রিক কৃত্রিম জীবনের ধারক ও বাহক হতে হতে আমরা আজ পাথর হয়ে গেছি। এই পাথর হওয়া বা হয়ে যাওয়াটাকে তিনি সুন্দর করে তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর 'পীড়িত কুসুম' সেই সব নেতিবাচক ও মুখোশ পরা জীবনের সকল কৌণিকতার ভাঁজ খোলে খোলে দেখায় চোখের সামনে তুলে ধরে। কবি বলছেন তাই

''তুমি সেই পীড়িত কুসুম
মাঝে মাঝে আলো দাও ইচ্ছে হলে
একনিষ্ঠ ছায়া''

মানুষ আজ প্রয়োজন লাভ স্বার্থ ছাড়া মানুষের দিকে হাত বাড়ায় না বাড়ায় না তার পা-ও। কিন্তু নিজস্ব ক্রিয়াকলাপেই মানুষ পথ চলে। এই ক্রিয়া অনুযায়ীই জীবনে সে ফল ফসল পেয়ে থাকে। 'পীড়িত কুসুম' মাঝে মাঝে আমাদেরকে আলো দেয়, কখনও ছায়া। অর্থাৎ সময় যখন মানুষের জীবনের হিতে হয় বা অনুকূল হয় তখন সে অপ্রত্যাসিত অনেক কিছুও জীবন থেকে পেয়ে যায়।

তারপর 'পীড়িত কুসুম' গেয়ে যায় বিশ্বের মানুষের হাহাকার আর অস্থিরতার গান। শুধু সমকালকে ধরেননি কবিতায় সমকালিন বিশ্বের সমকালকেও ধরেন তিনি তার প্রতিভাশক্তিতে। এখানে তিনি স্বার্থক ও উজ্জ্বল— পীড়িত কুসুমও।

''আমার সমস্ত ভেঙে দীর্ঘ হতে চাও
নাও যশ, নাও জয়, নাও ঋদ্ধি, নাও''

এভাবে কবিতাটির শেষ। নিজেকে ভেঙে গড়ে আরও পরিণত করতে চান বিনির্মাণের মাধ্যমে। সেই 'পীড়িত কুসুম'-কে সব কিছু দিয়ে জীবনের মুখোমুখি হয়েছেন শেষে। কারণ কবিও এলিয়টের মতো বিশ্বাস করেণ যে প্রতিটা শেষই এক শুভ আরম্ভের সূচনা করে। যা আরও এক নয়া সম্ভাবনার কথা বলে।

ক্ষুধার বিশ্বরূপ

জীবনানন্দ দাশ 'পৃথিবীলোক' কবিতায় বলেছিলেন—

''দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙছে;
গ্রাম পতনের শব্দ হয়;''[৫৪]

এই জিনিসটাই একটু অন্যরকম অন্যভাবে এবং আরও অন্যদিক নিয়েও প্রসারিত হয়েছে কবি তপোধীর ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধার বিশ্বরূপ' নামক কবিতায়। কবি ১৯৬১ দেখেছেন, ১৯৭১ দেখেছেন, দেখেছেন ১৯৮৩ আরও বিভিন্ন ভাঙাগড়া, উত্থান পতন, ভিটেমাটি ত্যাগ করা গ্রহণ করা ইত্যাদি। আর সেই সবের রসদ দিয়ে গড়েছেন এই কবিতাটি। কবি বলছেন—

''শীতের উনোন ছুঁয়ে বসে আছে ভিখিরির শিশু
আগুনে পুড়ছে
কুটো-কাঁটা, ঘুঁটের সমিধ
একান্নবর্তী ভাঙা হাঁড়িতে ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে
ওর বাক্যপথাতীত ব্রহ্ম''

অন্নের অভাবে ভিখিরির শিশু ক্ষুধার্ত। উনোন ছুঁয়ে বসে অপেক্ষা করে কোন সময় ভাত হবে। কিন্তু ভিখারির মতো

মানুষের শিশুর কি ক্ষুধা মেটে কোনদিন। চারদিকে ক্ষুধা কেবলই। এবং সময় ক্রমে ভেঙে দিচ্ছে সকল একান্নবর্তী হাঁড়ি। অর্থাৎ অসহায় নিপীড়িত মানুষের দুঃখ দুর্দশা ওই ভাঙা হাঁড়ির মতো। যা আর কখনও কোনদিন জোড়া লাগে না জীবনে। কিন্তু এই প্রাকৃত জীবনের যন্ত্রণা কজন বুঝে বা বুঝতে চায়। কাজ নেই, কাজের পথ নেই, নেই কোনও কাজের উপায়ও। সেই কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে শ্রমজীবী মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকে— বেঁচে রাখে তার অস্তিত্ব এই মেজাজটা এখানে পাই।

''এই দৃশ্যে চমৎকৃতি নেই, শীতের উনোন
ভিখিরির অন্ন, আর
নির্বিকল্প তাপ— এতে কোনো
মনোহর চিত্রকল্প নেই''

অসহায় মানুষের জীবনের এই দুঃখ দুর্দশার দৃশ্যে কোনও চমৎকৃতি নেই। তারা এ রকমই জীবনকে লালন করে, যাপন করে। তারা দিন আনে দিন খায়— রোজ আনে রোজ খায়। এখানে বিকল্প কোনও কিছু নেই। এখানে জীবনের কোনও মনোহর দৃশ্য নেই। আসলে কবি সেই সব জীবনকে এবং জীবনের ধারণ শৈলীকে একেবারে খোলে দেখাতে চাইলেন। তা না হলে এইসব জীবনকে অনুভব উপলব্ধি অনুধাবন করা যাবে না।

একটা কথা মনে রাখা উচিত যে এইসব জীবন কিন্তু প্রাকৃত, একেবারে যান্ত্রিকতাহীন কৃত্রিমতাহীন। কারণ তাদের সময় নেই বিলাসীতার মনোরঞ্জনের—সামর্থও। সহজ সরল জীবনের গাথা রচনা করতে খুব ভালবাসেন। সে জন্য তাঁর শব্দ প্রয়োগ, শব্দ সংযোজন ইত্যাদি এই কথার গভীর প্রমাণ দেয়।

''গোল হয়ে বসে আছে ভিখিরির শিশু ও বনিতা
ক্ষুধার বিশ্বরূপ
ফুটে উঠছে জটিল সুন্দর এই শীতের উনোনে''

প্রাকৃত জীবনের রূপ ফুটে তুলেছেন এখানে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিকতা দিয়ে। এই লোকজীবনের বোধটা কবির অর্জিত অভিজ্ঞতা। বরাক উপত্যকা থেকে শুরু করে বিশ্বের অসংখ্য দেশের ঐ শ্রেণীর মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। সেই জীবনের জ্বলন্ত রূপ তুলে ধরেছেন এখানে।

অনেক সমালোচক কবি তপোধারের এই জিনিসটা এড়িয়ে যান। আরেকটা জিনিস কবির অসংখ্য কবিতায় আগুন, ছাই, আকাশ, সূর্য, বোধ, মেধা, গান, শব্দ, ইত্যাদি শব্দের বহুমাত্রিক প্রয়োগ। এখান থেকে একটা জিনিস বার হয়ে আসে যে কবিও জীবনকে জীবনসংগ্রামের আগুনে পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ সোনার মতো গ্রহণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কারণ কবি বড় ভালো করে জানেন আজকের পৃথিবীতে সবকিছু অন্ধকারে ঢাকা আগুনে পুড়ে পুড়ে পরীক্ষা না করে কিছু গ্রহণ করা যায় না আর নির্দ্বিধায়। তাই ভিখিরির ঘরেও তিনিও ক্ষুধার বিশ্বরূপটা তুলে ধরেছেন। শীতের উনোনে কি জটিল সুন্দর সত্য বার হয়ে আসে ভিখিরির ঘর থেকে তা-ও তিনি সুন্দর করে ফুটে তুলেছেন। আসলে কবি জীবনচেতনাবাদী। তাই সব দুঃখ কষ্ট পার হয়ে গিয়েও মানুষের জীবনবন্দনা গেয়ে যেতে চান। এখানেও তার ব্যতিক্রম না কিন্তু। অন্যদিকে পাই একান্নবর্তী পরিবার ক্রমে ভেঙে যাচ্ছে। সময়ের যাত্রাকলের আঘাতে। এখানে জন্ম দিচ্ছে অসংখ্য অদৃশ্য দেয়াল। মানুষ নিজেই ভাবতে পাচ্ছে না তার ঘর ভাঙছে এবং তার মাঝখানে দেয়াল গড়ে ওঠছে এবং ক্রমে তারা একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

ষোল লাইনের এই কবিতায় বারবার (চারবার) ভিখিরির অনুষঙ্গ এসেছে। তবে এই অনুষঙ্গটা ভিখিরির কথা নয়। এটা অসহায় নিপীড়িত সর্বহারা মানুষের জীবন দুর্দশার কথাই বলা হয়েছে এই ভিখিরি নামক চিহ্নের আড়ালে। কবিতাটির সমাপ্তি এভাবে—

''আগুনের আঁচে হেসে উঠছে

ভিখিরির শিশু
কেননা তক্ষুনি
হাঁড়ির গভীরে ঈশ্বর সুসিদ্ধ হয়েছেন।”

আহারের শিশু কি বুঝে! হাঁড়ির ভেতরেই তো তাদের ঈশ্বর। ক্ষুধার এই বিশ্বরূপ তো বাংলার চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কোথাও রিক্সাওয়ালার ঘরে, কোথাও মেছোর ঘরে, কোথাও ফসলহীন বন্যার জলে ডুবে যাওয়া চাষীর ঘরে, কোথাও কোথাও দিন মজুরের ঘরে, কোথাও আরও অন্য কোথাও অন্যভাবে, আরও অন্য কোথাও অন্য কোনও রকমভাবে। সেই সব জীবনের জ্বলন্ত রূপ প্রকাশিত হয়েছে এই কবিতায়।

ডেটইলাইন আসাম ১৯৮৩

কবি তপোধীর ভট্টাচার্যের সকল কবিতার মধ্যে দশটি কবিতা যদি নির্বাচন করা হয় তবে আমার গভীর বিশ্বাস তার মধ্যে ‘ডেটলাইন আসাম ১৯৮৩’ কবিতাটি থাকবে। কারণ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এবং সৃষ্টিশীল সত্তার অনেক গভীর পরিচয় বহন করে এই কবিতাটি। যেখানে কবির পারিপার্শ্বিক, সমাজ, সময়, জীবনচেতনা, জীবনবোধ একাকার হয়ে গিয়েছে। ১৯৮৩ সালের মর্মান্তিক ঘটনায় তিনি মর্মান্তিকভাবে আহত হয়ে নিজের অস্তিত্ব খুঁজতে চেয়েছেন এই কবিতায়। ব্যক্তিত্ব সংকট, অস্তিত্বসংকট এবং সামাজিক সংকটের গোলক ধাঁধায় নিজেকে খুঁজছেন। এখানে ১৯৬১-র ১৯ মে-র কথা, ১৯৬০-এর জুলাই মাসের কুখ্যাত ‘বঙ্গাল খেদা’ ষড়যন্ত্রের কথা। এবং এই জিনিসটা আবারও একবার ঘটল পুনরায় ১৯৮৩ সালের নেলী গুহপুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের রূপ ধরে। তখন তিনি উচ্চারণ করলেন নিজের অস্তিত্বের খুঁজে—

“আমার নিজের কুশপুত্তলিকা আমি আজ
নিজেই পোড়াব
আমি নিরুপায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব
ফসলের মাঠ ঢেকে গেছে
রক্তের কলঙ্করেখায়, রমজানের অকলঙ্ক চাঁদ
গলে পুড়ে গেছে পিসাচ সন্ত্রাসে
আদিগন্ত বধ্যভূমি জুড়ে আর নেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার
শান্ত আয়োজন”

এখানে অস্তিত্বচেতনার এক গভীর বার্তা বহন করে। নিজেকে খোঁজার কথা বলে। তাই কবি নিজের কুশপুত্তলিকা জ্বালাতে চান নিজে। এবং দেখতে চান যে তিনি কতটা আজ বেঁচে আছেন। কবি নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছেন কিন্তু কিছু করতে পাচ্ছেন না। ফসলের মাঠ আজ ঢেকে গেছে মানুষের রক্তের কলঙ্কে। আর রমজানের চাঁদ, ত্যাগের চাঁদ পুড়ে যাচ্ছে মানুষের সন্ত্রাসে। এখানে নেই ভ্রাতৃত্ববোধের আয়োজন। মানুষের মাঝে শুধু দূরত্ব বাড়ছে ক্রমে—বিষও।

এই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ নিজস্ব কৃতকর্ম ক্রিয়াকলাপের ফলভোগ ছাড়া আর কিছুই পায় না। পেতেও পারে না অন্য কোনও ফল কিংবা ফসল। এরপর বলছেন তিনি—

“যমদুয়ারে দিতে কাঁটা
বোন দিয়েছে ভাইকে ফোঁটা
মর্তে নরক স্বর্গেও জহ্লাদ
ভায়েরা তাই গিয়েছে যম-দুয়ার”

নেলী গোহপুরের নির্মম হত্যাকাণ্ড বাঙালির অস্তিত্বের কথা স্মরণ করাতে বাধ্য। কেননা এই চক্রান্তের ফলে আরও

একবার স্পষ্ট হয়ে ওঠল আসামের বাঙালির অস্তিত্বের সংকট। আর এই সংকটকে প্রতিমুহূর্তে মনে রেখে এখানকার বাঙালিরা বেঁচে আছে নিজস্ব অস্তিত্ব নিয়ে কী ভয়ংকর সংগ্রাম করে! যমদুয়ারে কাঁটা দিতে এখানকার বোনেরা ভাইকে ফোঁটা দিয়েছে কপালে। স্বর্গ বলো মর্ত বলো সব জায়গায় আধিপত্যবাদীর শাসন শোষণ। কোথায় যাব আমরা? কোথায় গিয়ে খুঁজব নিজস্বতা? নিজের পরিচয়ই বা কী দেব? অন্যের পরিচয়ই যেখানে নিজের পরিচয়? এই পরিচয়, নিজস্বতা খুঁজতে ভাইয়েরা যমদুয়ারে গিয়েছে। এটা সংকেতপূর্ণ জীবন কথা— দার্শনিক অভিব্যক্তিও।

''আমি নির্বিকার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব
আমাদের ধর্ষিত শরীর শুয়ে আছে বসুধানিবিড় হয়ে
দেখব, শিশু ও মায়ের হিম আলিঙ্গন মৃত্যুতেও
কত অশিথিল!
দেখব, শিশুর কবন্ধ রক্তপায়ী শকুনের ঠোঁটে
ভায়েরা দ্যাখো গিয়েছে যমদুয়ারে''

আবারও বলছেন নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে দেখবেন আমরা আমাদের ধর্ষিত শরীর নিয়ে মাটির মতো শুয়ে আছি নিজস্ব জায়গায়। শিশু ও মায়ের চেতনাহীন আলিঙ্গন মৃত্যুকেও অশিথিল অর্থাৎ আবেগহীন করে দেয়। এই মৃত শিশুও শকুনের খাদ্য হয়ে যায়। মরেও তারা রক্ষা পায় না। মূলকথা আমরা আজ নিজস্বতা হারিয়ে নিয়েছি। উদ্ভ্রান্ত হয়ে অন্যকোন জীবন গ্রহণ করে অন্যরকম হয়ে গেছি। আর সে জন্যই কবি দাঁড়িয়ে দেখতে চান আমাদের এই বীভৎস ভয়ানক ছবি। তিনি জানেন নিজেকে পুড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

তারপরে তাঁর ভেতরের ক্ষোভ গভীরভাবে প্রকাশ করেছেন এভাবে—

''ধমনীতে রক্ত নেই জীবনে আবেগ নেই ক্রোধে কেন্দ্র নেই
কেবল বিষ
রক্তে তাপ নেই আবেগ স্বপ্ন নেই কেন্দ্রে আলো নেই
কেবল বিষ''

ভেতরের যন্ত্রণাকে এভাবে তুলে ধরেছেন। সত্যিই তো আমাদের ধমনীতে আজ রক্ত নেই সব জল হয়ে গেছে, জীবনে আবেগ নেই সব পাথর হয়ে গেছে, ক্রোধের কোনও কেন্দ্র নেই, বিদ্বেষ বিতৃষ্ণায় প্রতিহিংসায় তা রূপ লাভ করেছে। রক্তে আজ কোনও গরম উষ্ণতা নেই, রক্ত চিরতরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কোনও আবেগ আর স্বপ্ন নেই, এখানে আজ অন্যকিছু, কেন্দ্রে কোনও আলো নেই কেবল অন্ধকার। আর এই সবকিছুর গভীরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ—বিষ ছাড়া কিছুই না।

''যম-দুয়ারে দিতে কাঁটা
বোন দিয়েছে ভাইকে ফোঁটা
ভোরের আজানে জাগবে না সে-ভাই জাগবে না
আর কোনোদিন
কোজাগরি রাতে জাগবে না সে-ভাই জাগবে না
আর কোনোদিন''

অসমিয়া জাতির/ভাষার আগ্রাসন সন্ত্রাস থেকে বাঁচানোর জন্য এখানকার বাঙালি বোন ভাইদেরকে কপালে ভাইফোঁটা দিয়েছে। এই তিলকফোঁটা হল নিজস্ব মাতৃভাষায় অমৃতবোধ। তবুও যে সব ভাইয়েরা শহিদ হয়েছিল তারা যদিও ভোরের আজানে জাগবে না কোজাগরি রাতে বোনেরা নিহত ভাইদের জন্য জাগবে না কোনদিন। তবে তারা তাদের এই প্রচেষ্টা দ্বারা পথ করে দিয়ে গেছে। উত্তরসূরি যাতে এই পথে কাঁটাহীন পথ হিসেবে হাঁটতে পারে। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর ঘটনার গভীরে একটা গভীর অনুপ্রেরণা লুকিয়ে আছে নিজের মাতৃভাষাকে সুরক্ষা করার জন্য। এবং এই সুরক্ষা

তার সমস্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য, গাম্ভীর্য সহকারে। নিজের অস্তিত্বচেতনার সংকেত পাই। এই সংকেত ভাষার সংস্কৃতায়ন, প্রাকৃতায়ন, উত্তরায়ন ইত্যাদির প্রগতি। তাই কবি আমাদের সীমানার সংকীর্ণতা খুলে দেখাচ্ছেন। যাতে আমরা এই সীমানা অসীম করতে পারি।

আমাদের জীবনের যান্ত্রিকতা কৃত্রিমতা ইত্যাদি আমাদের জীবনকে যন্ত্র করে নিয়েছে। দিয়েছে তাই আমরা এরকম লাঞ্ছিত বঞ্চিত পীড়িত। আমরা আজ কি রকমভাবে বেঁচে আছি তার একটা ছবি এখানে ফুটে তুলেছেন। কবিতাটির সমাপ্তি টেনেছেন এভাবে—

''আমি নিরুপায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব
গৃধ্র শকুণির চকিত ভ্রমণ, আর
আমাদের অন্ধ বধিরতা
আমার নির্লজ্জ কুশপুত্তলিকা আমি আজ
নিজেই পোড়াব''

শেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন খুব। সেটা হল আসামের 'বঙাল খেদা' এই নির্মম অত্যাচারের কথা। অসমিয়া শকুনিরা খোলাখুলিভাবে অত্যাচার করছে আর আমরা বধির হয়ে কিছুই শুনতে পাই না—অন্ধ হয়ে কিছুই দেখতে পাই না। তাই কবি আবারও বলছেন যে নিজের কুশপুত্তলিকা নিজে পুড়াবেন। এইভাবে তিনি প্রতিবাদ করছেন নিজের মতো করে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্বচেতনা ফুটে ওঠছে গভীরভাবে। যা এই কবিতার সবচেয়ে মূল কথা—মর্মকথা।

ও আমার গভীর মুখর অন্ধকার, তোমাকে প্রণাম

কবি তপোধীর ভট্টাচার্যের 'কবিতা সংগ্রহ' (১) প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। এই কবিতা সংকলনে ৬৪ পৃষ্ঠার একটা নামহীন কবিতা আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। এই নাড়া বা আলোড়ন কিন্তু কবিতাটির অন্তর্লোকই আমাকে দিয়েছে। আমরা এই কবিতাটিকে প্রথম লাইন 'ও আমার গভীর মুখর অন্ধকার, তোমাকে প্রণাম' এই নামেই আলোচনা করব। 'কবচ কুন্ডল' কাব্যগ্রন্থের শুরুতে এই কবিতা রেখেছেন, সূচনা হিসেবে মনে হয়। কবিতাটির শুরু এভাবে—

''ও আমার গভীর মুখর অন্ধকার, তোমাকে প্রণাম
এই তীব্র হনন-ঋতুর নিবিড় কুহক নিঙড়ে নিতে দাও
নিয়ে এসো বিবাহ-গোধূলি, নিয়ে এসো স্মৃতি আপৎকালীন
নিয়ে এসো পরিব্রাজকের দিনলিপি, নিয়ে এসো মর্ম-ছেঁড়া আলো
যেন শূন্যের বন্দনা থেকে জেগে উঠি রোজ, নিশি-শেষে
গাঢ় ধ্যান ও উল্লাসে ভেঙে দিয়ে দীর্ঘ শীতঘুম, কূট পরম্পরা
হন্তারক ছায়ায় নীল পৌত্তলিক দিন, এই জীবনযাপন
আমাকে পোড়ায়, মুছে দেয় সমস্ত অলীক স্বপ্ন, ভেঙে দেয়
সব প্রতিরোধ...''

কবি জীবনানন্দ দাশের 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতাটির অন্ধকার না কিন্তু এখানে। এখানে আরও অন্যরকম অন্ধকার। কবি জানেন চারদিকে অন্ধকার ছড়াচ্ছে। ছড়াচ্ছে 'অদ্ভুত আঁধার এক'। যেখানে মানুষ বাঁচতে পাচ্ছে না মানুষ হয়ে। এই অভিজ্ঞতা কবির জীবনের অনেক দিনের পথহাঁটায় অর্জিত অভিজ্ঞতা। পৃথিবীকে ভালোভাবে তিনিও দেখেছেন। তাই তিনি এই অন্ধকারের থেকে উৎসারিত আলোর গান গেয়ে যেতে চান এই কবিতায়।

অন্ধকারকে প্রণাম জানিয়ে তার থেকে 'নিবিড় কুহক' নিঙড়ে নিতে চান জীবনচেতনার জন্য। এখানে তিনি এই

অন্ধকারকে চিরে নিয়ে আনতে চান বিবাহ গোধূলি, আপৎকালীন স্মৃতি, পরিব্রাজকের দিনলিপি, মর্ম-ছেঁড়া আলো—জীবনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। এই চেতনার গভীরে অস্তিত্বচেতনা গভীরভাবে মিশে আছে। এবং শূন্যের বন্দনা থেকে নিজেকে গান করিয়ে জেগে ওঠাতে চান। এই গান কিন্তু জীবনবন্দনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। শীতের দীর্ঘ রাতের ঘুম ভেঙে দিতে চান। যে অলস ঘুম কোনও উপকার করে না—বরং অপকারী। যে পরম্পরায় তিনি বেঁচে আছেন তা হল 'হন্তারক ছায়ায় নীল পৌত্তলিক দিন'। এইসব ভেঙে চুরমার করে দিয়ে এক নয়া জীবনবোধের কথা, জীবনচেতনার কথা ভাবছেন। কিন্তু এই ভোতা রক্ষণশীল বৃত্তবন্দি জীবন কবিকে রোজ রোজ পোড়ায়। মুছে দেয় কবির সকল অলীক স্বপ্ন। এবং ভেঙে দেয় কবির সকল প্রতিবাদ কৈফিয়ৎ প্রতিরোধ ফরিয়াদ।

আসলে কবি চান এক সম্ভাবনাময় জীবন। যেখানে স্বপ্ন কল্পনা আকাশ অর্থাৎ মুক্ত ও স্বাধীন এক জীবন। যেখানে কোনও বন্ধন নেই অন্ধকার নেই। অর্থাৎ মানুষ যেখানে পরিপূর্ণ হয়ে বাঁচতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয় বা শেষ স্তবকে কবি শুনান অন্যরকম এক বার্তা। যা একান্ত বাস্তব, অনস্বীকার্য। আমাদের আজকের সম্ভাবনা কিরকম! কবি বলছেন—

> ''তবু খুঁজি উত্তরাধিকার, কাকে দিয়ে যাই বলো এই ভ্রমণ পিপাসা
> কাকে বলি জল নেই শিকড়ে আমার, শুধু দাহ কোষে-কোষে
> স্নায়ুতে স্নায়ুতে, খুঁজতে খুঁজতে চলো ফিরে যাই স্রোতের উজানে
> ও আমার ঘভীর মুখর অন্ধকার, তোমাকে প্রণাম''

প্রথম স্তবকের মধ্যে সম্ভাবনাহীনতার পরও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো কবিও বিশ্বাস করেন 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ'। তাই অন্ধকারকে তিনি প্রণাম করেও আলোর খোঁজ করছেন। বিশ্বাস করছেন মানুষকে। কিন্তু না পেয়ে সম্ভাবনা ও অন্ধকারের প্রতাপ দেখে বলছেন যে কাকে দিয়ে যাবেন কবির উত্তরাধিকার এবং 'ভ্রমণ পিপাসা'। ভ্রমণপিপাসা মানে কিন্তু জীবনের পথে পথহাঁটা—জীবনবন্দনা।

কিন্তু বিকলাঙ্গ পারিপার্শ্বের মধ্যে শুকিয়ে যাওয়া জীবনবৃক্ষের শেকড় কাকে দেখাবেন। যেখানে জল নেই মাটিতে। সব কিছু শুকিয়ে গেছে এবং দহন হচ্ছে কোষে কোষে স্নায়ুতে। চারদিকে খরা, নয়া শুদ্ধ গাছের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। তাই ফিরে যেতে চান 'স্রোতের উজানে'। গভীর মুখর অন্ধকারকে নিয়ে তিনি উজানে যেতে চান আলোর সন্ধানে। যে আলোতে জীবনকে দেখা যাবে পরিষ্কার করে।

কবিতাটির প্রথম ও শেষ লাইনের মধ্যে এক গভীর সম্ভাবনা আছে। যে সম্ভাবনাকে তিনি অন্যরকমভাবে ফুটে তুলেছেন। এই ফুটে ওঠা কিন্তু সমস্ত রুদ্ধতা, বন্দিত্ব, দাসত্ব, অন্ধকার ইত্যাদিকে পেছনে ফেলে দিয়ে এক নয়া শুদ্ধ পবিত্র জীবনের গান শুনায়।

কবচ কুণ্ডল

'কবচ কুন্ডল' (১৯৯২) কাব্যগ্রন্থের প্রায় সকল কবিতায় কবি নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে একটা কিছু চান তার থেকে। তার মানে নিজেকে দধীচির মতো ব্যবহার করছেন কবিতাগুলিতে। এবং এই কবিতা অস্ত্র দিয়ে এক সম্ভাবনার জন্ম দিয়ে যেতে চান। এই বোধ কিন্তু জীবনকে নতুন করে আবিষ্কার করার কথা বলে। জীবনের ক্লেদাক্ততাকে ধুয়ে দিয়ে পরিষ্কার করার দিকে ইঙ্গিত দেয়। এই রকম বোধের একটা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল নাম কবিতাটি।

আট লাইনের এই ছোট্ট কবিতাটিতে কবির গভীর জীবনদর্শন ফুটে ওঠেছে। আজকের পৃথিবীতে আমরা মানুষ কিভাবে বেঁচে আছি মরে মরে—অর্ধেক মরে। কোথাও তো একেবারে মৃত হয়ে গেছি। সেখানে দাঁড়িয়ে কবি নিজেকে

ভেঙে চুরে টুকরো টুকরো করে জোড়া দিচ্ছেন। দেখছেন তিনি কোথায় কিভাবে কতটুকু বেঁচে আছেন এই পৃথিবীতে—

" কাকে দিই, কীভাবে বা দিই
নিজেকে ভেঙে-চুরে
টুকরো করে আনি ফের জড়ো করে
বলি, এই পূর্ণ এই তো সমস্ত!"

কবি তপোধীর ভট্টাচার্যের এই অস্তিত্ব ও আত্মসন্ধান কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে একটা বড় জায়গা অধিকার করে আছে। যে কবি আত্মসমালোচনা করতে পারেন তিনি মানবজীবনের অনেক জটিলতাকে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেন। অনেক কবি কিন্তু তা পারেন না। আত্মসমালোচনাও কিন্তু আধুনিক থেকে উত্তর আধুনিক কবিতার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আত্মসমালোচনা বড় প্রয়োজন। তা ছাড়া নিজের রূপ সম্পূর্ণভাবে নিজের সামনে আসে না। সে কথার দিকে কবি ইঙ্গিত করছেন। এখানে সেই ভেঙে গড়ে যে মূর্তি নির্মিত হয় তা দিতে চাইছেন তার পরবর্তী প্রজন্মকে। অর্থাৎ নিজের জীবনের সকল ভুলভ্রান্তি এই সবকেও তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। উত্তরাধিকার যেন নিজেকে নিজের জীবনকে শুধরে সংশোধন করে নিতে পারে। যেন তারা সেখান থেকে সমিধ নিয়ে নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। কবি বলছেন—

"ভাঙা টুকরো থেকে এই যে বারবার নিজের
প্রতিমা গড়ি
তাকে তুমি নেবে কী কখনো?
নাও, এই তো কবচ এই যে কুন্ডল!"

আবার মনে মনে কি প্রকাশ্যে ভয় করছেন! ভরসা করতে পাচ্ছেন না। এইসব নেওয়ার মানুষের ওপর। কবি দেখেছেন জীবনের জটিলতা যান্ত্রিকতা এবং কৃত্রিমতা কিভাবে ওই নবপ্রজন্মকে একেবারে পঙ্গু করে দিচ্ছে। কোথাও সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছেন না!

কবির সময় সমাজ এবং অভিজ্ঞতা চিন্তামনন আর এই নেওয়ার নবপ্রজন্মের মধ্যে বহু যোজন পার্থক্য তফাৎ। তাই তিনি সংশয়ে বলছেন যে সে কি নেবে তাঁর এই উত্তরাধিকারের ভার ! নিজেকে কবচ ও কুন্ডল করে তার হাতে দিয়ে যেতে চান কবি। কবির উত্তরাধিকার মানে সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, প্রগতিশীল সামাজিক, মানবধার্মিক চিন্তা ইত্যাদি। কারণ কবিও জানেন যে 'মানুষের মাঝে আজ সমুদ্র বিশাল।' ঐতিহ্য ও নিজস্বতা (সমাজ সংস্কৃতি পরিচয় ইত্যাদি) ছেড়ে অন্য কোনও আরোপিত পরিচয় নিয়ে আমাদের জীবনযাপন। তাই নিজস্বতাকে ফিরিয়ে দেখার কথা নয় আনার কথা বলছেন নিজের জায়গায়। কারণ কবিও বিশ্বাস করেন যে পাখি যতই আকাশে উড়ুক না কেন নীড়ে তার আসতেই হয়। কিংবা গাছ যতই আকাশ ছুঁয়ে নিক না কেন তার শেকড় কিন্তু মাটিতেই থাকে। তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই আমিই নিই সেই ভার!

এভাবে যদি 'কবচ কুন্ডল' কবিতাটি দেখি তবে আমরা এখানে নিজেকেও দেখতে পাই। আর কবিতা পাঠ তো পাঠককে আরও গভীরভাবে সমৃদ্ধ করে—জীবনবোধকেও তার।

কৃষ্ণপক্ষ

কবি তপোধীর ভট্টাচার্যের 'কৃষ্ণপক্ষ' এই সুদীর্ঘতর কবিতাটি লেখার পিছে একটা ইতিহাস আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ একটা বর্বর তার দিন। এই গভীর মর্মাঘাত অনুপ্রাণিত করেছিল হয়তবা কবিকে। আর সে

জন্যই ৭ ডিসেম্বর এই কবিতাটি লিখে এক প্রকার প্রতিরোধ জানিয়েছিলেন। শুধু যে এই পটভূমি ছিল তা নয় কিন্তু। অনেকদিন থেকে এই রকম অনেক মর্মাঘাত ভেতরে ভেতরে দানা বাঁধছিল। আর তার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছে কবিতাটিতে। কবি বলছেন—

> ''যখন গন্তব্য নেই, পথের সন্ত্রাসে হারিয়ে গিয়েছে পথিকেরা
> এল সেই কৃষ্ণপক্ষ, সেই ছিন্নমস্তা কাল
> শূন্যের ভেতরে খাড়া হয়ে উঠছে আরো বেআব্রু শূন্যতা, শূন্য থেকে
> ... ...
> যখন সময় বিষে নীল আর উপড়ানো শেকড় থেকে খসে পড়েছে
> মাটির বিষাদ, এল সেই কৃষ্ণপক্ষ''

কবিতাটির শুরুতেই বলে দিয়েছেন যে আমাদের গন্তব্য নেই। যারা পথিক জীবনের সন্ধানকারীরা তারা পথের কাঁটার মধ্যেই হারিয়ে যাচ্ছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত ভেসে ওঠে চোখে আমাদের—ইতিহাস তার সাক্ষী দেয়। কার হাত ধরি, কাকে নিয়ে চলি, কাকে আপন বলি সবই সাময়িক—সুবিধাবাদী। ভেতরে বিষ ভরে নিয়ে ঘুরছে। তাই কবি বলছেন সে পথ আর নিরাপদ নয়—সন্ত্রাসে কাঁটায় ভরে গেছে। এই জিনিসটা কবির কাছে 'কৃষ্ণপক্ষ' হিসেবে ধরা দিয়েছে। কবি জানেন ভ্রাতৃত্ব বন্ধুত্ব আত্মিয়তার পথ আরো বেশি রুদ্ধ হয়ে গেল—হয়ে গেল বিপরীত, বিকর্ষণধর্মী।

সমগ্র কবিতাটির মধ্যে জীবনের অন্ধকারের দিক, ধর্মকুহক, ভন্ডামি, ছলনা, কপটতা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম পাওয়া যায় ভেতরে ভেতরে। আট পৃষ্ঠার এই সুদীর্ঘ কবিতায় আমাদের বেঁচে থাকা এবং জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ এসেছেন বারবার। এবং দেখাতে চেয়েছেন যে কৃষ্ণপক্ষে আমরা কিভাবে বেঁচে আছি। ধর্মের এই ভণ্ডামিকে তিনি চুরমার করে দিতে চান। কারণ এই বিষাক্ত অন্ধকার লক্ষ কোটি মানুষকে তার ভেতরকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

মানুষ চারদিকে কেবলি বারুদ জমা কচ্ছে বাইরে ভেতরে। হাজার নাগিনী হয়ে আঘাত করবে। হরপ্পা সভ্যতা, পলাশী, কণিষ্ক, মহাভারত, ইতিহাসকে বিভিন্নভাবে বিনির্মাণ করে করে দেখাতে চাইছেন আমাদের আজকের রূপ—আমরা কতটুকু আজ বিবর্তিত হয়েছি বর্বরতায়। দেখিয়েছেন কতটুকু শুকিয়েছে আমাদের শেকড়। ইতিহাস, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ— এই সবের যুগযন্ত্রণাকে বারবার চোখের সামনে তুলে ধরে এটাই প্রমাণ করতে চান— আজকের মানুষ কতটুকু মানুষ হয়ে বেঁচে আছে। এবং কতটুকু অন্ধকারে ঢেকে নিয়েছে আমাদের আলো।

> '' আজ অন্ধকার লক্ষ কোটি ডানা মেলে উড়ছে
> আর বিষাক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস অসাড় হয়ে আসছে ক্রমাগত বোবা ও বধির হচ্ছে প্রাণ
> চোখের কোটরে মনি দ্যুতিহীন
> যাবতীয় সুখ-অসুখের গেরস্থালি থেকে উঠে এসে অন্ধকার
> চেটে-পুটে খাচ্ছে শেকড়ের আলো
> তার ডানায়-ডানায় শুধু পথ-হারানোর গভীর দহন''

কবি জীবনানন্দ দাশের অদ্ভুত আঁধারের মতো কত বিচিত্র অদ্ভুত আঁধার চারদিক দিয়ে ডানা মেলেছে—লক্ষকোটি ডানায়। কবি দেখতে পাচ্ছেন এই অন্ধকার কোনও বিশেষ দিকে বা দিককে কেন্দ্র করে না কিন্তু। এই পৃথিবীতে জীবনের প্রতিটা পদে তার বিস্তার প্রসার হচ্ছে। আর সেই অন্ধকারটাই মানুষের মানবতা মনুষ্যত্ব ইত্যাদিকে ক্ষয় করছে ক্রমে। আর এই জায়গাটা পূর্ণ হচ্ছে হিংসায়, বিদ্বেষে, বিষে, সাম্প্রদায়িক বৈষম্যে। তার একটা গভীর প্রমাণ পাই ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালের ষড়যন্ত্রে চক্রান্তের বিস্ফোরণে। আর আমাদের শেকড় ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে আমাদের সেইসব ক্রিয়াকলাপের অন্ধকারে।

কিন্তু তার আগের স্তবকে কবি বলছেন এই রকম অন্ধকার আগে ছিল না। ইতিহাসের পথে গিয়ে দেখেছেন এই রকম অন্ধকার ছিল না। শক হুণ ইত্যাদি জাতি গান্ধারে কোশলে কত স্থাপত্যে সঙ্গীতে মিশেছে কতবার। রক্তঘাম ঝরলেও বিশল্যকরণী ছিল। গৌড়বঙ্গে আরাকানে চণ্ডীদাসে ভুসুকু পাদের গানে বাঙালিরা আলো পেয়েছে। এই নবম শতকেও এইরকম অন্ধকার ছিল না। কিন্তু আজ কী বিষাক্ত অন্ধকার ডানা মেলেছে আমাদের জীবনের আকাশে। যেখানে কোনও বিশল্যকরণী নেই—নেই কোনও আলোও। বরং এই অন্ধকারে শুধু পথ হারানোর পীড়াটাই দহন করছে প্রতিদিন।

"যাব কোন দিকে? কোন দৃশ্যে ঢুকে পড়ব আমি?
যে আমি মঞ্চের বাইরে ও ভেতরে
যে আমি দৃশ্যের বস্তু ও আঙ্গিক
আমাকে স্বপ্নের কথা বলে যেতে দাও, বলে যেতে দাও
লোভ আর বিস্মৃতির কথা প্রতিদিন
কতবার হেরে যাই নিজের কাছেই, নিরুপায় টুকরো হতে হতে
প্রতিদিন খুঁজি ওষধির ঘ্রাণ এই সব বিপন্নতা
বলে যেতে দাও এখনো স্বপ্নের কাছে কেন ফিরে আসি?
যাব কোন দিকে? মুখোসে মুখোসে ক্লান্ত হয়ে দেখি
আর কোনো মুখ নেই কোনোখানে
নিরুত্তর প্রশ্নের আঘাতে ভেঙে যাই, ভেঙে যাচ্ছি ক্রমাগত
ভেঙে যেতে যেতে
আঁকড়ে ধরছি কবিতার এই তুচ্ছ খড়কুটো"

এই সব বড় জটিল অন্ধকারে সব দিক ছেয়ে গেছে। এই জটিল সময়ে কবি নিজের সঙ্গেই দ্বিধাদ্বন্ধে পড়ে গেছেন—ভাবছেন কোন দিকে যাবেন। কারণ সকল পথই আজ কণ্ঠকময়। সময় আজ নিজেই আগুন আর নিজেই জ্বালানি। অস্তিত্বের সংকট ক্রমে বাড়ছে। মানুষ আজ নিজের অস্তিত্বকে টিকে রাখতে পারছে না। তাই কবি খোলস ভেঙে নির্দ্বিধায় বলছেন যে মানুষ বাইরে এক ভেতরে আরেক। অর্থাৎ মানুষ নিজের স্বার্থে প্রয়োজনে কত রূপ ধরে প্রতিদিন।

কিন্তু তবুও কবি নিজের স্বপ্নের কথা বলে যেতে চান। পৃথিবীর মানুষকে বলছেন যে নিজের সকল স্বপ্ন লোভ আর বিস্মৃতির কথা বলতে দেওয়ার জন্য। কারণ কবি নিজেকেও জয় করতে পাচ্ছেন না—এই রকম অন্ধকারের ভিড়ে। কিন্তু তবুও এই সব বিপন্নতা থেকেও কবি খুঁজেন ওষধি। যা দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু জীবনের প্রতিরোধ করবেন। কবি জানেন স্বপ্ন ছাড়া আজ আর মানুষের দ্বিতীয় কোনও আশ্রয় নেই। তিনি চান বলে যেতে যে কেন তিনি স্বপ্নের কাছে ফিরে আসেন।

মানুষের বাইর আর ভেতর অন্ধকারে ভরে যাচ্ছে আজ। সবদিকে কেবল মুখোশ। আর কবি এইসব মুখোসের আড়ে দেখতে চান কিন্তু কোনও মুখ দেখা যায়নি কোনখানে। তাই কবি নিরাশ হয়ে ভেঙে যাচ্ছেন অন্ধকারের আঘাতে। আর এই ভেঙে যেতে যেতেও কবি বেঁচে আছেন কবিতাকে আশ্রয় করে । কবিতার সব খড়কুটো নিয়ে। এখানে কবি নিজের অজান্তেই নিজের হৃদয়ের কথা বলে দিয়েছেন যে কবিতা তাঁর জন্য কি? বা কবিতা তাঁর কাছে কি? নিশ্চয় কবচকুন্ডল। হয়তবা কবচকুন্ডলের চেয়ে আরও বেশি কিছু।

"সাগর পেরিয়ে আসা খোক্‌কসের কাছে চেয়ে নিই পক্ষিরাজ ঘোড়া
রোপোর কাঠির ছোঁয়া নিয়ে ঘুমোক নাহয় দশদিক
যতদিন বাঁচি সুখে বাঁচি কৌপিন-পরানো ভাগ্যের লীলায়
খোক্‌কসের দেশ থেকে নিয়ে আসি থোকা-থোকা

পদ্মেতে লুকোনো সুতো-শঙ্খ সাপ, নিদালির রাতে পাকে পাকে
জড়ালে জড়াক আছে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী
এসো, পাশ ফিরে শুই
স্মৃতির ভারত ভেঙেছে ভাঙুক আছে পক্ষিরাজ
এসো, পাশ ফিরে শুই
যত রবি জলুক না দাউ-দাউ অযোধ্যায় কে বা আঁখি মেলে
পুড়ে তো পুড়ুক বুক
পিঠ এখনো রয়েছে এসো, পাশ ফিরে শুই
ছাই-ফেলতে ভাঙা কুলো তুলে আনি ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে
খাণ্ডব-দহন হবে খোক্‌কসের বরে"

এখানে কিন্তু কবি পরাধীন ভারতের উপনিবেশিক চিন্তাধারার কথা বলছেন না। বলছেন স্বাধীন দেশের ঐন্দ্রজালিক ঔপনিবেশিক চিন্তাধারার কথা। সাগরের ওপারের খোক্‌কস অর্থাৎ ইংরেজ আমেরিকান যান্ত্রিক জীবনের অনুকরণ অনুসরণ। ঐ সব দেশের মেট্রপলিটান লাইফের নিজ দেশে চর্চা চর্যাকেও। কবি বলছেন আমরা আমাদের নিজস্বতা হারিয়ে জলাঞ্জলি দিয়ে ওইসব কৃত্রিম জীবন বরণ করে নিচ্ছি গভীর সহজে। আর আমরাও তাতে ক্রমে সম্পূর্ণ ডুবে যাচ্ছি।

দেশের রাজধানী দিল্লিতে অর্থাৎ অযোধ্যার ওই ভয়ানক বীভৎস অন্ধকারে দেশের মানুষের বুক পুড়ছে। আর সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারে মানুষ একে অপরের থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। সবাই নিজের শরীর বাঁচিয়ে সরে যাচ্ছে। আবার তার মধ্যে ওই সব খোক্‌কসের অভিশাপ লুকানো ঘরের এষনা। আমরা নিজেই নিজের ইন্দ্রপ্রস্থ অর্থাৎ স্বর্গ সমান দেশ জ্বালিয়ে ছাই করছি। আর মাঝে মাঝে খোক্‌কসেরা তেল ছিড়কে দিচ্ছে। মেকলের মতো তারাও চায় আমরা যেন এরকম থাকি চিরদিন।

এই সব কথার গভীরে মানুষের অবক্ষয় ফুটে ওঠে প্রতীমার মতো। কবির হৃদয় কতটা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে আমরা এই কবিতার বিভিন্ন স্তবকে লাইনে প্রমাণ পাই। আর এখানে কবি কতটা মানবতাবাদী তার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

''উদ্দালক যেমন জেনেছে
আর জেনেছে গৌতম
কেন অন্ধ সে কথা জানো না অন্ন পথ, অন্নই পাথেয়
অন্ন ছাড়া সত্যের স্ফুরণ নেই
এই অন্ন রামে নেই, নেই রহিমেও
এই অন চেয়েছিল ঈশ্বরী পাটনী অন্ন সাধ্য, অন্নই সাধন
ডিহিদার খুশি হলে অন্ন দেয়
কিংবা বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে যায়
মুকুন্দরামের শিশু কাঁদে আজও
ওদনের তরে, সেই অশ্রু অন্নদা দেখে না অন্ন ভূমা, অন্নই দর্শন
শতাব্দীর রাক্ষসীবেলায়
খোক্‌কসের সেনাপতি নিদালি ছড়ায়
নিরন্ন ভারতে, ঘৃণায়-বিদ্বেষে
ক্ষুধাকে ভোলাতে অন্ন রাম, অন্নই রহিম
আর কত অন্ধকার চাই? অন্ধ, জাগো
অন্নের বন্দনা করো

ঔপনিবেশিকতার বাইরের আবরণ থেকে ভারতের মানুষেরা মুক্ত হয়েছে। কিন্তু 'অন্তরাত্মার দাসত্ব' মুছে যায়নি।

বাইরে তারা যতই ভারতীয় হোক না কেন ভেতরে তারা সাম্প্রদায়িকতা সামন্ততান্ত্রিকতা ঔপনিবেশিকতার গোলাম। এই জিনিসটা খুব ভালো করে দেখিয়েছেন দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য 'মননে স্বরাজ' প্রবন্ধে।

কিন্তু এখানে তার চেয়ে বড় সমস্যাটা হল জীবন বাঁচানো। কিছু সুবিধাবাদী মানুষ সব ধরনের সুবিধা লাভ করে (বিশেষ করে রাজনৈতিক জাদুজালে জনসাধারণকে বেঁধে।) কিন্তু দেশের প্রায় বারো আনা মানুষের ঘরে দু'এক বেলা খাদ্যও জুটে না। সেই সব মানুষকে সাম্প্রদায়িক অন্ধকারে উসকে দিয়ে দাঙ্গা বিস্ফোরণ করিয়ে এক শ্রেণির মানুষেরা ওসব অসহায় মানুষের সবকিছু লুটে নেয়। যে অন্ন 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের ঈশ্বরী পাটনী চেয়েছিল। সেই অন্নভাত কিন্তু রহিম আর রামে নেই। এই কথাটা বুঝে না অন্ধ মানুষেরা, ধর্মান্ধ মানুষেরা। আর ওইসব সাম্প্রদায়িকতার ধারক বাহক পান্ডারা ঘৃণায় বিদ্বেষে সাধারণ মানুষের ভেতর বিষাক্ত করে দেয় যে রামই অন্ন রহিমই অন্ন। কিন্তু কবি আহ্বান করছেন যে আর কতদিন এই অন্ধকারে থাকবে। অন্ধ হয়ে না বেঁচে অন্নের বন্দনা করো। যা সকল সাম্প্রদায়িকতার উপরে—জীবনের একমাত্র শক্তি।

''ক্ষয় কী প্রকৃত সত্য? ক্ষয় কী আকাশ?
মেঘে-মেঘে ক্ষয়ের বীজাণু ঝরে পড়ে?
ঘাসে ক্ষয়, ফুলে ক্ষয়, ভ্রূণেও কী ক্ষয়ের সংকেত?
ঘৃণা কী একান্ত সত্য? ক্ষয় নেই শুধই হিংসার?
কথা বলো সাত ভাই চম্পা, অঙ্কুরিত হোক প্রাণ
শস্যের ফাধন, কথা বলো, আলোর বিন্যাসে
এই চূর্ণ সময়ের ঘোর থেকে জাগাও জিজ্ঞাসা
মানুষের ভাষা আজ কার কাছে নতজানু হবে?''

অতীত ভারতের মহাপুরুষেরা নিজেকে জ্বেলে সাধনা করে মানুষের যে সীমা বাড়িয়ে দিয়ে গেছিলেন আজ তা ক্ষয়িষ্ণু। বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, আত্মীয়তাবোধ, প্রীতি সম্প্রীতি ইত্যাদি আজ ক্রমে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হচ্ছে শুধু—ক্ষয় হয়ে হয়ে। আকাশ, ঘাস, ফুল, ভ্রূণ সবখানে কী ক্ষয়ের সংকতে! ঘৃণা একান্ত সত্য আজ—হিংসাও। এইসবের ক্ষয় নেই। কবি চান সব দিক দিয়ে শস্যের ফাধন ফিরে আসুক—অন্ধকার দূর হোক। আর এই চূর্ণ সময়ের ঘোর থেকে ওঠে আসুক জিজ্ঞাসা আমরা মানুষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমাদের নিজস্বতা নিয়ে। কারণ মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা আজ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে দ্রুত মানুষের অন্ধকারে।

''বিষে-নীল এই মন্বন্তর, নিরঙ্কুর বীজে রাত গুল্মময় তবু
নিঃস্ব খামারের বুক চিরে জেগে ওঠে নিরীশ্বর চাঁদ।
ঝল্‌সে যাওয়া ফসলের মাঠে কোন আলো খোঁজো, পূর্বমেঘ?
পাঁজরে মশাল জ্বেলে সময় সমিধ হলো, দ্যাখো!
অন্ধকার ঢেলেছি আখরে, অন্ধকারে দোহার খুঁজেছি
আতুরের পদাবলী থেকে কীভাবে জাগাব কাল-পুরুষের তরবারি?''

এখানে জীবনানন্দ দাশের ''১৯৪৬-৪৭'' সুদীর্ঘ কবিতাটির কথা মনে পড়ে। জীবনানন্দের মতো তিনিও দেখাতে চেয়েছেন সময় কিভাবে পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে মানুষ পুড়ে। চারদিকে বিষে নীল হয়ে গেছে মন্বন্তর, অঙ্কুরহীন বীজে রাত কেবলই—সূর্যের আলো নেই। চাঁদও ক্ষমতাহীন আলোহীন। অর্থাৎ যে অন্ধকার চারদিকে ছেয়ে গেছে—তা সকল আলোকে, সম্ভাবনাকে ঢেকে দিয়েছে।

ওই রকম পরিসরে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছেন যে আতুরের পদাবলী থেকে কিরকম করে জাগিয়ে তুলবেন এক সম্ভাবনাময় তরবারি। যা দিয়ে অন্ধকারকে ছেদ করতে পারবেন। সময় সমাজ ব্যক্তি সমষ্টিই সব মিলে মানবতা এবং

মনুষ্যত্বের বন্দনা করাই কিন্তু কবির উদ্দেশ্য। তারও আগে কবি চান মনুষ্যত্ব ও মানবতার চাষ করতে। তা না হলে ওই রকম বিচিত্রগামী অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা মানুষের মুক্তি তো অসম্ভব—সম্ভাবনাহীন, স্বাধীনতাও।

> ''কোথায় আমার হারিয়ে যাওয়া পথ, ঝরে যাওয়া স্বপ্ন
> কোথায় তুমি, ঝরা পাতার বহ্ন্যুৎসব?
> কোথায় আমার নিরবধি কাল, কুলশীলহীন অন্ধকার
> কোথায় তুমি জলঝর্নার ধ্বনি?
> কোথায় আমার অসমাপ্ত রূপকথা, ব্যক্তিগত বিষাদের ভার
> কোথায় তুমি, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ?
> কোথায় আমার সময় পেরোনো দোঁহাকোষ, অনিঃশেষ
> লোকায়ত সুখ
> কোথায় তুমি আলোহীনতার অভিমান, কবিতার
> কুশপুত্তলিকা?"

কবি এই পৃথিবীটাকে কম দেখেননি কিন্তু। এবং এই পৃথিবীর রঙ বদলও কম দেখেননি। তাই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞান দিয়ে খুঁজছেন আজ নিজের ফেলে আসা জীবনের সম্পদ পথ ইত্যাদি। আর নিজের ওপর সত্তা অর্থাৎ সহযোগী সত্তার কাছে তার উত্তর খুঁজছেন। তুমি কোথায়? নিজের সময়ের (অতীত) থেকে স্মৃতি দিয়ে বর্তমানকে ওজন করছেন। এই চিন্তা কিন্তু কবির ব্যক্তিগত নয় শুধু— সমষ্টিরও।

কিন্তু তার ফাঁকে আমি এবং তুমির অন্তর্গত দ্বন্দ্বটাই দেখানো হয়েছে। কারণ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উটপাখি'-র মতো কবিও বিশ্বাস করেন আমি ও তুমি—আমরা দুজনই সমান দোষী। তাই দায়ভার ভাগ করে নিতে চান ভেতরে অন্তরে। তাই আমি ও তুমির অতীত সন্ধান, ইতিহাসের খোঁজ। ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে অসমাপ্ত রূপকথা, লোকায়ত সুখ, ব্যক্তিগত বিষাদ এই সবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শুদ্ধত্বও খুঁজছে। কারণ এই কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে আজ আর কিছুই পবিত্র নয়—উজ্জ্বলও নয়। কোথাও না কোথায় ক্ষয়, রোগ, অন্ধকার, মায়া থেকে যায়।

এখানে কবি এক ধরনের আর্তনাদ করে বলছেন 'কোথায় তুমি?' অর্থাৎ নিজেরই ঐতিহ্য, পরিচয়, সংস্কৃতি, পরম্পরা, উজ্জ্বলতা ইত্যাদি। জলঝর্ণার ধ্বনি, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ, আলোহীনতার অভিমান, কবিতার কুশপুত্তলিকা ইত্যাদি আজ কোথায় হারিয়ে গেল। কবিও খুব ভালো করে জানেন মানুষ যতক্ষণ তার Negativity-কে জানবে না ততদিন তার Positivity -র উত্থান ও উন্নতি নিশ্চিত নয়। তাই কবি শেকড়ে জল দেওয়ার কথা বলছেন পরোক্ষভাবে—আলোর অধ্যবসায়ের কথাও।

পৃথিবীটা ক্ষয় হতে হতে মানুষের হাতের ব্যবহারে আর মগজের ব্যবহারে এই কৃষ্ণপক্ষের অন্যরকম এক পৃথিবী হয়ে গেছে। এখানকার মানুষ এবং মানুষের জীবন ও জীবনধারণও। তবুও কবি মানুষের উপর বিশ্বাস অটুট রেখেছেন। কারণ কবিও জানেন মানুষের উপর আর কিছু নেই। তাই এই কৃষ্ণপক্ষে খুঁজছেন মানুষ—ধর্মের কুহক পার হয়ে গিয়ে। যেখানে মানুষের ভাষা মানুষের দরবারে মানুষের মতো গৃহিত হয়। সেখানে কবি নিজের হাসি বিনিময় করতে চান। আর কৃত অতীতের জন্য ক্ষমা চান। এখানে এই ক্ষমার মধ্যে একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধতাও কাজ করছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে। একটা সম্ভাবনার আশাও করছেন। 'কৃষ্ণপক্ষ' কবিতার এটা একটা মূল প্রশ্ন— Hamlet-এর 'To be or not to be'- এর মতো।[18] আমরা কার কাছে কোথায় বলব আমাদের কথা! যাকে বলি যার কাছে বলি কেবল অন্ধকারে ঢাকা সে—মুখোশে মেকাপে হিংসার স্থাপত্যে। এখানে মনে পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ১৯৬১-এর ভাষাশহীদ আন্দোলনের কথা। এবং ইরাক আর আফগানিস্তান, পেলেস্টাইন

গাজার কথাও। মানুষ আজ মানুষের পরম শত্রু। এটাই বারবার নিজের বর্বরতা দিয়ে প্রমাণ করছে আজকের মানুষ—তার ভেতরের অন্ধকার হিংস্রতা দিয়ে। তাই কবি প্রশ্ন করছেন কার কাছে গিয়ে নিজেকে তুলে ধরি। কাকে বলি ভেতরের যন্ত্রণার কথা! আমি তো মানুষ!

কবিতাটির শেষ স্তবকে কবি আশাবাদী। 'The Waste Land' এর কবি এলিয়টের মতো তিনিও উচ্চারণ করলেন—

"এই কৃষ্ণপক্ষে এসো খুঁজি কোথায় মানুষ...
ধর্মের কুহকে নয়, ঘনকালো রাত্রির আবরণে নয়
যেখানে স্বপ্নের স্থাপত্য গড়েছে মানুষের ভাষা
সেখানেই বিনিময় করি হাসি, অশ্রু আর ক্ষমা চাই
মানুষের কাছে যে মানুষ আলোর সন্তান..."

এলিয়ট 'The Waste Land' এ দেখিয়েছেন চারদিকে পুড়ামাটি পাথর শুষ্কতা জরাজীর্ণতা, জলহীনতা, সকল শহর অবাস্তব, পথে কাঁটা, মানুষ মৃত। কিন্তু তবুও অবশেষে এক সম্ভাবনার কথা উচ্চারণ করে কবিতাটি শেষ করেছেন কবি—

"Datta. Dayadhvam. Damyata.
Shantih Shantih Shantih"[19]

ঠিক সে রকমই কবি তপোধীর ভট্টাচার্য 'কৃষ্ণপক্ষ' কবিতার সকল তমসা অন্ধকার জলহীনতা শুষ্কতা রোগাক্রান্ত জীবন পার হয়ে খুঁজতে চেয়েছেন অন্ধকারের সন্তানের ভিড়ে এই কৃষ্ণপক্ষে—

"মানুষের কাছে যে মানুষ আলোর সন্তান...'

কিংবদন্তির ভোর

'কিংবদন্তির ভোর' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটি ১৬টি পর্বে বিভক্ত এই কবিতাটি কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম একটি কবিতা। এই কবিতায় কবি কিংবদন্তির ভোরকে প্রার্থনা করে আহ্বান জানাচ্ছেন। আরেকটি জিনিস এই কবিতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে চোখে ভেসে ওঠে সেটা হল কিছু উর্বরতাপূর্ণ শব্দ বারবার ব্যবহার হয়েছে। যেমন ভোর, জল, আলো, আগুন, আজ ইত্যাদি। সব দিক দিকে কবিতাটি একটি সমৃদ্ধ সবিতা। যেখানে অনেক সম্ভাবনাময় কথা ও বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়। কবিতাটির শুরু এভাবে—

"এসো, কিংবদন্তির ভোর, আহিরভৈরবী নিয়ে
ব্রাত্য জীবনের কথকতা ঢেকে দাও
আলোর সংকেতে
আজ ভুলে যাই স্রোতের ব্যর্থতা
দেখি, নতুন আদল ফিরে ফিরে আসে
জলের প্রবাদে..."

কবি তপোধীর ভট্টাচার্যের কবিতায় পুরাণ প্রসঙ্গ ও ব্রাত্য জীবনকথা এক বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে। তিনি পুরাণ ও ব্রাত্যজীবনকে আরও একটু উন্নত করে বিনির্মাণ করতে চান সময়ের মাপ অনুযায়ী। তাই কিংবদন্তির ভোরকে এইভাবে আহ্বান জানিয়েছেন আহিরভৈরবী নিয়ে। এবং আলোর সংকেতে ব্রাত্য জীবনকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে চান। কিন্তু তার ফাঁকে সময়ের স্রোতের ব্যর্থতাকে ভুলে যেতেও চান। তিনি দেখতে চান একটা নয়া আদল গড়ে

জীবনকে। যেখানে জীবনকে নতুন করে আবিষ্কার করাই কিন্তু ভেতরের মূল উদ্দেশ্য। তাই কবি দ্বিতীয় পর্বে বলছেন—

''নোনামাটি থেকে অঙ্কুরের পাঠ নিই
আর, উপকূল থেকে
শিখে নিই বয়নের টানা ও পোড়েন
এই, এই তো পিপাসা
সব পরিভাষা ভেঙে দেয় রোজ
শুধু অন্নজল আর চলার রূপক থেকে
জেগে ওঠো শাকম্ভরী দিন...''

অবক্ষয়ী আধুনিকতাকে অতিক্রম করে কবি নোনামাটি থেকে পাঠ নিতে চান। যে পাঠ কিন্তু এক নয়া সম্ভাবনাময়। আর এই পৃথিবীর উপকূল থেকে শিখে নিতে চান বয়নের টানাপোড়েনের রহস্য। এটাই তাঁর পিপাসা। কিন্তু পরমুহূর্তে বলছেন যে সকল পরিভাষা ভেঙে দেয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন। তবুও তার থেকে তিনি শাকম্ভরী দিন জাগাতে চান। যে দিন কিন্তু প্রাকৃত জীবনের গাথা রচনা করে।

কবি তপোধীর ভট্টাচার্যের কবিতায় ঐতিহ্য একটা বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে। আর এই ঐতিহ্য কিন্তু আধুনিকতার অবক্ষয়কে অস্বীকার করে জেগে ওঠে। এই ঐতিহ্য প্রাকৃত ব্রাত্য লোকজীবনের সরলতা পবিত্রতাকে আরও বেশি করে জেগে তুলে।

''জল গোপন বার্তার মতো বয়ে যাচ্ছে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সন্ধাভাষা
আর শ্যাওলা পাথরের গায়ে পুঞ্জ পুঞ্জ
স্মৃতির জাঙাল
তবুও সমস্ত ক্লান্ত প্রতিবেদনের ভাষা
মুছে দেয় জল
প্রতীকের কৃতি ও গ্রন্থনা নিঃশব্দে ফুরোয়
বয়ে যায় জল, জলের স্বভাবে...''

এই স্তবকে জল, এই ধাতুটা এক বিশেষ মাত্রা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতির প্রায় সকল জীব প্রাণী উদ্ভিদ জলকে জীবনরূপে গ্রহণ করেছে। বেঁচে থাকার এক সুগভীর অবলম্বন হিসেবেও। কিন্তু আজ জল সেই গোপন রহস্য হারিয়ে ফেলেছে মানুষের অপব্যবহারে। যেখানে জলের প্রয়োগ অর্থ মানে সংজ্ঞাও তার বিপরীত। জলের গায়ে শ্যাওলা—আর পাথরের শরীরে তার অবস্থান। এই সংকেতটা হল জীবনকে ভোগ করার নয়—বরং সংশোধন করা।

তাই কিন্তু কবি দেখেছেন যে আজকের জলের স্রোত অর্থাৎ সময়ের স্রোত গতি সকল জলকে মুছে দেয় গভীর অনায়াসে। সমস্ত সংকেতের শক্তি ও প্রকাশ নিঃশব্দে ফুরিয়ে যায়। আর বয়ে যায় জল তার নিজস্ব স্বভাবে। এই যে প্রকাশ বয়ানটার তা তো আজকের জলের কথা—সময়ের সুগভীর সত্য বাস্তবতা। বহুবাচনিক বার্তা লুকিয়ে রয়েছে তার ভেতরে। যে বার্তা আমাদের আজকের সময়ের দ্যুতিময় বাস্তবতা। জীবনকে একটা নয়া মাত্রা দিতে চাইছেন আত্মাবিষ্কারের মধ্য দিয়ে—জলের প্রাকৃতিক ধর্মের অবক্ষয়কে তুলে ধরে। ফিরে যেতে চান নদীতে যেখানে জল সুগভীর প্রাকৃত—নিজস্ব স্বভাবানুযায়ী।

ব্রাত্য জীবনের কথকতা দিয়ে শুরু হয়েছে 'কিংবদন্তির ভোর' কবিতাটি। এবং ধীরে ধীরে পথহেঁটে গেছেন এগিয়ে বর্তমান থেকে অতীত পর্যন্ত। আজ কিভাবে বেঁচে আছি— আমরা মানুষ কতটা বিবর্তিত হয়েছি! সে কথাগুলিও বলেছেন এখানে। শুধু এখানেই থেমে থাকেননি। দিনদিন আমরা কোনদিকে যাচ্ছি—কত ভয়ঙ্কর নরকের দিকে। তার

একটা নক্সা তুলেও ধরেছেন এখানে এবং তার থেকে মুক্তি লাভের জন্য সাধনা করছেন—

''ভাবো, অনুশাসনের বাগর্থ ভেঙেছি
দার সভ্যতার কোলাহল থেকে
সরিয়ে নিয়েছি সাবেক গ্রন্থনা, এবার শৈশব
পিপাসা শেখাবে
ধান ও জলের সুন্দর লিখি আজ, কতদিন
গেল খরার পাঁচালি আর
এগতোক্তি নিয়ে, প্রতীকের ভাষা খুঁজে খুঁজে
এখন তাহলে উৎসে ফিরে যাক
চেতনাপ্রবাহ, শুনি শবর-শবরীকথা সুষুন্না-সংসার
দেখি মুখ লালকমলের
দেখি মুখ নীলকমলের''

এইখানে কবি উৎসে ফিরে যেতে চান আবার। সভ্যতার কোলাহল থেকে সরিয়ে নিতে চান সাবেক গ্রন্থনা। শৈশবের কথা মনে পড়ছে এখানে। শৈশবের চোখে দেখা হৃদয়ের রাজ্যের বিস্ময়কর পৃথিবী আবার জেগে ওঠছে। তাই তিনি ফিরে গিয়ে লিখতে চান ধান ও জলের সৌন্দর্য।প্রতীকের ভাষা খুঁজে উৎসে ফিরে নিয়ে যেতে চান চেতনাপ্রবাহ। এবং এই চেতনাপ্রবাহ দিয়ে শবরশবরীর সুষুন্না সংসার দেখতে চান। যে সংসার উজ্জ্বল সুন্দর লাল কমলের মতো নীল কমলের মতো।

আসলে কবি ব্রাত্যজীবনে আবার ফিরে যেতে চান। যেখানে সরলতা, পবিত্রতা, আত্মীয়তার উজ্জ্বল রূপ আজও উজ্জ্বল। প্রাকৃত জীবনের বৈচিত্র্যময়তায় পৃথিবী এখানে উজ্জ্বল। বিন্দু বিন্দু ক্ষয় মৃত্যু ইত্যাদি থেকে মুক্তির জন্য। কারণ কবি জানেন পৃথিবীর মায়াবী রূপ কত মায়াবী। আর এই নীলকমল লাল কমলের মুখ দেখার কথা বলেই বলছেন—

''আলো হোক, আলো হোক, আলো হোক, আলো
মুহূর্তের সমস্ত পিপাসা মুছে নিয়ে
লেখো রাত্রি
লেখো জয়
লেখো আকাশ লেখো আকাশ লেখো হে আকাশ
স্পন্দন, তোমাকে শিখি
ধুলো, তোমাকেও
গাঢ় চুম্বনের দাগ ঘাসে-ঘাসে, দিনের পরিধি জুড়ে
শিখি এই প্রকাশের আয়ু
আলো হোক, আলো হোক, আলো হোক, আলো''

পুনরায় আলোর বন্দনা করলেন। কারণ কবি জানেন আলো ছাড়া অন্ধকার দূর করার কোনও অন্য উপায় নেই। তাই আলোকে ভালোভাবে বন্দনা করে অর্জন করতে পারলে তবে সে আলো কাজে লাগবে। আর এই আলো দিয়ে রাত জয় করার কথা বলছেন।

''তাতে পুড়ে যাচ্ছে চোখ
ঝলসে যাচ্ছে জিহ্বা
এই সমাচার আজ, শোনো
দাঁত থেকে নখ থেকে
উথলে উঠছে বিষ
ভাষা থেকে খুঁটে খুঁটে তুলে নিচ্ছি

উড়ালের স্মৃতি
তাতে পুড়ে যাচ্ছে চোখ
ঝল্‌সে যাচ্ছে জিহ্বা
এই সমাচার আজ, শোনো”

এখানে বয়ান খুব স্পষ্ট সরল—সহজও। এই রকমভাবে জীবনের কথা তুলে ধরা কবি তপোধীর ভট্টাচার্যের একটা বৈশিষ্ট্য। এই সরল বয়ানটা আসলে চিহ্ন থেকে চিহ্নায়কের ধারক বাহক। এই চোখ জিহ্বা পুড়ে যাচ্ছে—ঝলসে যাচ্ছে। আর আজ জীবনের পথে এত কাঁটা নিজের পায়ে পথ হাঁটা যায় না—দলাল ছাড়া। এত বিষ—সকল অমৃতকে গ্রাস করে নিয়েছে। তবুও কবি এরকম জায়গায় দাঁড়িয়েও ‘উড়ালের স্মৃতি’থেকে নিজস্ব ভাষা থেকে খুঁটে খুঁটে তুলে নিচ্ছেন বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে। এই সমাচার শুনাতে চান তিনি। যদিও চোখ পুড়ে যাচ্ছে—জিহ্বা ঝলসে যাচ্ছে আজ মানুষের।

তারপর বলছেন—

‘‘আজ, প্রতিটি মুহূর্ত জুড়ে
অতিজীবিতের শোকবার্তা
প্রতিদিন মেনে নিই অসুখের
দীর্ঘ পরম্পরা
রোজ, নিজেই নিজের শব বয়ে আনি
মুখে ছোঁয়াই আগুন
যাক, পুড়ে যাক স্নায়ু
একাগ্নী বিষাদে”

আধুনিকতার অবক্ষয়ী রূপকে নিদ্বির্ধায় অবগাহন করে আমরা আজ জীবনকে এভাবে নির্মাণ করেছি। আজ আমাদের জীবন অতিজীবিতের মতো শোকবার্তায় পূর্ণ। পরাবাস্তবতায়—যেখানে কোনও বাস্তব বলে কিছুই নেই। আছে শুধু অসুখের পরম্পরা। এই মৃত শরীরটাকে রোজ আগুন দিয়ে পুড়াই। আর কবিও চান এত বীভৎস ভয়ঙ্কর বিভিন্ন অসুখে যন্ত্রণায় রোজ রোজ মরার চেয়ে একদিন মরে যাওয়াটাই ভালো। এই মরে যাওয়াটা কিন্তু এলিয়টের ‘Journey of the Magy’ মরণ[20]। অর্থাৎ আসলে নিজেকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে পবিত্র করে জীবনটাকে সোনালি করে বাঁচা—প্রাকৃত মানুষ হয়ে, এটা কী কম বড় সংকেত!

কবি তপোধীর ভট্টাচার্য এই বয়ানের মধ্যে মানুষের ভেতরের সুন্দর রূপকে ফুটে তুলা না শুধু— আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তাই পরের স্তবকে আলোর কথা বলছেন—

‘‘হলুদ লণ্ঠন, দুলে দুলে উঠছে
বালকবেলার
গানের ইশকুল থেকে, ফরফর করে
উড়ে যাচ্ছে
নোটেশন ভরা খাতা আর সূর্যাস্তের
জটিল মুহূর্ত সব
মনে পড়ে পউষের মেড়ামেড়ি রাত
আমাদের কচিকাঁচা
প্রেমপত্রগুলি, খসড়ার স্তূপ থেকে
উঠে আসা বিরহ বিরহ খেলা
মনে পড়ে, হলুদ লণ্ঠন, বয়ঃসন্ধি জুড়ে
স্বপ্ন আর দ্বিধার প্রস্তুতি”

এখানে অতীতের সরল জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। এই ছবি ঐতিহ্যের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়। এই ছবি অনেকার্থদ্যোতক। যে দ্যোতনা জীবনের শুদ্ধ সরল সহজ আসল জীবনের সময়ের কথার সংকেত দেয়—প্রকাশ করে তার পবিত্র রূপ। এই জটিল সময়ে সেই সব মনে করে নিজেকে জীবিত রাখতে হচ্ছে আজ মানুষের। অন্য কোনও উপায় নেই—পথও। বালকবেলা, স্কুলের সময়, যৌবনকাল ইত্যাদি সময় কত আনন্দময় ছিল কত গভীর জীবনময় ছিল । সেই সব সোনালি সময়কাল আজ মনে কেবলই বিস্ময় জাগায় কী রকমভাবে বেঁচে ছিলাম। কিন্তু আজ কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে সবকিছু ঢেকে নিয়েছে। এখানে বাঁচা তো দূরের কথা—মানুষ ভালোভাবে মরতেও পারছে না। এই সুগভীর বার্তা দিচ্ছেন এই বয়ানে। এখানে তার ফাঁক দিয়ে জেগে উঠছে জীবনের বহুস্বর বহুমাত্রিকতা যে আমরা কী রকমভাবে বেঁচে আছি আজ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে।

তারপর কবি বলছেন—

''এখন নির্জন। মধ্যদুপুরের গভীর স্তবতা। মাঝে মাঝে
আকাশের লিরিক-বিহীন মেঘে বৃষ্টির সংকেত। শুধু এই। তবু
রোদে-পোড়া মাঠে নাগরিক মেধা খোঁজে ভাষার পুরাণ। এই বার্তা
নিয়ে এল গৌড়বঙ্গে মফঃস্বলবাসী... শেকড়ের টানে
জাগো, রাত্রির চুম্বনে জাগো, জাগো সমস্ত স্তব্ধতা ভেঙে, জাগো
নির্মিতির সজল নবীন''

কবি স্বীকার করছেন মনে মনে নয় শুধু— প্রকাশ্যেও যে সময় এখনও চলে যায়নি। আজও 'রোদে পুড়া মাঠে' যান্ত্রিক জীবনের জালে ঘেরা মানুষ খুঁজে শান্তি—একটু আশ্রয়। গৌড়বঙ্গের মানুষকে আহ্বান করে শেকড়ের টানে অর্থাৎ ঐতিহ্যশীল পরম্পরার আলোয় নিজেকে আবার জাগিয়ে তুলার কথা বলছেন। যেখানে জীবন সজীব—নবীনও। এই বার্তার মধ্যে জীবনচেতনা খুব প্রখরভাবে ফুটে ওঠেছে। এই জেগে ওঠা কিন্তু সকল অন্ধকারকে আলোর আঘাতে নিহত করে শেকড়কে ক্ষমতাশালী করে। তাই পরবর্তী স্তবকে বলছেন—

''বহু কথা বলা হলো, এখন সন্ধ্যার
অন্ধকারে জেগে থাক আভা
আভা, শ্মশানের শেষ চিতা থেকে
রেখে যায় মুঠো-মুঠো ছাই
ছাই সমস্ত মুখোশে মেখে নিই
প্রতিটি গ্রন্থিতে তবু ক্ষত
ক্ষত, মিশে যায় দিনের গভীরে অনেক কথা''

অনেক কথা বলেছেন কবি। এখন সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে আলো জাগিয়ে রাখতে চান। শশ্মানের শেষ চিতা থেকেও কবি কিছু রেখে যেতে চান। এই চিতার ছাই মুখোশের উপরে মেখে মুছে নিতে চান মেকি রূপ। যা আসল বাস্তব রূপকে ঢেকে রাখে। আর কবি দেখেছেন প্রতিটা গ্রন্থির ভেতরে ক্ষত রয়ে যায়। এই ক্ষত দৈনন্দিন কাজের ব্যস্ততার গভীরে হারিয়ে যায়। মানুষ যখন রাতে একেবারে নির্জন হয় তখন নিজের মুখোমুখি হয় আর এই ক্ষত তার কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এবং নিজে টের পায় সে কতটা অসুখে পূর্ণ, কতটা ক্ষতশীল, কতটা অন্ধকারে ডুবে বেঁচে আছে—কী রকমভাবে! তখন জীবনের পরিসরটা কতটা সংকীর্ণ হয়ে ওঠে মানুষ বুঝতে পারে—তার নিজের হাতে মেপে! তারপর শুনি অন্যরকম স্বরে এইরকম বয়ান—

''জন্মান্ধের কাছে কেন ধুলো
কেন বা হেমন্ত
বিনিদ্র রাত্রির রূপকথা লিখি

টীকা-ভাষ্য দিয়ে
এই এই তো উৎসব, এই
আমাদের যাপনের কথা...”

এই স্তবকে কবি একটু তিক্ত হয়েছেন। আমাদের বেঁচে থাকার দিক, অনেক মাত্রা খুঁজে খুঁজে খুলে দেখিয়েছেন। তাই ভেতরের কষ্ট এরকম করে প্রকাশ করছেন যে জন্মান্ধের কাছে ধুলো আর হেমন্ত কি জন্য! কারণ তার কাছে তার কোনও মানে নেই—অর্থও। তাই কবি ‘বিনিদ্র রাত্রির’ কথায় রূপকথার টীকা ভাষ্য দিয়ে লিখে যাচ্ছেন জীবনের ছবি। এবং দেখাচ্ছেন যে এই হল আমাদের জীবনের— যাপনের কথা। আমরা কী রকমভাবে বেঁচে আছি—অন্ধকারে সাঁতরে! এবং পরবর্তী স্তবকে বলছেন কিছু রেখে যাবার কথা—

“ধূলোকে চুম্বন করি নুয়ে যেতে যেতে
লিখি দোঁহাকোষ
গ্রীষ্মের দুপুর আর শ্রাবণ লাবনি নিয়ে লিখি পাশাখেলা
আর, খেয়াপারানির কড়ি গুনে নিই
লিখি ব্রতপালনের
গাথা অভিশাপ, মৃত্যু ও সময়
হারানো এ-জীবনের পাণ্ডুলিপি রেখে যাই
নির্বোধ রাত্রির দিকে বয়ে যেতে যেতে”

এখানে কবি ধূলোমাটিকে প্রণামসহকারে চুম্বন করে মাটির প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার সংকেত দিচ্ছেন। এবং জীবনের প্রাকৃতায়নের বহুস্বরিক তাৎপর্য অন্বেষণ করছেন তার ভেতর দিয়ে। তাই দোঁহাকোষ, শ্রাবণ লাবাণ্য, খেয়াপারানির কড়ি, ব্রত পালনের গাথা ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে কবির কণ্ঠে। আমাদের জীবনে একদিকে প্রাকৃত জীবন এবং অন্যদিকে নাগরিক জীবনের অনুশীলন এই দ্বিবাচনিক সুরের টানাপোড়েনে আজকের জীবনের রূপ তুলে ধরেছেন। এভাবে হারানো জীবনের পাণ্ডুলিপি রেখে যেতে চান—রাত্রির অন্ধকারেও। এবং স্ববিরোধী সময় স্বভাবে আলো আঁধারি জীবনচর্চাকে খুলে দেখাচ্ছেন। তাই পরবর্তী স্তবকে বলছেন—

“এই গাথা, অজস্র মৃত্যুর
নিঙড়ে নিক মুহূর্তের পরম্পরা
বাচালতা থেকে সরে যাক ভাষা
শিখে নিক মেঘের গোধূলিকাল
এই গাথা একাকী রাত্রির
ঘষে নিক বিন্দু বিন্দু স্মৃতির ক্ষরণ”

শেকড়হীন জীবনের তুমুল পরিবর্তন দেখে কবি ফিরে যেতে চেয়েছেন শেকড়শীল গাথায়। যেখানে জীবন সুউজ্জ্বল। এই জায়গায় সুন্দর করে জীবনকে আবিষ্কার করার বার্তা পাচ্ছি। মানুষের ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়ে যাওয়া আবর্জনাকে পরিষ্কার করার কথা বলছেন এখানে। চারদিকের প্রতাপশালী ভাষা অন্যান্য ভাষাকে ঔপনিবেশিকভাবে শোষণ করছে শাসন করছে। তাই হারিয়ে যাচ্ছে তার মূল, শেকড়, সুক্ষতা ইত্যাদি। সেই ষড়যন্ত্রের বিরোদ্ধে এক প্রকার ঘৃণা বিদ্রোহ ঘোষণা করে কবি একাকী গাথা লিখে যাচ্ছেন। এই গাথা প্রাকৃত, লোকজীবনের গাথা, লৌকিক জীবনের কথা স্মৃতিকেও উজ্জ্বল করে তুলেছেন এখানে। এটা কোনও ব্যক্তির কথা নয়। এটা একটা ভাষা সমাজ সমষ্টির সংস্কৃতির কথা। হারিয়ে যাওয়া উজ্জ্বল পথকে আবার আলোকিত করাই কবির উদ্দেশ্য। যাতে আমরাও এই সব উজ্জ্বল পথে হেঁটে যেতে পারি গন্তব্য পর্যন্ত। অর্থাৎ জীবনের শেষ সীমানা পর্যন্ত। তাই বিন্দু বিন্দু স্মৃতির ক্ষরণ জাগিয়ে রাখতে চান কবি।

''হে আলো, প্রণাম
অন্ধকার, তোমাকেও সেলাম সেলাম
বিন্দু-বিন্দু মৃত্যু, প্রতিরাত
প্রতিদিন প্রতিশব্দহীন ক্ষয়
ওষধি খুঁজেছি, নেই কোনো
বিশল্যকরণী''

এই স্তবকে এসে কবি আলোকে প্রণাম করছেন—অন্ধকারকেও সেলাম করছেন। কবি খুব ভালো করে বুঝেছেন আলো আর অন্ধকার দু'টাকেই প্রণাম করতে হবে। কারণ যে আলো অন্ধকারকে দূর করার হাতিয়ার তাকে তো প্রণাম করতে হবেই। আর যে অন্ধকার সবকিছুকে ঢেকে নিয়েছে তাকে জোর করে তাড়ানো যাবে না। তাই অন্ধকারকে সেলাম করছেন। তবে কিন্তু অন্ধকারের কাছে সমপর্ণ করছেন না নিজেকে। তাকে অতিক্রম করে আলোর বন্দনা করতে চান।

এই পৃথিবীর পথে পথহেঁটে কবিও দেখেছেন আজ আমরা মানুষ প্রতিরাত বিন্দু বিন্দু করে মরছি। প্রতিদিন প্রতিশব্দহীনভাবে ক্ষয় হচ্ছি আমাদের সবকিছু নিয়ে। এই অন্ধকার এই মৃত্যু এই ক্ষয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওষধি খুঁজছেন। কিন্তু কোথাও বিশল্যকরণী পাননি আজ আর। মানুষের জীবনের এই সব নেতিবাচক দিক শুধু মানুষের শত্রুরাই সৃষ্টি করেনি মহাভারতের সেই সাত মহারথীর মত। বরং উল্টো দিকটা। অর্থাৎ মানুষের বন্ধুরাই মানুষের পরম শত্রু। তারা সৃষ্টি করে অন্ধকার, মৃত্যু, ক্ষয়ের চক্রব্যূহ। আমাদের এই ক্ষত দিয়েছে আধুনিকতার অবক্ষয় বা পেন্ডোরার বক্স। আমরা চক্রব্যূহের বৃত্তে বন্দি । তাই কবি আলো এবং অন্ধকারকে সমানভাবে প্রণাম সেলাম করছেন। লিখে যেতে চান আকাশ, ধূলোমাটি, ঘাস ইত্যাদিকে এবং প্রকাশ করতে চান আলোর মাহাত্ব, ঐশ্বর্য। অর্থাৎ অন্ধকার থেকে জীবন এবং জীবনের সকল অনুষঙ্গকে মুক্তি দিতে চান আলো দিয়ে ধুয়ে। তাই আলোর অধ্যবসায়।

''জল ফিরে যাচ্ছে উৎসে। এখানেই শুরু হলো
সন্ধাভাষা। এই ভাষা রাত্রি-সহচর।
ভুসুকুর ভাত নেই আজও। ফুটো হাঁড়ি থেকে
গলে গেছে রূপকের আয়ু। ক্রিয়া নেই
বিশেষণ নেই। শুধু ন্যাংটো অভিধার ছায়া
পড়ে আছে কঙ্কাল-শহরে। জল আজ
ফিরে যাচ্ছে উৎসে। মোহানার দিকে তার
যাওয়া নেই আর। কালি হাতে
ফিরে আসে কাহ্নপাদ শবরীর কাছে। ভাষা থেকে
খসে পড়ছে সন্ধানের আলো।''

এখন পর্যন্তও যা কিছু সরল সহজ সত্য পবিত্র ছিল। তা-ও উৎসে ফিরে যাচ্ছে। কারণ এখন আর কিছুই সরল সহজ সত্য পবিত্র থাকছে না। থাকতে দিচ্ছে এই পৃথিবীর মানুষের হাতের ব্যবহারে মগজের ব্যবহারে। এখানে সব কিছু রাত্রির সহচর। ভুসুকু আজও ভাত পাচ্ছে না এই জটিল পৃথিবীতে সহজভাবে জীবনধারণ করে। ফুটো হাঁড়ি আজও ফুটো রয়ে গেছে তাঁর।

এখানে ক্রিয়া নেই কোনও বিশেষণও নেই। অর্থাৎ নতুন কোনও সম্ভাবনা নেই। কেবল অন্ধকারের জয় গান। কঙ্কাল শহরের ভিড়ে মানুষ আজ কঙ্কাল ছাড়া কিছুই নয়। ন্যাংটো অভিধা মানে বিকৃত বিকলাঙ্গ ভাষা জীবন—জীবনের সকল অনুষঙ্গও। তাই জল ফিরে যাচ্ছে উৎসে। মোহনার দিকে আর ফিরে যেতে চায় না সে মানুষের অমানুষিক ক্রিয়া কলাপের জন্য। কাহ্নপাদ তার প্রিয়া শবরীর কাছে ফিরে আসে শূন্য হাতে। অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনযাপনের মানুষেরা

প্রতিমুহূর্ত ছোঁচট খেয়ে বেঁচে আছে এই পৃথিবীতে। তারা ন্যাংটো অভিধার মাপ সূত্র অনুযায়ী চলতে পারে না বলে এই রকম বেঁচে আছে আজও!

ভাষাও ক্রমে আলোকে ধরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে মানুষের যান্ত্রিক জীবনের ভিড়ে। ভাষা ক্রমে ক্ষমতাহীন হচ্ছে। কারণ কৃত্রিম জীবনের যাতাকলে ভাষাও প্রতিদিন সংকীর্ণ হচ্ছে তার সমস্ত আধারসহ, আলোহীন হচ্ছে। এবং পরমুহূর্তে তাই উচ্চারণ করছেন কবি—

"পুড়ে যাচ্ছে আঁখি-তারা, ইড়া ও পিঙ্গলা
ধ্যান ভেঙে যায়, কায়াতরু
থেকে জেগে ওঠে কামমোহিতের শ্লোক
এই পরম্পরা আজ শিখে নিচ্ছে
রূপান্তর, তবু দাহ থেকে যায় পুরোনো রিপুর
পাঁচ শাখা যায় পাঁচ দিকে
খামারের বুক চিরে, কোষে-কোষে, মাটি ও হাওয়ায়
পুড়ে যাচ্ছে স্মৃতিবীজ ধ্যানের প্রহর
ও আঁখি ও তারা..."

চর্যাপদের কায়াতরুর দর্শনের মতো কবিও কল্পনা করছেন পঞ্চেন্দ্রিয় সাধনা। কায়াতরুর পাঁচটি বিভাগ বেদনা, রূপ, সংস্কার, বিজ্ঞান, সংঙ্গা এই পঞ্চদ্বন্দ্বের চর্চা চর্যার দ্বারা জীবন লালিত। এখানে কিন্তু কবি দেখেছেন আজকের যুগযন্ত্রণার অন্ধকারে পুড়ে যাচ্ছে চোখের তারা, ইড়া পিঙ্গলা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়। কায়াতরু থেকে প্রকাশ পাচ্ছে কামকামনার শ্লোক। এই দেহ সর্বস্ব প্রেম ইত্যাদি এবং স্বার্থপূর্ণ সম্পর্কের পরম্পরা শিখে নিচ্ছে রূপান্তর। তবুও এইসব আনন্দ মনোরঞ্জন পরেও বেদনা আর দহন থেকে যায়— রয়ে যায় পুরাতন শত্রুর ক্রিয়াকলাপ। এখন আর কেউ মেডিটেশন করে কোনকিছু পায় না। তাই কবিও বুঝেছেন এত দিনের অর্জিত সারে পরিপক্ষ শত্রুরা পাঁচ শাখা হয়ে পাঁচটি দিককে (পঞ্চইন্দ্র ও পঞ্চস্কন্দকে) দখল করে নিয়েছে। তাই কোষে কোষে মাটি ও বাতাসে পুড়ে যাচ্ছে সকল স্মৃতি বীজ ধ্যানের সময়। তার থেকে বেশি কবির চোখ এবং চোখের তারা। মূল কথা হল চারদিকে এত মনোরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জনের সামগ্রী। তবুও ভেতরে ভেতরে এত দহন যন্ত্রণা জ্বালা। মানুষের সৃষ্টি করা অন্ধকারে পুড়ছে মানুষ নিজেই। কারণ কবিও খুব ভালো করে জানেন কর্মফল বিফল হয় না। নিউটনের মতো তিনিও গভীরভাবে বিশ্বাস করেন প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াকে।

এই ভাবে 'কিংবদন্তির ভোর' কবিতাটিকে নিবিড় পাঠে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সকল অন্ধকার, মৃত্যু, ক্ষয়, ইত্যাদির ফাঁকে বাঁকের গভীরে আলোর বন্দনা—আলোর গান। যা দিয়ে এই সব নেতিবাচক দিককে দূর করা যাবে। এবং মানুষ আলোর সন্তান হয়ে বেঁচে থাকতে পারবে এই কৃষ্ণপক্ষের পৃথিবীতে।

আসলে 'কিংবদন্তির ভোর' হল একটা ধারণা। আর এই ধারণার ভেতর দিয়ে কবির বক্তব্য ফুটে ওঠেছে, যেখানে আধুনিকতা থেকে বাংলার উত্তরাধুনিকতা সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। এবং এই ষোলটি কবিতার সংযোজনে বা মেলবন্ধনে একটা অখণ্ড কবিতা গড়ে ওঠেছে। আর প্রকাশিত হয়েছে জীবনের চর্চা চর্যা চাষ জীবনবোধ জীবনশৈলী ইত্যাদি। এই কবিতার মধ্যে কবি একটা 'কিংবদন্তির ভোর' আবিষ্কার করতে চেয়েছেন—সমস্ত অন্ধকার, 'অদ্ভুত আঁধার'কে পার হয়ে অর্থাৎ জয় করে। এই যে জীবনবাদী সংকেত পাচ্ছি এখানে এটা কী কম বড় কথা!

রণজিৎ দাশ

বরাকের কবিতা বা কাব্যচর্চার ইতিহাস পড়ে 'সাহিত্য' পত্রিকা নবপর্যায় চতুর্থ সংকলনে নিজের শেকড়ের কথা

গর্বিত ভাবে মনে করে আরও একবার কবি রণজিৎ দাশ নিজের কবিতা লেখার পটভূমি ও ঋণ স্বীকার করে কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যকে চিঠি লিখে বলেছেন—

> *''আপাতত আপনারা যে স্কেচটি তুলে ধরলেন তার দ্বারা আমি এতটা উদ্বেলিত কারণ ঐ প্রেক্ষাপটটির কাছে বরাক উপত্যকার অন্যান্য লেখকদের মতোই, আমিও ব্যক্তিগতভাবে ঋণী। যেটুকু লিখে চলেছি প্রায় কুড়ি বছর ধরে, সাহিত্যের বৃহৎ মানদণ্ডে তা যতই আকিঞ্চিৎকর ব্যর্থ হোক, নিজের বেঁচে থাকার পক্ষে এর গুরুত্ব অসীম। এবং এর পেছনে ঐতিহ্যের ওই অস্পষ্ট চালচিত্রটির অবদান শিরোধার্য। সুতরাং এই সুযোগে ওই চালচিত্রটির প্রতি, জানা অজানা সকল পূর্বসূরির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানাই। এবং এই সূচনাপর্বের পরেই, প্রায় একটা quantum jump-এর মতো, উত্তেজক অতন্দ্রপর্ব। ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ সব চরিত্র, যাঁদের স্নেহে ও প্রশ্রয়ে আমার কবিতা লেখার শুরু।''*[৫৫]

এই বয়ানের মধ্যে খুঁজে পাই রণজিৎ দাশের এক বড় বাস্তব পরিচয়—স্বীকারোক্তিও। কারণ কবি নিজেই পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে নিজের। যদিও আজ তিনি বাংলা কবিতার বৃহত্তর জগতে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচিত কবি। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হল—'আমাদের লাজুক কবিতা' (১৯৭৭), 'জিপসীদের তাঁবু' (১৯৮৪), 'ঈশ্বরের চোখ' (১৯৯৯), 'নির্বাচিত কবিতা' (১৯৯৪)। এই সব কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রণজিৎ দাশকে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর শিল্পীসত্তাসহ। যদিও জাঁক দেরিদা 'Death of Author' প্রবন্ধে বলেছেন Author-এর মৃত্যুর কথা। আমরা ও তার মতো বিশ্বাস করি এই বাইরের মৃত্যু বা হস্তক্ষেপের মৃত্যু শিল্পীসত্তার মৃত্যু নয় কিন্তু। রণজিৎ দাশের বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিচয় বহন করে তাঁর কবিতাজগৎ। আমরা নির্বাচিত কিছু কবিতায় খুঁজব তাঁর সময়, শিল্পীসত্তা, শিল্পের বৈচিত্র্য, সমাজ ও জীবনকথা ইত্যাদি।

আমাদের লাজুক কবিতা

> *''আমাদের লাজুক কবিতা, 'জিপ্‌সীদের তাঁবু', 'সময় সবুজ ডাইনি' এবং 'নির্বাচিত কবিতা'র মধ্যে যে রণজিৎ দাশকে পাই, তার সঙ্গে বরাকের সম্পর্ক সামান্যই। সওরের পুরোধা কবি, রণজিৎ এই পরিচয়ে বিশিষ্ট আজ। কবিতার ভাষায় বহুস্বরিক বিচ্ছুরণের মধ্যে আধুনিক বিশ্ববীক্ষা থেকে আধুনিকোত্তরবাদে তাঁর উত্তরণে এত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে যে এই আলোচনার চৌহদ্দিতে রণজিৎকে রাখা যায় না।''*[৫৬]

কবি রণজিৎ দাশের কবিতা বিশ্লেষণ শুরু করার আগে সমালোচকের এই কথাগুলি মনে করে নিতে পারি একবার। কারণ সমালোচক বরাক উপত্যকার অন্যান্য কবি সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে বলেছেন রণজিৎ দাশের কবিতার কথা। এই সত্যের সঙ্গে আরও কি সত্য বার হয়ে আসে দেখি তাঁর কবিতা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এগিয়ে যাই আমরা কবিতার পথে। কবির বয়ান ও সমালোচকের বয়ান এক সঙ্গে পড়লে এক স্ববিরোধিতার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় রণজিৎ দাশের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ধারণা।

কবির একেবারে প্রথম দিকের একটি কবিতা 'আমাদের লাজুক কবিতা' একটি পরিণত কবিতা। কবিতাটি শুরু এভাবে—

> ''আমাদের লাজুক কবিতা, তুমি ফুটপাতে শুয়ে থাকো কিছুকাল
> তোমার লাজুক পেটে লাথি মেরে হেঁটে যাক বাজারের থলে হাতে বিষণ্ণ মানুষ
> শুদ্ধ প্রণয়ভূক তোমার শরীরে কেউ ছ্যাঁকা দিক বিড়ি জ্বেলে— নিতান্ত ঠাট্টায়
> তুমি স্থির শুয়ে থাকো, কষ্ট সয়ে, মানুষের দীর্ঘতম ফুটপাত জুড়ে''

কবি রণজিৎ দাশ সম্পর্কে এবং তাঁর কবিতা সম্পর্কে জানতে যা বুঝতে হলে প্রধান হাতিয়ার হবে তাঁর শব্দ, শব্দবন্ধন, শব্দ প্রয়োগ আর শব্দ সংযোজন এই জিনিসটাকে ভালোভাবে খুঁড়ে দেখতে হবে। তাঁর প্রথম কাব্যের নাম কবিতাটিতে তা চোখে পড়ে—হ্যাঁ ঠিক পড়বার মতই। প্রথম দিকেই এই শব্দ আর শব্দ বাগ্ময়তাই প্রকাশ করে দেয় নাগরিক জীবনের কুটিল জটিল রূপ আর ছবি। এখানে ফুটপাতে লাজুক কবিতার পেটে লাথি মেরে চলে যায় বিষণ্ণ মানুষেরা। এখানে কবিতার থেকে বেশি আনন্দ দেয় জলন্ত বিড়ি। যদিও আমাদের জীবন নিয়ে অস্থির হয়ে শুধু দৌড়াতে থাকি কষ্ট সয়ে—অনেক মানুষের দীর্ঘতম ফুটপাত জুড়ে। এই ফুটপাত জুড়ে নেয়াই নাগরিক জীবনের কাজ। এটা তো কম বড় সাংকেতিক জীবনকথা নয়। তারপর কবি লাজুক কবিতার কথা বদলে নিলেন—

> ''শুধু লক্ষ্য রেখো, অন্ধে না হোঁচট খায়, কোনো ভিক্ষাপাত্র ভুল করে
> তোমার কাছে না চলে আসে
> ধীরে ধীরে রোদ-ঝড়-শীতের কামড়ে তোমার সোনার অঙ্গ কালি হবে
> ওই পোড়ামুখে তবে ফুটবে তামাটে আভা পৃথিবীর, তাই দেখে
> ফুটপাতশিশুরা ভারি ঝলমলে হাততালি দেবে
> তাদেরকে দিও তুমি ছন্দজ্ঞান, লজেন্স দিও না''

মহানাগরিক জীবনের অনুষঙ্গে আমাদের জীবন ক্রমে বিবর্ণ হচ্ছে। সেখানেও তুমি 'লাজুক কবিতা' খেয়াল করো যাতে আলোহীন মানুষ দিশাহারা না হয়। কোনো ভিখিরির ভাগ্যে ভাগ বসাও না। তবুও তোমার অঙ্গ কালো হবে নাগরিক ধোঁয়ার। তারপরও তোমার এই কালো মুখে এক ধরনের হাসি ফুটবে যা দেখে সরল ফুটপাত শিশুরা তোমাকে ভালোবাসবে। তারা যাতে ছন্দজ্ঞান পায় তোমার থেকে। ওই সব নাগরিক জীবনের কোনও যন্ত্রণা, ব্যথা, মৃত্যু পায় না। অর্থাৎ তারা যেন হারিয়ে যায় না তাদের পূর্বপুরুষ যেরকমভাবে হারিয়ে গেছে। 'দীর্ঘতম ফুটপাত জুড়ে'-ও আজ তারা কেউ নেই। এই যে জীবনবোধ জীবনশিক্ষা, তাতে তো শাহরিক জীবনের চরম বাস্তবতা লুকিয়ে আছে।

'আমাদের লাজুক কবিতা' সংকলনেই কবি নিজের পরিচয়টা প্রকাশ করে দিয়েছেন। সেই পরিচয় বড় স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে তাঁর পরবর্তী প্রতিটা কবিতা সংকলনের কবিতায়। কবি আরও গভীর আরও উজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছেন—জীবনবোধ, জীবনচর্চা, চর্যা, শৈলীও। আসলে কবি রণজিৎ দাশের কবিতা হল সময় ও জীবনের দ্বিরালাপ আর এই সময় ও জীবন, আধুনিক উত্তরাধুনিক ও অবক্ষয়ী আধুনিক জীবনচেতনায় সমৃদ্ধ। তবে বিশেষ করে অবক্ষয়ী আধুনিকতার দ্বারা নির্মিত জীবনের অবক্ষয়কে প্রকাশ করেছেন। মহানাগরিক জীবনের ভিড়ে স্রোতে জীবন যে কত জীবনহীন তা আরও স্পষ্ট তাঁর কবিতায়।

প্রতিটি শব্দের নাম নীলাঞ্জন

> ''প্রতিটি শব্দের নাম নীলাঞ্জন—এই কথা বলে আমি
> আকাশের দিকে তাকাবো না, কারণ আকাশ ভারি স্থিতিশীল
> সেখানে সচরাচর গ্রহণ দরোজা আগলে
> বুড়ো সূর্য পাহারায় থাকে।''

এই অমোঘ উচ্চারণে রণজিৎ দাশ অন্য রকম গভীরভাবে নিজের মেজাজ ও স্বাতন্ত্র্যকে প্রমাণিত করলেন। এই কবিতাটির প্রথম স্তবকেই তিনি 'নীলাঞ্জন' নাম, ব্যক্তিনাম, বা শব্দের মধ্যে আধার করে আছে একটা পৃথিবী এই জিনিসটা তুলে ধরেছেন কিন্তু উল্টো করে। 'প্রতিটি শব্দের নাম নীলাঞ্জন' এই কথাটি বলতে চাননি তিনি সব জায়গায়। কারণ এই পৃথিবীর পথে পথ হেঁটে কবিও বাস্তবকে অর্জন করেছেন—সত্যকেও। তিনি জানেন সব জায়গায় 'নীলাঞ্জন'

মানায় না। তার একটা স্থান আছে—পরিসরও। কারণ আকাশ বড় স্থিতিশীল আর সেখানে বৃদ্ধ সূর্য অর্থাৎ পূর্বপুরুষের সিঁড়ি পাওয়া পৃথিবী জীবন আলো ইত্যাদি আমাদেরকে প্রতিমুহূর্তে পাহারা দেয়। যাতে তাদের মন্ত্র সূত্র থেকে সরে যেতে না পারি।

দ্বিতীয় স্তবকেও এই রকম কথা বলেছেন আবার অন্যভাবে—

''প্রতিটি শব্দের নাম নীলাঞ্জন—এই কথা বলে আমি
মাটির দিকেও তাকাবো না, চারদিকে কি ভীষণ জলকষ্ট
কে আর এখানে এসে প্রতিটি শব্দের জন্যে
অনাহূত নামপত্র খুলে বলবে, 'আমার আদেশ...''

ভাঙনের সময়ে দাঁড়িয়ে শব্দকে না ভাঙলে অন্যরকম অর্থ বা অর্থদ্যোতনা পাওয়া যায় না। আর রণজিৎ দাশ জানেন শব্দকে টুকরো টুকরো করে তার কণারও মানে বার করা। 'প্রতিটি শব্দের নাম নীলাঞ্জন' এই বাক্যটা বলে কবি মাটির দিকেও দেখবেন না। কারণ তিনি আজ মাটির অর্থও জেনে গেছেন। তাই বলছেন প্রত্যেকটা শব্দকে এত নিগূঢ়ভাবে কে খুঁজবে বেকার মানুষের মতো। 'নীলাঞ্জন' শব্দের মানে অর্থ শুধু নীলাঞ্জন নয়। তার ভেতরে অসংখ্য ছায়াঞ্চল লুকিয়ে আছে। তাই কবিও কেবল 'নীলাঞ্জন'এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চান না। কারণ তারপরও অনেক আকাশ হাতছানি দেয় জীবনকে—এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এই শব্দের ভাঙাগড়া থেকে বার হয়ে এসে তৃতীয় স্তবকে বলছেন—

''বরং এভাবে তার আবেদন ছুঁয়ে যাবে অন্ধ পারিপার্শ্বিকের মুখ
ঝাঁপানো বৃষ্টির মধ্যে যার কোনো চিহ্ন নেই
ভেতরবাড়িতে শুধু স্মৃতিঘন নরম মল্লার জমে আছে
দীর্ঘ হাসাহাসি করে হেঁটে আসা মানুষের অপেক্ষায়
যার স্পর্শে একবারই জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে
কেঁপে উঠবে প্রত্যেকেরা তাবৎ মহিমা''

শব্দের মধুরতা বেশি সময় বেঁচে থাকে না। একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে তারও। এখানে সেই রকম একটা সংকেত পাচ্ছি ভেতরে ভেতরে। আমাদের অনাগরিক জীবন যখন নাগরিক জীবনে বিবর্তিত হয় বা আমাদের প্রাকৃত জীবন অপ্রাকৃত জীবনে রূপান্তরিত হয়। তখন আমাদের জীবনে প্রতিটি অনুষঙ্গ সামগ্রী প্রসঙ্গ শব্দও অন্য জায়গা পৌঁছায় অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন করে। এই স্থান পরিবর্তন মানে তার সংঙ্গা মানে অর্থও পরিবর্তন কিন্তু— এমন কি নীলাঞ্জনও! এখানে বাচনের ভেতরে আরও বয়ান পাওয়া যায়—শব্দের ভেতরে আরও অনেকার্থদ্যোতক নৈঃশব্দ্যের সংকেত। রণজিৎ দাশের কবিতার এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

তারপর পরবর্তী স্তবকে নীলাঞ্জনের পরিচয় দিয়েছে আজকের নিরিখে প্রাকৃত জীবনের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন—

''ধান-চাষীদের সঙ্গে নীলাঞ্জন পরিচিত নয়
এ তার স্বভাবদোষ, তবু
'আল্লা মেঘ দে' গাইলে যতটুকু নিখিল চাহিদা ফুটে ওঠে
নীলাঞ্জন তারও চেয়ে বেশি
সে-ই একমাত্র যার শিকড়ধারণ করলে সোনামুঠি ধুলো হয়ে যায়''

এই নীলাঞ্জন কিন্তু প্রাকৃত জীবনজীবী মানুষের বিপরীতে অবস্থিত। ধান চাষী মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। এটা তার ফারাক। কারণ এখন সে ঐ রকম প্রাকৃত জীবনের অনুষঙ্গে প্রসঙ্গে বাঁচতে পারে না। অর্থাৎ এই নীলাঞ্জন তাদের থেকে অনেক দূরে—অন্যরকম কিন্তু।

কিন্তু তবুও 'আল্লা মেঘ দে' গানের চেয়ে বেশি ব্যঞ্জনা আজ নীলাঞ্জনের মধ্যে। আজ এই নীলাঞ্জন একমাত্র আশ্রয়

যেখানে শেকড়ধারণ করলে সবকিছু অন্যরকম হয়ে যায়। কবি বলছেন 'সোনামুঠি ধুলো হয়ে যায়'। আজকের জীবনধারণের একটা পরিচয় পাচ্ছি। এই রকম জীবন ধারার প্রতিনিধি কিন্তু নীলাঞ্জন। আজ আমরা ক্রমে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। ডুবে যাচ্ছি প্রাকৃত জীবন থেকে নাগরিক জীবনের ছায়াঞ্চলে। তারপর মুহূর্তেই বলছেন—

''সেজন্যেই আমি আজ শুদ্ধ অভিধান ছুঁয়ে শপথ জানাবো জ্ঞ
প্রতিটি শব্দের নাম নীলাঞ্জন—আমৃত্যু খরা-র মধ্যে
এর কোনো বিকল্প হবে না।"

এভাবে কবিতাটি শেষ হচ্ছে একটা ঘোষণার মধ্য দিয়ে। যে ঘোষণার কিন্তু কোনো বিকল্প পথ নেই—বিষয়বস্তুরও। এখানে শব্দ থেকে শব্দময়তা বেশি—বাক্য থেকে বাক্যময়তা বেশি।

এই কবিতাটিতে স্মরণীয় পংক্তি আছে। যে পংক্তি সব কিছুকে ছাপিয়ে জীবনকে আধার করে। আর তার ভেতরে শব্দের অন্তর্বর্তী নৈঃশব্দ্যকে প্রকাশ করে। এখানে কিন্তু কবির মেজাজ ও মেধার পরিচয় বহন করছে এই প্রকাশ শৈলী। যা অন্য রকমভাবে সম্ভব নয়। টুকরো টুকরো ছবির চেয়ে বেশি আছে সামগ্রিক মেলবন্ধন। সকল টুকরো ছবি মিলেমিশে এক সামগ্রিক জীবনবোধ প্রকাশিত হয়েছে। আর এই জীবনবোধ ভাবনা ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে পরিণত কিন্তু। অর্থাৎ ব্যক্তি আর সমষ্টির মধ্যে এক গভীর দ্বিবাচনিক সম্পর্ক ফুটে ওঠেছে এই কবিতার শরীরে। এবং প্রাকৃত জীবন ও নাগরিক জীবনের টানাপোড়েন আছে কবিতাটির রক্তমাংসে।

আর কোনখানে আছে

''ভৌগোলিক বিচ্ছেদ কোনও মানসভূগোলের ব্যবধান তৈরি করেনি—সবাই বরাকের বাইরে থেকেও বরাকের কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, চিহ্নিত হয়েছেন এমনকি রণজিৎ দাশও— বাংলা কবিতার বৃহত্তর ভূগোলে তাঁর ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রতিষ্ঠা লাভ সত্ত্বেও।"[৫৭]

এই মন্তব্যের দ্বারা সমালোচক কবি রণজিৎ দাশের মানসভূবনের একটা স্বীকৃতি দিচ্ছেন—পরিচয়ও। আর সে পরিচয়টা কিন্তু তার প্রথম দিকের কবিতা থেকে পাকা হয়ে গেছিল—প্রতিষ্ঠাও। এই কথাটির প্রমাণ দিচ্ছি 'আর কোনখানে আছে' এই কবিতাটি পাঠ করে। এই কবিতাটি শুরু হয়েছে স্মরণীয় পংক্তি দিয়ে—

''রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কোনখানে আছে প্রেমের প্রকৃত মুঠি, চোখ ও চুম্বন?
মেয়ে মানুষের কাছে? মূর্খ সন্তানের ভার তাদের বইতে হয়, ইহজন্মে তারা
পুরুষের রৌদ্রছায়া ছুঁতেই পারে না"

একটা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শুরু করেছেন কবিতাটি। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছাড়া কী অন্য কোনওখানে নেই প্রেমের চোখ ও চুম্বন? এটা একটা গভীর অনুভব। যেখানে ঐতিহ্যপ্রিয়তার রূপ ফুটে ওঠছে—সাংস্কৃতিক মন ও মনস্কতা। এই প্রশ্নের বিপরীতে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথের গানের গভীরতা—বাগ্ময়তা। কিন্তু পরবর্তী লাইনে বলছেন এই জিনিসটা কি আজ মেয়ে মানুষের কাছে পাওয়া যাবে? সন্তান পালন করে তাদের জীবন চলে যায়। পুরুষের পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা 'পুরুষের রৌদ্রছায়াও ছুঁতে, পারে না'। এই বক্তব্যের মধ্যে ফুটে ওঠছে নারীচেতনাবাদের ব্যঞ্জনা—সংকেতবিশ্বও। ভেতরে ভেতরে কিন্তু সংকেত দিচ্ছেন পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চলার। তারপর অন্যরকম করে প্রশ্নের গভীরে তুলে ধরছেন আমাদের নিয়তি তাড়িত জীবনের যাযাবর দৃশ্যগুলি—

''অনিবার্য ব্যর্থ প্রেম আমাদের— বিচ্ছেদে বা নিষ্ঠুর বিবাহে,
ঘাড় হেঁট বসে থাকে পরমপ্রশ্নের কাছে—রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া

আর কোনখানে আছে প্রেমের প্রকৃত মুঠি, চোখ ও চুম্বন?"

'অনিবার্য ব্যর্থ প্রেম' এই কথাটি লক্ষ্য করার মতো। আমাদের আজকের জীবনের পরম সত্য ও বাস্তবতা। আমাদের প্রেমের ভালোবাসার পরিণতি তো বিচ্ছেদ যা নিষ্ঠুর বিবাহ—আর তার পরে বিরহের রবীন্দ্রসঙ্গীত। এই তো জীবনধারা। তবুও প্রশ্ন করছেন কবি এই রকম সময়ের সঙ্গি বা অন্যরকম সময়ের সঙ্গি রবীন্দ্রসঙ্গীতেই কী চূড়ান্ত সুখ আনন্দ আশ্রয়। কারণ আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে কবি দেখছেন এখানে আর কিছু নেই। কেবল বিচ্ছেদ, বিরহ, শোক ইত্যাদি নেতিবাচক বোধ।

তারপর পরবর্তী স্তবকে কবি আরও এগিয়ে গিয়ে উচ্চারণ করলেন—

"মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে
আমায় দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল সেই নারী চৈত্রপূর্ণিমাতে
—এরূপ কবিতা লেখে, ভুল লেখে
'দু'দণ্ড' শব্দের মধ্যে তাদের দণ্ডিত হাহাকার ছাই হয়ে মিশে থাকে
সোঁদাগন্ধ দুঃখ থেকে কোন্‌ক্ষণে মুছে যায় নারী
চৈত্রপূর্ণিমার রাত পড়ে থাকে খাঁ খাঁ, তার হিমশাদা চোখে
প্রাচীন বর্ষার মতো অঝোরে রবীন্দ্রগান নেমে আসে শুশ্রূষায়, শোকে"

এভাবে কবিতাটি সমাপ্ত করেছেন কবি।

নারীর রূপবর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ 'স্বপ্ন' কবিতাটি বিশেষ অনন্যতা দিয়েছিলেন। এবং জীবনানন্দ দাশ 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে বলেছেন 'দু'দণ্ড শান্তি' পেয়েছিলেন নায়িকার কাছ থেকে। কিন্তু রণজিৎ এই সব বর্ণনা প্রকাশকে বলছেন তারা ভুল লেখেছেন—এই সব হল ভুল কবিতা। কারণ তিনি খুঁজে পেয়েছেন এই 'দু'দণ্ড' শব্দের মধ্যে আছে 'দণ্ডিত হাহাকার ছাই'। যেখানে নারীর আসল রূপ ফুটে ওঠেছে ঐ শব্দসংযোজনের ব্যঞ্জনায়। সেই সব রূপ সৌন্দর্য ইত্যাদি থেকে 'নারী' একদিন মুছে যায় পৃথিবী থেকে—পড়ে থাকে চৈত্রপূর্ণিমার খাঁ খাঁ ছবি। আর কিছু না।

কবি রণজিৎ দাশ দেখিয়ে দিচ্ছেন নারীকে আমরা এইভাবে গ্রহণ করেছি—করে আসছি। এই দিক দিয়ে রণজিৎ কিন্তু অনেকটা প্রগতিশীলতা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিত্ব। তিনি চান নারীকে মানুষ করে তুলার চেতনা দিতে তার এই রকম কবিতার সংকেতে। যদিও তিনি খুব ভালো করে জানেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে হৃদয়ের শুশ্রূষা—শোক বা বিরহের সময়ের আশ্রয়শীল মধু। তবে তিনি তারপরেও বলতে চান নারীকে চেতনাশীল হতে। কারণ চেতনা ছাড়া গানের কোনও মানে হয় না। জীবনের গান বুঝতে হলে চেতনাশীল হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কবিতাটির ভেতরে এই জিনিসটা তুলে ধরেছেন কবি।

উন্মুক্ত স্তনের দিন

"শিকড়ে জলের ঘ্রাণ অবশ্য অবধারিতভাবে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল মহানাগরিক জীবনের তুমুল অভিঘাতে। আমূল বদলে গেল উচ্চারণ সাম্প্রতিককালের যাবতীয় চাতুর্য, কপটতা, বিকার মুগ্ধতা, ক্ষয়বিলাস, মাদকতাময় আত্মহননের মুখোমুখি হয়ে। কবিতার বাচনে ক্রমশ ব্যক্ত হতে লাগল 'স্বতঃস্ফূর্ত শীৎকারধ্বনি' আর ফিরে ফিরে এল আনুষাঙ্গিক টুকরো ছবি সর্বত্র ব্যাপ্ত অনন্বয় ও কূটাভাস"[৫৮]

সমালোচকের এই মন্তব্যের সত্যতা রণজিৎ দাশের প্রায় সব কবিতার সত্য। তবে কিছু নয় অনেক কবিতায় তা চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। হোক ছোট কবিতা। কিন্তু খণ্ড বা টুকরো ছবি বা দৃশ্যে এক অখণ্ড রূপ লাভ করে জীবনচর্চা

চর্যাকে প্রকাশ করেছে নিগূঢ় ব্যঞ্জনায়—বিশেষ করে নাগরিক জীবনের রূপটা বিশেষ স্থান পেয়েছে। এইরকম ধাতু জাত একটি কবিতা হল 'উন্মুক্ত স্তনের দিন'। কবিতাটির শুরু হয়েছে এ রকমভাবে—

''উন্মুক্ত স্তনের দিন শেষ হয়ে এল।
সাঁওতাল পরগনা, ওই দূরে, কাঁচুলি উড়িয়ে তাকে বিদায় জানায়।
ট্যুরিস্ট যুবক তার বিষণ্ণ ক্যামেরা কাঁধে আদিবাসী হাটে কিছু খোঁজে,
কাকে খোঁজে।
ব্লাউজ-বাণিজ্যে যিনি মহাজন, তাঁর গোল রোমশ ভুঁড়িটি
ঘুরে ফিরে চোখে পড়ে, বালির মতন।''

এই কবিতাটির নামের মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে তার চেয়ে বেশি আছে কবির তীব্র কটাক্ষ। এই কটাক্ষ কিন্তু সময় আর সমাজের মধ্যে টানাপোড়েনে সাঁতরানো নাগরিক জীবনের মানুষের বাস্তবতাকে। এক একটা পংক্তিতে এক একটা খণ্ড ছবি তুলে ধরেছেন। আর এই খণ্ডিত ছবি মিলে এক অখণ্ড ভাব প্রকাশ করেছে।

নিজের পায়ে পথহাঁটা শেষ হয়ে গেছে। আজ অন্যের পায়ে হাঁটতে হয়। মুক্ত হয়ে চলার দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন সময় আর সমাজ, মানুষ আর পথহাঁটা, জীবন আর যান্ত্রিকতা ইত্যাদি যেন প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে মানুষের জীবনকে জটিলতর করে নিয়েছে। যেখানে সাওতাল পরগণার মতো জায়গায়ও মুক্ত জীবন নেই। ট্যুরিস্ট মানুষেরা এই রকম জায়গায় তবুও জীবন খোঁজে। আর গদিতে বসা মহাজনের চোখরক্ষক ভুরিটিও আজ চোখের বালি মনে হয়। অর্থাৎ এই সব খণ্ড ছবি আমাদের আজকের জীবনচর্যা চর্যাকে প্রকাশ করছে। আমাদের বুক ফুলিয়ে পথ হাঁটা ক্রমে শেষ হয়ে এল। অন্যরকম এক জীবন যেখানে কুমীরের মতো গিলে খাচ্ছে আমাদের জীবনকে। আর এই জীবন নাগরিক আর মহানাগরিক রাক্ষসই কিন্তু। যেখানে সমস্ত সংস্কার, মূল্যবোধ, বুনিয়াদ শেকড়জল ক্রমে মরে যাচ্ছে তার দহনে। তারপর কবি আবার বলছেন—

''ট্যুরিস্ট যুবক তার বিষণ্ণ ক্যামেরা কাঁধে ফিরে আসে
ফাঁকা, স্তব্ধ, পাথুরে টিলায়।
উন্মুক্ত স্তনের দিন শেষ হয়ে যায়। আর ধীরে ধীরে
আবৃত যোনি-র রাত গোপনে ছড়িয়ে পড়ে সূর্য থেকে সূর্যে,
অন্ধ যুবতীর ঘরে।''

এত সব জঞ্জাল যন্ত্রণা জীবনহীনতা তার ফাঁকেও ট্যুরিস্ট যুবকের মতো কিছু বিফল প্রয়াস করে বেঁচে থাকেন পাথরের মতো অনুর্বর মাটিতে যেখানে জীবনটার মানে ফাঁকা, স্তব্ধ হয়তবা পাথরও। তাই কবি দেখিয়ে দিতে চাইছেন যে 'উন্মুক্ত স্তনের দিন' শেষ হয়ে গেছে। আর এই শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃতিক রাতের মেকি সূর্যের আলো এসে পড়ে 'অন্ধ যুবতীর ঘরে'। যে যুবতী অন্ধ সে কী রকম করে আলো বা সূর্যকে চিনবে! তার জীবনে তো রাত আর দিনের মানে একই।

কিন্তু কবি এই রকম টুকরো ছবি দিয়ে দিনগুলির ছবি এঁকেছেন। যে দিনরাতগুলির মধ্য দিয়ে আমরা বেঁচে আছি। আর এই বাঁচাটা কী রকম বিশেষ করে সেই ভাবকে বোধকে তুলে ধরেছেন এত সব শব্দ আর নৈঃশব্দ্যের বাচনে—আজকের জীবনের ভাঙা গড়াটাকেও। নাগরিক জীবনের সকল চাতুর্যতা, কপটতা, ক্ষয়বিলাস আর মাদকতাচ্ছন্নতা জীবনকে কীভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে মানুষকে। আর গ্রাস করছে মানুষের শেকড়ের জল, মাটির উর্বরতা। এই সব বয়ান কিন্তু 'উন্মুক্ত স্তনের দিন শেষ হয়ে এল' এই পংক্তিতেই গভীরভাবে আধারিত হয়ে আছে। এই যে হারিয়ে যাওয়া আমাদের জীবনকে দেখাতে চেয়েছেন আমরা ভিড়ের মধ্যে কীভাবে ক্রমে শুধু সংকীর্ণ হচ্ছি।

সময়, সবুজ ডাইনি

''রণজিতের একটি নিজস্ব ভাষা আছে। তার সাহায্যেই তিনি ধরতে চেয়েছেন সময়কে, জীবনকে। আর, এইসব লেখায় উঠে এসেছে অনেক স্মরণীয় পংক্তি। সময়কে এভাবে 'সবুজ ডাইনি' বলা, এ যে একেবারে নতুন, একেবারেই অভিনব। এমন স্বস্তঃস্ফূর্ত এবং অনায়াস এইসব কবিতা যে, তার ভিতরে ব্যবহৃত ছবি, ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত ও মাত্রাবদল, এসব দেখতে দেখতে কখন যে সময় চলে যায়।''[৫৯]

সমালোচকের এই মন্তব্য থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে রণজিৎ দাশের 'সময়, সবুজ ডাইনি' কাব্যের নাম কবিতাটি কতটা জীবনবোধ সম্পৃক্ত—জীবনশীলও। এই জীবনবোধ আর জীবনশীলতার ছবি, ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত ও মাত্রাবদলে আমাদের সময়টা সবচেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে। আর এই ফুটে ওঠানোর জন্য কবি প্রতিটা স্তবকে এক নয়া মাত্রা যোগ করেছেন শব্দ আর শব্দসংযোজনের সংকেতে।

কবিতাটি কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে—

''সময়, সবুজ ডাইনি
পৃথিবীর উপকণ্ঠে থাকো
নাবিকের হাড় দিয়ে
সন্ধ্যার উঠোনে তুমি
ভাঙা জাহাজের ছবি আঁকো''

'সময়, সবুজ ডাইনি' থাকে পৃথিবীর উপকণ্ঠে। এখানে এই কথার মধ্যে ফুটে ওঠছে অনেকার্থদ্যোতনা। সময়, সবুজ ডাইনি নাকি? নাকি কোনও প্রেতিণী? নাকি শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ'[21] নাটকের ডাকিণী-র মতো কোনও সত্তা বা সংকেত? সময়কে কবি এভাবে ব্যবহার করেছেন। যে ব্যবহারের মধ্যে খুব সচেতনভাবেই আধার করে আছে কালজ্ঞান—এবং ইতিহাসবোধও। পৃথিবীর সর্বত্রই সে ঘুরে বেড়ায় মানুষের পৃথিবীকে ভেঙে গড়ে। কিন্তু এখানে ভাঙাগড়া মানুষের বাইরের পৃথিবী থেকে ভেতরের পৃথিবীকে বেশি করে। আর এই মাপ অনুযায়ী নির্মাণ হচ্ছে জীবনবোধ, জীবনচর্চা চর্যা। তাই কবি বলছেন 'নাবিকের হাড়' এর কথা। যে নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করে 'সন্ধ্যার মাঠে'। আর সময় এই হাড় দিয়ে 'ভাঙা জাহাজের ছবি' এঁকে জীবনটাকে পুনর্নির্মাণ করে, তার সংকেতে কবি বুঝতে চান। তিনি সময়ের সকল দিককে সকল পারকে ভেঙে ভেঙে দেখে নিতে চান। তার ভেতরের সকল প্রতীতি টানাপোড়েন—প্রতীমাও। তারপর কবি বলেছেন—

''এ ছবি ডিঙিয়ে যারা ঘরে ফেরে
তারাই তোমার
অনন্ত ক্রোধের লক্ষ্য, প্রধান শিকার
যারা ঘরে ফেরে তারা শক্তিমান
মাটির বামন
জুতো ঘষে মুছে ফ্যালে যেকোনো দুর্বোধ্য ছবি
তারপর হাতে নেয় স্তন''

এই কবিতাটির প্রতিটা পংক্তিই দ্যুতিময়। আর এই দ্যোতনা কিন্তু চিহ্ন থেকে বেশি চিহ্নায়ক। যে চিহ্ন জীবনের সময়ের মানুষের প্রতীক। জীবন ও জীবিকার টানাপোড়েন না কিন্তু— এর চেয়ে বেশি কিছু। মানুষের জীবনের অন্তর্লোকের কথাই এখানে ফুটে ওঠেছে।

'ভাঙা জাহাজের ছবি' পার হয়ে যে সব মানুষ নিজের ঘরে পুনরায় ফিরতে পারে না তারাই 'সবুজ ডাইনি'র ক্রোধের লক্ষ্যবস্তু প্রধান শিকার। আর যারা সমস্ত প্রতিকূলতা ভেঙে চুরমার করে দিগন্ত আবিষ্কার করে জীবন ও জীবিকা নিয়ে ঘরে ফিরে আসতে পারে—কবি বলছেন তারা শক্তিমান বেঁচে থাকার জন্য যোগ্যতম সত্তা। নিজের পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যায়—নতুন ছবি আঁকতে। ভাঙা জাহাজ হলেও নিজেকে সমর্পণ করেনি কিন্তু নাবিক। আর কবি চান তার হাড় দিয়ে আত্ম-আবিষ্কার—নিজস্ব পরিচয়। তারপর যান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন জীবনের ভারে ফেঁপে ওঠে তাদের নিজস্ব বেঁচে থাকার ঘরটুকুও—ইট পাথরের ঘর। কবির ভাষায়—

''তাদের দোতলা বাড়ি দুলে ওঠে
তোমার নিঃশ্বাসে
ক্রমশ তা ভেঙে পড়ে
নোনাজল, সাপ উঠে আসে
পাটাতন আঁকড়ে তারা ভেসে থাকে
আকাশগঙ্গায়
পুজোপার্বণের দিনে তাদের প্রচ্ছায়া দেখা যায়''

কবির অন্তর্লোকের একটা তিক্ত বিস্ফোরণ দেখি এখানে। পাকাবাড়ি দুতলা দুলে ওঠে তার নিঃশ্বাসে আর ধীরে ধীরে তা ভেঙে পড়ে, নোনাজল, সাপ। এইগুলি প্রতিটি অনুষঙ্গই তো আসলে প্রতীক। নাগরিক জীবনের বেপরোয়া জীবনযাপন, অস্থিরতা, উশৃঙ্খলতা, নষ্টনীড়ের কথা। আসলে কবি দেখাতে চান যে আমরা আজ এভাবেই বেঁচে আছি ডাইনি সময়কে নিয়ে পৃথিবীতে—নিজের হাড় দিয়ে ভাঙা জাহাজ গড়ে গড়ে।

কিন্তু পরমুহূর্তে সুর বদলে নিয়ে বলছেন যে 'পাটাতন আঁকড়ে' কেবল তারা ভেসে আছে 'আকাসগঙ্গায়'। আর এই রকম আঁকড়ে বেঁচে থাকার কথা বোঝা যায় যখন পূজাপার্বণ হয়। তার আগে সময় এক ঘেয়েমির ধারায় বয়ে চলে। সময় ও সমাজের ভাঙাগড়া আর ব্যক্তিও অস্তিত্বের ভাঙাগড়া এখানে সক্রিয়ভাবে ফুটে ওঠেছে। এই সব বয়ান বা প্রতিবেদনের মধ্যে একটা জিনিস কিন্তু খুব সুস্পষ্ট যে রণজিৎ দাশ সময়ের ভাঙা ছবি দিয়ে জীবনকে দেখাতে চেয়েছেন—আমরা আজ কীরকমভাবে বেঁচে আছি!

তারপর কবি শেষ দু'টি স্তবকে অন্যরকম দ্যোতনার সাহায্যে বললেন—

''আর যারা ওই ছবি—ভাঙা জাহাজের ছবি
উল্কি দিয়ে এঁকে নেয় বুকে
এবং ফেরে না ঘরে, তাদের মৃত্যুকে
লোকগাথা দিয়ে তুমি ঢেকে দাও
ভোরবেলা, শান্ত উপকূলে
নিজেও ঘুমিয়ে থাকো সেইখানে
সারাদিন রৌদ্রে, এলোচুলে''

এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু প্রতিটি চেতনাচিন্তা সময়ের আয়তন ছেড়ে নয় কিন্তু। সময়ের শারীরেই তার বসবাস। আর এখানে প্রাকৃত নাগরিক জীবন সবকিছুর খেলাজগৎ—নদীর পার গড়া ভাঙা পথহাঁটা। সাম্প্রতিক জীবনের ভয়াবহ রূপ প্রকাশ করার পরও একটা শান্ত শীতল সময়ের কথা বলছেন কবি। কিন্তু কবি এই বয়ানে জীবনকে একেবারে প্রাকৃতজীবনের লোকগাথা দিয়ে সঞ্জীবীত করতে পেরেছেন। যারা 'ভাঙা জাহাজের ছবি' পার হয়ে এসে জীবনের ছবি এঁকে নিতে পারে বুকে। তারা ঘরেও ফেরে না যে সব মানুষ। সময় 'সবুজ ডাইনি' হয়ে ঢেকে দেয় ভোরবেলা। আর এই রকম আচ্ছন্নতায় পৃথিবীর উপকণ্ঠে ঘুমিয়ে যায় সেই সব জীবনের সকল সরঞ্জামসহ খোলা চুলে প্রকৃতির রোদে।

সময়কে এই ভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ভেঙেছেন গড়েছেন। আর এই ভাঙাগড়া কিন্তু একদিকে নাগরিক জীবন আর অন্যদিকে প্রাকৃত জীবন এই দুইয়ের টানাপোড়েনে। কখনও তীব্র ব্যঞ্জনায় কখনও সরল বাক্যে। এখানে রণজিৎ দাশ বাচন আর পরাবাচনের মধ্য দিয়ে, সংকেত ও প্রকরণ দিয়ে, সময় ও জীবনের দ্বিবাচনিকতায় ফুটে তুলেছেন জীবনের গান—জীবনবন্দনা। 'সময়, সবুজ ডাইনি' কবিতার প্রতিটি স্তবকে এই ছবি এঁকেছেন রণজিতের মতোই। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য—তাঁর কবিতারও।

সোনার খনির লোভে

''কবি ও পড়ুয়ার সৃজনধর্মী বিনিময় নতুন উদ্যমে শুরু হয় আরো একবার। শুরু হয়ে যায় মহানাগরিক বৈদগ্ধ, চাতুর্য ও যান্ত্রিকতার প্রতিস্পর্ধী নতুন নির্মিতির সন্ধানও; মূল্যবোধের উৎস হিসেবে পুনর্নির্মানের আকুতি নিয়ে জেগে ওঠে আদিকল্প, প্রত্নকথা, লোকপুরাণের ঐতিহ্যবাহিত অনুপুঙ্খগুলি।''[৬০]

কবিতার জগৎ নিয়ে সমালোচক এই মন্তব্য করেছেন। আজ অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তী কবিতা নিয়ে যে ছদ্মজগৎ বা পরাজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। অবক্ষয়ী আধুনিকতা উন্মূল করে দিচ্ছে সমস্ত মূল্যবোধ, সময়বোধ, ঐতিহ্য, ইতিহাস, জীবনবোধ, সমাজবোধ, এর বিপরীতে কিছু কবিরা লৌকিক পুরাণ, পরম্পরা, প্রাকৃতজীবন আর প্রত্নকথা লোককথা দিয়ে উত্তরণের চেষ্টা করছেন। এই রকম একজন শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রণজিৎ দাশ।

কবির 'সোনার খনির লোভে' কবিতাটি সেই জীবনবোধ ধারণ করে আছে। কবিতাটির শুরু এভাবে—

''আমি তোমার কাছে এসেছি সোনার খনির লোভে—
লাইব্রেরির মাঠে বসে মেঘ ও সূর্যাস্ত দেখতে নয়।''

এখানে যে অভিব্যক্তি বা সংকেত দিচ্ছেন তার গভীরতা অনেক সুগভীর, মানুষের এই পৃথিবীতে কবি এসেছেন 'সোনার খনির লোভে'। এই পৃথিবীর লক্ষকোটি মানুষ মূল্যবোধহীন বেপরোয়া নাগরিক জীবনকে বরণ করে নিয়ে মরে মরে বেঁচে আছে। কিন্তু কবি এই রকম একঘেয়েমির স্রোতে জীবন কাটাতে চান না কোনো মুহূর্তে। বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের সামনে বসে সময় কাটাতে তিনি চাননি কখনও। কারণ কবির কাছে জীবনের পাঠই আসল জ্ঞানচর্চার মাঠ—সোনার খনিও

এই বয়ানের ভেতরে একটা জিনিস পরোক্ষভাবে কাজ করছে যে মানুষের জীবনের সময়সীমা কম বা বড় সংকীর্ণ। এখানে অবহেলা করে কাটানোর সময় নেই কিন্তু। কারণ কবির গভীর বিশ্বাস মানুষের বিরহে কেঁদে কাটাতে হয় বাকি জীবন। তাই কবি সোনার খনির মহামূল্য ধাতু দিয়ে জীবনটাকে 'সোনালি' করতে চান। প্রথম এই দুটা লাইনে এই গভীর জীবনচেতনা দিচ্ছেন। কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকের দীর্ঘ বয়ানে তুলে ধরছেন জীবনের নতুন মুখোশ পরা রূপ—

''বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আমার ঘোড়া, একটা ক্লান্ত, হতাশ ঘোড়া
বহু পথ-বিপথ ঘুরে, পাহাড়, জঙ্গল, আগ্নেয়গিরি,
জোয়ারভাঁটা, বাউলগান পেরিয়ে সে আমাকে নিয়ে এসেছে তোমার কাছে।
কোনো ম্যাপ নেই আমাদের, কিংবদন্তি ছাড়া
কোনো কম্পাস নেই আমাদের, উল্কাপুচ্ছ ছাড়া
অনেক গোলাপখামার, হারেম ও হোলিখেলার দেশ অতিক্রম করেছি আমরা
কাংড়া চিত্রমালার ভিতর পথ হারিয়েছিলাম আড়াই বছর
দেখেছি এমন রাক্ষুসে আয়না, যা গ্রাস করে কিশোরীকে, উগরে দেয় বৃদ্ধাকে

দেখেছি এমন নগর, যেখানে দেবতারা ভিক্ষে করেন শোক
নক্ষত্রজ্ঞান উপেক্ষা করে, ফসিলস্তর, মিনার
ও স্বপ্নাদেশ এড়িয়ে, আমি কেবল খোঁজ করেছি
জলে ভেজা বালিতে, লুকোনো জ্যোৎস্নায় ঈষৎ স্বর্ণাভ গুঁড়ো দেখা যায় কিনা—
সুখ নয়, দুঃখ নয়, পাথর খুঁড়ে সোনা পাওয়াই আমার উদ্দেশ্য।"

অবক্ষয়ী আধুনিকতার বিকৃত নাচ, সমাজ বিশৃঙ্খলতা, নৈরাজ্যশীলতা, নির্বোধ চেতনা, উশৃঙ্খল জীবনচর্চার বাইরে কবি তাঁর পথকে রেখেছেন। এই পথই হল কবির ঘোড়া। যা কিন্তু ক্লান্ত, হতাশ হয়ে পড়েছে। কারণ সে এই পৃথিবীর কত পথবিপথ উঁচুনীচ চড়াই উৎরাই ভাঙাগড়া পার হয়ে আজ এখানে—এই সময়ে।

কিন্তু পর মুহূর্তে বলছেন যে তাঁর নিজস্ব কোনও মানচিত্র নেই—কল্পনাও নেই। আছে সেই পুরাতন কিংবদন্তি উলকাপুচ্ছ। কিন্তু এর পরও কবি কত সময় নদীর পার চর পার হয়ে দেখেছেন এই নগরে যে 'রাক্ষস আয়না' কিশোরীকে গ্রাস করে নিয়ে বৃদ্ধা করে দেয়। অর্থাৎ তার সমস্ত যৌবন শুষে নেয়—সোনার খনির লোভও। যেখানে আরাধ্য দেবতারাও শোক ভিক্ষা করেন নিজের কৃতকর্মের জন্য—সকল নক্ষত্রজ্ঞান উপেক্ষা করে। এই সব পার হয়ে গিয়ে খুঁজতে চান প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে নয়া জীবন। যে জীবন হবে একটা উদ্দেশ্যময়। কবিও গভীরভাবে জানেন জীবনটা প্রকৃতির দান। আর তাকে খুঁজে নিতে হয় সময়কে চাষ করে। এই গভীর বোধটাই কিন্তু কাজ করছে ভেতরে।

তারপর একটা কথা লক্ষ্য করার মতো যে এই স্তবকে কবি ব্যবহার করেছেন ঃ বাউলগান, কিংবদন্তি হারেম, রাক্ষস, দেবতা ইত্যাদি লৌকিক, লোকজীবনের অনুষঙ্গ পরম্পরা, ঐতিহ্যপ্রিয়তা। এইসব শব্দ সংযোজনে প্রমাণ করে কবি আবার ঐতিহ্যের পথ ধরে নিজস্ব ঘোড়ায় ফিরে পেতে চান সোনার খনি। অর্থাৎ উজ্জ্বল জীবন যেখানে প্রকৃতি সবচেয়ে নিবিড়—প্রাকৃতও। নাগরিক জীবনের হতাশা, বিষণ্ণতা, ক্লান্তি পার হয়ে গিয়ে কবি একটা আশ্রয় চান। যে আশ্রয় হবে নিরাপদ আর সৌন্দর্যপূর্ণ। তবে তারপর কবি বলছেন—

"দীর্ঘ, নিষিদ্ধ এই যাত্রা। খাদ্য ও পানীয় নিঃশেষিত—
ঘোড়ার মুখে যে ফেনা উঠছে তা সমুদ্রের না মৃত্যুর আমি জানি না
আমার শরীর জুড়ে যে ক্ষত তা শ্লেষের না সান্ত্বনার আমি জানি না"

দ্বিতীয় স্তবকে যে পথের কথা বলেছেন কবি। পরবর্তী স্তবকে তিনি স্বীকার করছেন এই যাত্রা দীর্ঘ আর নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কারণ একঘেয়েমি পথের বিপরীতে তার জায়গা। আর পাথেয় নিঃশেষিত এখানে।

দ্বিতীয় তৃতীয় লাইনে বলছেন বিশাল দার্শনিক বক্তব্য। 'ঘোড়ার মুখে যে ফেনা উঠছে'—এই ঘোড়া হল আজকের পথহাঁটা নতুন প্রজন্মের পথ নির্মাণ। এই পথে যে সব বুদবুদ উঠছে তা কী সমুদ্রের মতো নাকি মৃত্যুর মতো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আর শরীরের মধ্যে যত সব কলঙ্ক জখম তা কি শান্ত্বনার নাকি শুশ্রূষার? কবি বুঝতে পারছেন না। অর্থাৎ আজকের পথ কীরকম কন্টকময় যন্ত্রের প্রভাবে সকল পথও যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমরা কী রকমভাবে বেঁচে আছি বা বেঁচে থাকি এই বার্তার সংকেত দিচ্ছেন। তারপর কবি কবিতার প্রথম দু'টি লাইন বা স্তবক উল্টো করে বললেন—

"লাইব্রেরির মাঠে বসে ফরাসি কবিতা শুনতে আসিনি আমি
আমি তোমার কাছে এসেছি সোনার খনির লোভে—"

কবি এখানে এসেছেন জীবনকে চাষ করে সমৃদ্ধ করতে। লাইব্রেরির মাঠে ফরাসি কবিতা পড়ে সময় কাটাতে আসেননি। অর্থাৎ শুধু কবিতার মধ্যে ডুবে থাকলে হবে না। এ জীবনটা বড় বিশাল— অসীম। এই সময়টা বড় নিষ্ঠুর বড়

দয়াহীন। এখানে কল্পনার মধ্যে এলসেসিয়ান হয়ে থাকলে হবে না। কারণ নিজস্ব সোনার খনির থেকে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে না গিয়ে করতে হবে আত্মসন্ধান। এই আত্মসন্ধানের কথাই বলছেন এখানে কবি। মফস্বল, নাগরিক, মহা-নাগরিক জীবনের কাছে হেরে গেলে 'সোনা পাওয়া' বড় কঠিন। আর এই সোনা কিন্তু খুঁড়ে পেতে হয়। স্রোতের মধ্যে জীবন বেসে দিলে হবে না। নাগরিক জীবনের আক্রমণে ধ্বংস অবসাদ ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে কিন্তু এই প্রগাঢ় ঘোষণা। কিন্তু 'সোনার খনির লোভে' কবিতার শেষ স্তবকের মধ্যে দেখি এক ধরনের প্রত্যাবর্তন এক ধরনের না পাওয়া, অভাব, নিরাশা তার মধ্যে কাজ করছে। অন্যরকম জীবনের প্রকাশ—

> "যদি না পাই,
> নিঃশব্দে ছেঁড়া টুপিটি তুলে নিয়ে,
> ঘোড়ার লাগাম ধরে ফিরে চলে যাবো।"

এত পথচলা পথহাঁটা এত দিনের জীবনচর্চা চর্যার পর যদি না পান 'সোনা' বা 'সোনার খনি' তবে ফিরে যাবেন। আর এই যাওয়াটা নিঃশব্দে। আর যে টুপিটি মাথাকে রোদবৃষ্টি থেকে বাঁচায়। সেই ছেঁড়া ছাদ নিয়েই চলে যাবেন। আর এই যাওয়াটা নিজস্ব ঘোড়া অর্থাৎ পথ আর সময়কে ধরে নিয়ে।

কিন্তু এই যাওয়াটা হেরে গিয়ে নয়। এই ফেরাটাও কিন্তু হেরে যাওয়া নয়। কারণ খুব সচেতনভাবেই কবি অন্য রকমভাবে নিজস্ব পথ/ঘোড়া সময়ের পথ ধরে নিয়ে যাবেন ফিরে নিজেকে। এখানে Robert Lee Frost এর 'Stopping by Woods on a Snowing Evening' এই বিখ্যাত কবিতার শেষ একটি লাইনের কথা একেবারে উপযুক্ত উদাহরণ। Frost এর ভাষায় রণজিৎ দাশও চান—

> *"And miles too go before I asleep."*[22]

তোমার স্নানের দুর্গ

> *"সেই প্রথম থেকেই তিনি (রণজিৎ দাশ) সময়কে, ইতিহাসকে মান্য করেন—তাঁর কবিতা শুধু আত্ম-ইতিহাসের কবিতা নয়, সেখানে ছায়া ফেলেছে তাঁর নানা বয়সের অভিজ্ঞতায় পাওয়া মানব ইতিহাসের ঘটনা। সেইসব আবর্ত থেকে কেমন করে উঠে দাঁড়াতে হবে, তার খুব স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া আছে তাঁর কবিতায়।"*[৬১]

সমালোচকের এই সরল মন্তব্যের মধ্যে কবি রণজিৎ দাশের কবিতায় 'মানব ইতিহাসের ঘটনা'-র ছবি পাই। আর সেই সব অবর্তের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে সময় আর মানব ইতিহাস। সেই বোধ সম্পৃক্ত একটি উজ্জ্বল কবিতা হল 'তোমার স্নানের দুর্গ'। এই কবিতাটির শুরু এভাবে—

> "তোমার স্নানের দুর্গ নিঃশব্দে পাহারা দেয়
> সময় ও দূরত্বের কূট অঙ্কগুলি।"

এই প্রথম স্তবকের তাৎপর্য, চিন্তা কিন্তু সময়চেতনার কথাই প্রকাশ করে। কেন না সময় ও সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলি তো পরিবর্তন বিবর্তন করে অন্য একটা রূপ ধারণ করে একই সময়ের শরীরে অনেক খণ্ড সময় হয়ে। কখনও বিপরীতে কখনও বা হিতে, কখনও অনুকূলে কখনও বা প্রতিকূলে কূল ভেঙে গড়ে এগিয়ে যায় সময় তার নিজস্ব মাপ আর অঙ্কের সূত্রানুযায়ী। আর এই সময়ের জলে স্নানাগারে স্নান করে মানুষ নিজেকে পবিত্র পরিণত পরিপূর্ণ করে, জীবনকে চাষ করে। তারপর দ্বিতীয় স্তবকে কবির কণ্ঠ বাঁক পরিবর্তন করল—

''অস্ফুট গানের শব্দ লক্ষ্য করে গিয়েছিল যারা,
তাদের কঙ্কাল, দেখি, ইতস্তত পড়ে আছে
বীজগণিতের কিছু পরিত্যক্ত চিহ্নের মতন—
শ্লেটপাথরের দীর্ঘ উপত্যকা জুড়ে।''

সময়ের বিচিত্র উপলব্ধি এখানে উঠে আসে। সেই সময়ের স্রোত থেকে সরে গিয়ে অন্যত্র যারা গেছিল অন্যকোনও লক্ষ্যের দিকে তাদের কঙ্কাল ছবি পড়ে রয়েছে আজ কিছু বর্জ পদার্থের মতো রুক্ষ মাঠের মতো জায়গা জুড়ে। এই বয়ানের মধ্যে পাই শব্দ আর নৈঃশব্দ্যের বৈপরীত্ব। সময়ের বাঁক পরিবর্তন দেখাতে গিয়ে এই বয়ানের উপস্থাপনা। একদিকে লক্ষ্য অন্য দিকে যাত্রা, একদিকে শব্দ আর অন্যদিকে গান, একদিকে পথ অন্যদিকে অঙ্ক এই সব মিলিয়ে সময়ের একটা সামগ্রিক ছবি দেখাতে চান কবি। এই বোধটা তৃতীয় স্তবকে আরও প্রকট—

''ভুল করেছিল এরা, নিশীথস্নানের
দ্বিঘাত সংকেতগুলি বুঝতে পারেনি।'
—কমল স্যারের মতো, অন্ধকার স্থূলঘরে বিড় বিড় করি।
আকাশের ব্ল্যাকবোর্ডে, সারারাত, ভাঙা চক দিয়ে
রোহিনী, বিশাখা, মঘা, সপ্তর্ষিমণ্ডল
আঁকি ও বিনষ্ট করি। এই ব্যাপ্ত নভোচক, সৃষ্টি ও প্রলয়
তোমার আমার দেহমিলনের সূত্রে আবর্তিত—
এ সত্য জানার পর, বৃষ্টিতে স্নাতক
শালজঙ্গলের রাশ হাতে ধরে ক্রমশ এগোই
তোমার দুর্গের দিকে। দুর্গ, নাকি, কবরের মোম?''

এই স্তবকে আরও একদাপ এগিয়ে গিয়ে কবি বললেন যে সামাজিক ও সমসাময়িক জীবনের ছবিটা ক্রমশ জটিলতায় আচ্ছন্ন হচ্ছে। ঐ সব মানুষেরা পৃথিবীর মানবসৃষ্টি অন্ধকারকে না বুঝে তাতে স্নান করছে। তারা তো বোঝে নি তার দ্বিঘাত সংকেতগুলি। কিন্তু কবি এই অন্ধকারকে বোঝাতে গিয়ে রোহিনী, বিশাখা, মঘা ও সপ্তর্ষি মণ্ডলের মতো মানুষের জীবনের ছবি আঁকেন। আবার বিনষ্টও করেন। এই ভাঙাগড়ার মাঝখান দিয়ে একটা চেতনা দিতে চান। এই চেতনাই হল কবির অন্বিষ্ঠ।

তারপর বলছেন যে কবির প্রিয়ার সঙ্গে দেহমিলনের সূত্রের কথা। এই ধ্বংস ও সৃষ্টি প্রিয়ার আর কবির মধ্যেও আছে। এই গূঢ় সত্য জানার পরও কবি এগিয়ে নিতে চান জীবন আর সময়কে ভেঙে গড়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে—প্রিয়াকেও। সেই দুর্গের দিকে। যেখানে তার প্রিয় মানুষ শুদ্ধ ও পবিত্র হয়—সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের পূর্ণতাসহ। কিন্তু কবি জানেন না যে এটা দুর্গ না কবরের মোম? কারণ আজ সময় নিজেই আগুন আর নিজেই জ্বালানি। সেই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে কবি যখন জীবনের কথা বলবেন তা কতটুকু জীবন্ত হবে সেই কথাটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু দুর্গ না কবরের দিকে যাত্রাটা কোনও ধরনের আত্মসমর্পণ নয়। এটা জীবনের সন্ধান। জীবন আর সময়ের দ্বিরালাপ। যে দ্বিরালাপ জীবনের সকল অনুষঙ্গ ও প্রসঙ্গের দ্যোতনা টেনে এনে একটা অখণ্ড সময়ের কথা বলে, —অভিজ্ঞতারও। তবে দৈনন্দিন জীবনের দিনগুলির মূল্য সবচেয়ে বেশি এখানে। এই যে বাস্তবতা তা শুধু কবির একা উপলব্ধি নয়। তা কবির হয়ে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের। তারপর কবি নিজেকে আরও গভীরভাবে মেলালেন—

''ক্ষিপ্র গেরিলার মতো, অতঃপর, একা একা, তোমার স্নানের
পরিখা, নিতম্ব, জল, ভ্রূণ, প্রহেলিকা
নির্ভুল সমাধা করে যতই এগুতে চাই,

রক্তবীজ অঙ্কগুলি ততই গজায়।
প্রতিটি বিচ্ছেদ থেকে দশলক্ষ অঙ্ক উড়ে আসে—"

সময়ের এই গতি ক্ষিপ্র গেরিলার মতো। তারপর কবি একা একা প্রিয়ার স্নানের সকল অনুষঙ্গকে অতিক্রম করে নির্ভুলভাবে এগিয়ে যেতে চান। কিন্তু সময়ের জীবনের ইতিহাসের অঙ্কগুলি গজিয়ে উঠে। আর তিনি এখানে দেখতে পান প্রত্যেকটা বিচ্ছেদ থেকে দশ লক্ষ অঙ্ক উড়ে উড়ে এসে কবিকে আক্রমণ করছে। কবি কীরকম করে এখানে বাঁচবেন নিজেকে নিয়ে—পবিত্র হয়ে মুক্ত করে নিজের সত্তাটাকে নিয়ে। এই অঙ্কের অর্থাৎ সময়ের অসুখ সমাজের গ্লানি সত্তাহীনতা, অস্তিত্বহীন ব্যক্তিত্বহীন জীবনের কঙ্কাল চারদিকে । তিনি চান যাবতীয় বিসঙ্গতিকে পার হয়ে গিয়ে এগিয়ে যেতেন সময়ের সঙ্গে জীবনকে নিয়ে। কিন্তু সমস্ত কূট অঙ্কগুলি কবিকে পঙ্গপালের মতো ঘিরে আছে। এটা তো আজকের সময়ের সমাজের জীবনের পৃথিবীর কথা। এটাই তো আজকের বাস্তবতা। তারপর দেখি নাগরিক জীবনের প্রসঙ্গের অন্তঃসার-শূন্যতা—

"হতাশ সরাইখানা ছেয়ে যায় ঘোর পঙ্গপালে।
চুরুটের ছাই দিয়ে মদের গেলাসে-লেখা অন্তিম মীমাংসা ঙ্ম
'চুলের মুঠিটি ধরে টেনে আনো, নগ্ন অবস্থায়'—
শূন্য টেবিলের নিচে, জাদুরুমালের পাশে, ভেঙে পড়ে থাকে।"

নাগরিক জীবন নৈরাশ্য ও যান্ত্রিকতা তাড়িত—এবং বিষণ্ণতা বিষাদ আচ্ছন্ন! সকল ভোগ পাওয়ার মুহূর্তে এখানে গভীর হীনমান্যতা শূন্যতা যে লুকিয়ে থাকে কীরকমভাবে! তা দেখাতে চেয়েছেন তিনি। হতাশ হয়ে আছে সরাইখানা—চারদিকে পঙ্গপালের মতো মানুষের অযথা ভিড়। আর সকল কষ্ট, যন্ত্রণা, গ্লানি, না-পাওয়া, কান্না, যন্ত্রণা, নৈরাজ্যের বিষাদ, পাপ ইত্যাদি নেতিবাচক জীববোধের একই অন্তিম-মীমাংসা—মদ। যেখানে সমস্ত কিছু আত্মসমর্পণ করে নেয় এই সব অসুখ ভরা রোগী নাগরিক মানুষের। আর কখনও বা বেশ্যার আশ্রয়। অর্থাৎ বেশ্যার কাছে শান্তির খোঁজ। এই যে নাগরিক জীবনের অবস্থা বাস্তবতা তার জ্বলন্ত রূপ ফুটে উঠেছে রণজিৎ দাশের কবিতায়— অস্থির উশৃঙ্খল জীবনের সমস্ত অনুষঙ্গ প্রসঙ্গসহ। কিন্তু এই কবিতার শেষ লাইনের মধ্যে কবি সমস্ত কিছুকে এক বন্ধনে বেঁধে নিয়েছেন। উপরের সকল বয়ানকে এক সূত্রে বেঁধে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন এখানে—হয়তবা একটা সিদ্ধান্তও দিয়েছেন। কবিতাটির সমাপ্তি এরকম—

"সময় নিঃশব্দে কমে, দূরত্ব কেবলি বেড়ে যায়।"

ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিকতার উত্তরণের মধ্য দিয়ে কবিতাটি শেষ। আসলে পুরো কবিতাটিই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতাপূর্ণ অভিব্যক্তি। নিজের বাস্তবতা কেউ অস্বীকার করতে পারবেও না—পারেনা। তাই তো স্বীকার করছেন কবি এতসব কিছু। এবং সবকিছুকে খুলে খুলে দেখাতে পেরেছেন। আসলে কবি জানেন সময় যে ক্রমে সংকীর্ণ হচ্ছে মানুষের জীবনের থেকে নিঃশব্দে অর্থাৎ কোনও রকম শব্দ ছাড়া। মানুষ তা বুঝতে পারছে না। আর মানুষের ব্যক্তিত্ব, অস্তিত্ব, সত্তা আর জীবনের সঙ্গে যে দূরত্ব বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। সেই বার্তা দিয়ে যেতে চান কবি এই অন্তিম লাইনে।

কবিতাটিতে একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো যে কবিতাটি শুরু ও শেষ হয়েছে সময় ও দূরত্বের টানাপোড়েনে। আর এরকম উপস্থাপনার একটা প্রধানতম কারণ হল কবি সময়কে খুব ভালো করে অনুভব উপলব্ধি করতে পেরেছেন—সময়ের এই দূরত্বকেও। তার মাঝে আছে জীবনের সমস্ত অনুষঙ্গ ও ব্যঞ্জনা।

সুড়ঙ্গ

''স্বর্ণলুব্ধ সভ্যতার মৃগয়াক্ষেত্র সম্পর্কে রণজিৎ যেন অনবরত পাঠ থেকে পাঠান্তরে নিয়ে যেতে চান আমাদের আর পাঠকৃতি থেকে এমন এক কবির আদল তৈরি হতে থাকে যিনি ভ্রষ্টতার সহস্র আয়োজনের মধ্যে একটা তমোঘ্ন সতর্কতা নিয়ে প্রহরীর ভূমিকা নিতে চান। এদিক দিয়ে 'সুড়ঙ্গ' কবিতার পাঠকৃতি বুঝিয়ে দেয়, কবির অবস্থান একক; যৌথ চেতনার তটরেখা রয়ে গেছে অনেক দূরে। তবু এও আসলে অর্ধসত্য, কারণ প্রতিবাদী হয়েও নতুন সূচনায় যারা অবিশ্বাসী, সেই ত্রিশঙ্কু-প্রজন্মের উচ্চারণ কোথাও ফুটে ওঠে যেন—চিনিয়ে দেয় তাদের কূটাভাস-অক্রান্ত জীবনের গভীর গভীরতর সংকটকে''। [৬২]

সমালোচক এই বয়ানের মধ্য দিয়ে রণজিৎ দাশের কবিতার একটা দিকের কথা গভীরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন—তাঁর পাঠকৃতিতে কীরকম ভাবে লুকিয়ে আছে 'জীবনের গভীর গভীরতর সংকট'-এর কথা। এই বার্তার পেছনে যেন লুকিয়ে আছে তার থেকে মুক্তি পাওয়ার এক চেতনার কথা। 'সুড়ঙ্গ' কবিতায় তা সম্পূর্ণ মাত্রা পেয়ে গেছে। কবিতাটির শুরু এরকম—

''নিজের খুব কাছে যেতে পারিনি এখনো, পুলিশ রয়েছে।''

মানুষের সবচেয়ে বড় 'সত্যভ্রম' এটাই যে মানুষ নিজে সবচেয়ে বেশি সচেতন! এবং নিজেকে সবচেয়ে ভালো করে জানে চিনে বুঝে! আসলে তা নয় কিন্তু। কারণ কবি বলছেন মানুষ তার নিজের কাছে কখনও যেতে পারে না। তার বড় কারণ চারদিকে 'পুলিশ রয়েছে'। এই পুলিশ অর্থাৎ মানুষের বাইরের আর ভেতরের বিপরীত সত্তা। যদি Hamlet-এর ভাষায় বলি 'To be or not to be'-র সেই সত্তা। তাই আমরা নিজের কাছে পৌঁছাতে পারি না। কিন্তু এটা আবার নাগরিক জীবন মহানাগরিক জীবন বা প্রাকৃত প্রান্তীয় জীবন হোক না কেন। সকল জায়গায় প্রযোজ্য এই সংকেতটা। হতে পারে কোথাও একটু হালকা বা পাতলা আবার কোথাও গভীর। তবে এই অস্তিত্বযুদ্ধ সব স্থানে সক্রিয় সজীব—প্রতিটা মুহূর্তে।

তারপর জীবনের অনুষঙ্গ সামগ্রী টেনে আমাদের চারপাশকে খুব সুগভীর করে দেখাচ্ছেন যে আমাদের 'নিজের' চারদিকে কী নিষ্ঠুরতম প্রহরীর দল, পিঞ্জর, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি—

''অনেক বছর ধরে গোপনে চোরাপথগুলির ম্যাপ এঁকে চলেছি। কিন্তু সেই
নিষিদ্ধ মানচিত্র জুড়ে এত অজানা ফাঁদ, মাইন, কঙ্কাল, পরিখা, চোরাবালি,
ট্যাংক, অন্ধকূপ এবং উন্মাদ-আশ্রম যে ভরে বুক শুকিয়ে যায়। আরো সমস্যা
এই যে সমস্ত পথের মুখ এক অদ্ভুত কুয়াশায় ঢাকা। নিওন আলোর কুয়াশা।
যার ভিতর চাইলেই পাওয়া যায় ব্যক্তিগত বিমান, ব্যাংক, হারেম, পিয়ানো,
সমুদ্রসৈকত। এক অবাধ, অনন্ত আত্মসন্তুষ্টির রঙিন জগত। সেখানে কোনো
বাধানিষেধ নেই, বরং অদৃশ্য প্ররোচনা এবং মদত রয়েছে। কারণ এগুলি
আর কিছুই নয়, নিরীহ বন্ধুর মতো দূর থেকে, এক বিপজ্জনক, নিঃসঙ্গ বন্দীর
কাছে সিগারেট ও চিঠি পাঠানো মাত্র।''

এই দ্বিতীয় স্তবকে সুগভীরভাবে প্রকাশ করলেন সত্তার সাথে অপরতায় সংগ্রামকে। নিজের থেকে পালিয়ে সরে সরে বেঁচে আছি আমরা। কিন্তু যে দিকে যাওয়ার কথা নয় যে মানচিত্রে আমরা সেই নিষিদ্ধ ভূগোলেই গিয়ে বেঁচে আছি আমরা। যা আমাদেরকে চারদিক দিয়ে ঘিরে আছে মাকড়সার জালের মতো। অর্থাৎ মানুষের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের চারদিকে যে সব গাছ তাকে আশ্রয় দিত বা ঘিরে রাখত সেই সব গাছের বদলে আগাছা বেড়ে যায়।

আজ এই বাহুল্য বর্জ পদার্থ আগাছা-ই জীবনের সকল মাঠ ঘিরে আছে—প্রতিটা পথও। সেই চরম সত্যকে কবি প্রকাশ করেছেন নিজস্ব ভাষায়।

এই অর্ধসত্য, সত্যহীন, বাস্তবতাহীন জীবনে এত কুয়াশা, চোরাবালি, অন্ধকূপ, মিথ্যাআত্মসন্তুষ্টির রঙিন জগত, প্ররোচনা, অজানা ফাঁদ, ব্যাঙ্ক, পিয়ানো ইত্যাদিতে ব্যস্ত আবৃত জীবন আমাদের আসল পরিসর। এই বাস্তবতাপূর্ণ জীবন কবির কাছে নিরীহ নির্দোষ বন্দী বন্ধুর কাছে সিগারেট ও চিঠি পাঠানো মাত্র। আর ঠিকই আমরা চারদিকে এত জালে আবৃত, এত মায়াজালে, এত কণ্টক, এত দেয়ালে যে আমরা নিজের কাছে যেতেই পারি না। এতসব প্রতিবন্ধকতা কবির মতে পুলিশ—নিজের কাছে যেতে দেয় না। তারপর কবি বলছেন শেষ স্তবকের মধ্যে আবারও—

> ''প্রকৃত নিজের কাছে যাওয়া এক অকল্পনীয় অন্তর্ঘাত। সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলেছি,
> কিন্তু চতুর্দিকে পুলিশ রয়েছে।''

এখানে বাইরের আমি আর ভেতরের আমির দ্বন্দ্বযুদ্ধের থেকে অন্যরকম জটিলতর যুদ্ধ। সত্তা ও অপরতার দ্বন্দ্বসংগ্রাম আছে তাতে। কিন্তু অন্যরকম। এখানে সবচেয়ে আগে 'মানুষের সচেতনতার কথা' বলছেন। চারদিকের জাল, সীমানা, বৈপরীত্য, মুখোশকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই 'আমি'র দ্বন্দ্ব ও সত্তা অপরতার সংগ্রামের কথা বলছেন যে আমরা নিজের কাছে কেন যেতে পারি না। এখানে কবিতাটির উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে যায়—কবির সুড়ঙ্গ খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে।

আমেরিকান লাইব্রেরিতে একদিন

> ''মনে পড়ে তোমার সেই মুখ। সেই হাসি, যা অশ্রুর সীমানা ছুঁয়ে আছে।
> সেই নৈঃশব্দ্য, যা সংগীতের চেয়েও বাঙ্ময়।'—হিরের আংটির বিদেশি
> বিজ্ঞাপনের এই ভাষায়, ঠাণ্ডা আমেরিকান লাইব্রেরির ভিতর, আমি তোমাকে
> নিঃশব্দে হেসে উঠতে দেখি। সেই হাসি, যা সত্যিই অশ্রুর সীমানা ছুঁয়ে আছে।''

উদ্ধৃতি দিয়ে রণজিৎ দাশ শুরু করেছেন এই কবিতাটি। প্রথম লাইনের মধ্য দিয়ে একটা দার্শনিক সংলাপ দিচ্ছেন। যেখানে ব্যক্তিগতবোধ থেকে নৈর্ব্যক্তিকতাবোধ বেশি সুগভীর। 'তুমি'র অস্তিত্বকে এনে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। এই তুমি কবির প্রিয়া কিংবা অপরসত্তা। তাকে কবি খুঁজে পেয়েছেন আমেরিকান লাইব্রেরিতে। যেখানে সে হেসে ওঠল। আর তার হাসির মধ্যে চোখের জলের সীমানাও ছেড়ে গেছে। তাঁর সেই অপর সত্তার নৈঃশব্দ্য সংগীতের চেয়েও বাঙ্ময়।

কিন্তু তার ভেতরটাকে বোঝাতে গিয়ে বাইরের মায়াজালকে ভেঙে দিয়েছেন। কারণ দার্শনিক এই বক্তব্যের মধ্যে বহুস্বর সুর পাচ্ছে কবির এই সুগভীর কণ্ঠে। তারপর আরও প্রসারিত করার জন্য নিজের বয়ানকে কবি বিবরণকে আরও সুন্দর করে টানলেন—

> ''আমি এখানে পড়তে এসেছিলাম নতুন আমেরিকান কবিদের লেখা ছোট,
> চৌকো কবিতা—যা অনুবীক্ষণের তলায় শূন্য কাঁচখণ্ডের মতো ঝকঝকে এবং
> বোবা। বাইরে কখন লাইব্রেরি ঘিরে ঘনিয়ে এসেছে মিছিল, টের পাইনি।
> হঠাৎ শুনতে পেলাম মার্কিন-বিরোধী স্লোগান, বিক্ষোভ, পুলিশগাড়ির
> সাইরেন। শুনতে পেলাম বহুদূর বাসস্টপে তোমার প্রতীক্ষার নৈঃশব্দ্য।
> কঠিন, ধাতব শব্দে লাইব্রেরির লোহার ফটক বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তে আমার
> জন্যে তৈরি হল এই রিডিং রুমের ফাঁদ। ইতিহাসের ভিতর মুখোশ, ভয়,

ক্রোধ, কোকাকোলা এবং বীজগণিতের ভূমিকা কী—এই প্রশ্ন গোলকধাঁধার
মতো ছড়িয়ে পড়ল ফাঁদটি জুড়ে। মিছিলের গর্জনশব্দে, বিজ্ঞাপণে, বাসস্টপে,
চৌকো কবিতায় ক্রমশ আরও ধারালো হয়ে উঠল তোমার মুখের প্রহেলিকা।"

এই স্তবকের মধ্যে কবি সময় আর মানুষের স্বরিরোধীতা ধরেছেন। মানুষ যে আসলে তার নিজেরই সবচেয়ে বড় প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিযোগী। এই জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে চান। 'শূন্য' 'চকচকে' 'বোবা' এইসব শব্দ নিছক আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি এগুলির আলাদা দ্যোতনা ও অর্থের বহুস্বর আছে আপন গভীরে। স্লোগান, বিক্ষোভ, পুলিশগাড়ির সাইরেন অর্থাৎ নাগরিক জীবনের ভিড়ের মধ্যেও কবি কোথাও বাসস্টপে তাঁর অপর সত্তার 'প্রতীক্ষার নৈঃশব্দ্য' শুনতে পান। যদিও কবি চারদিক দিয়ে বন্দি হয়ে গেছেন। এবং তাঁর জন্য অন্যরকম একটা 'ফাঁদ' তৈরি হয়ে যায়। এটাই তো মানুষের আজকের পরম বাস্তবতা। যেখানে সে যায় তার চারদিকে ফাঁদ তাকে ঘিরে রাখে। একটার খোলস ছাড়াতে না ছাড়াতে আরেকটা ফাঁদ নির্মাণ হয়। এই বন্দিত্বকে কেউ বুঝে না। কারণ তার রঙ রঙিন। যার ভেতর গভীর অন্ধকার—কালোও।

এইরকম শতচ্ছিদ্র বর্তমানের দিক থেকে মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন ইতিহাসের ভূমিকার দিকে। মেলাতে চাইলেন মুখোশ, ভয়, ক্রোধ, কোকাকলা ও বীজগণিতের ভূমিকা ইতিহাসের সঙ্গে কি? এই প্রশ্নটি গোলকধাঁধার মতো ঘুরতে লাগল নিজস্ব বৃত্তে এই ফাঁদের দশদিকে। দেখলেন আসলে হঠাৎ করে হয়নি। আমাদের এতদিনের বিষ মেশানে জীবনের প্রতিটা পথ আসলে বিষাক্ত, কণ্টকিত, গন্তব্যহীন, উদ্দেশ্যহীন। তাই অন্যের পথ জীবনচর্চা চর্যা শৈলী ইত্যাদি বরণ করে নেই বড় সহজে— নিতে হয় বলে। তাই ফাঁদে পড়ে বন্দি হয়ে ক্রমে পরিষ্কার দেখতে পাই ঐ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, ধোকা দেওয়া সত্তার 'মুখের প্রহেলিকা'—অর্থাৎ আসল ছবি। এটাই আমাদের জীবনের পরিণাম।

কিন্তু তৃতীয় বা শেষ স্তবকে এই ফাঁদকে আরও খুলে দেখাতে চাইলেন তিনি—

"বুঝতে পারি, এই ফাঁদ দর্পণ মায়াবী, যাতে মনে হয় এর সমস্ত বেরুবার পথ
ভিতরের দিকে। জানালায় ভেসে ওঠা বসন্তবিকেলের আলোর দিকে তাকিয়ে
থাকি কিছুক্ষণ। সবিকছুর মীমাংসা রণরক্তে, আমি ভাবি। ভাবি সেই
কোয়াণ্টাম-বিজ্ঞানীদের কথা, যাঁরা মনে করতেন, 'গভীরতর বাস্তবতা' বলে
কিছু নেই..."

কবি এসে বলতে চান যে মানুষ এইখানে 'দর্পণ-মায়াবী' ফাঁদ থেকে রক্ষা পায় না। কারণ এই ফাঁদের সকল পথই ভেতর দিকে। যত বার হতে চায় তত ভেতরে ঢুকে যায় প্রয়াসী, বন্দি। তখন ঠিক যৌবনের সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে ক্রমে। তখন কখনও বা মনে হয় সবকিছুই রণরক্তে মীমাংসা হয়। কিন্তু জীবনের শক্তিশালী সময়টার বিকেলে আর সেই বোধ থাকে না। তাই কবি কেয়ান্টাম বিজ্ঞানীদের আপেক্ষিকতাবাদের কথায় নিজের বয়ান তুলে ধরছেন যে এই পৃথিবীতে 'গভীরতর বাস্তবতা' বলে কোনও কিছু নেই।

আমাদের আসল রূপ 'দর্পণ মায়াবী' ফাঁদে যখন ধরা পড়ে তখন মনে হয় কোনও বাস্তবতাই গভীরতর নয়। এখানে এভাবে ফুটে উঠছে কবির বয়ানের বহুস্বর। এবং এই বহুস্বরের মধ্য দিয়ে একটা প্রতিবেদনে পৌঁছানোর চেষ্টাও করেছেন। আত্মপ্রতারক জীবনপথকে আত্মসচেতন পথ সন্ধানের প্রয়াস করেছে এই কবিতার ভেতর দিয়ে। এবং আমাদের জীবনের বাস্তবতার রূপও দেখাতে চেয়েছেন—অন্যভাবে অন্যদিকে।

ঈশ্বরের চোখ

''চিত্রপটের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক যখন উপলব্ধি করি, জীবন ও শিল্পের দ্বিবাচনিক সত্যও বুঝে নিই। রণজিৎ-এর কবিতা প্রমাণ করে তিনিও মূলত ওই নান্দনিক প্রত্যয়ের শরিক। কবিতার ব্যক্ত আকরণের মধ্যে সত্য নেই, সত্য আছে ওই আকরণের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক উপলব্ধিতে। তার মানে, শব্দমায়া তৈরি আসলে রণজিৎ-এর কাছে ঈপ্সিত বাস্তবে পৌঁছানোর সিঁড়িমাত্র।''[৬৩]

কবি রণজিৎ দাশের 'ঈশ্বরের চোখ' কবিতা পাঠের সঙ্গে এই মন্তব্যের সত্য ও বাস্তবতার মিল আছে। সমালোচক যেন এই কবিতার সত্যতা ও বাস্তবতা বিশ্লেষণ করেছেন। এই কবিতাটির জন্য মন্তব্যটি যেন একেবারে যথাযোগ্য। কবিতাটির শুরু হয়েছে এরকম করে—

''আমাদের শরীরের প্রতিটি ফুটোয়
জেগে আছে ঈশ্বরের চোখ''

এই হল প্রথম স্তবক। দুই লাইনের ভেতর দিয়ে যে ছবি এঁকেছেন তা তো চিত্রপট নয় শুধু—জীবন্ত জীবনের ছবি। এখানে একটা সুগভীর তীর্যক কটাক্ষ আছে লুকিয়ে। আমাদের শরীরের প্রতিটি ফুটো তো আসলে রেচন অঙ্গ—মল-ময়লা নির্গত হওয়ার জায়গা। সেই জায়গায় ঈশ্বরের চোখ থাকবে! কিন্তু সেটা অন্যরকম চোখ হবে নিশ্চয়। কবি বললেন আবার—

''ভিতরে চক্রান্ত, চাঁদ, নিহত বন্ধুর রক্ত, ক্রিমি, কীট, উলঙ্গ রাক্ষস
ভিতরে মুখোশ, জুয়া, নাচ, মদ, বেশ্যাদের হাসি''

ঈশ্বরের এই চোখ দিয়ে ফুটোর গভীরে দেখা যায় মানুষের অর্থাৎ আজকের মানুষের বাস্তব ও অতিবাস্তব রূপ। যেখানে চক্রান্ত, রক্ত, কীট, জুয়া, মদ, বেশ্যাদের হাসি ইত্যাদিতে পূর্ণ ভেতর। মানুষের ভেতরের ইন্দ্রিয় অতিন্দ্রিয় রূপ এবং অন্যদিকে চেতন অবচেতন ও অবদমন এই সকলের গভীরে নিত্য ক্রিয়াশীল বোধ ভাব ভাবনা চিন্তা পথ ইত্যাদিতে কাজ করছে ঐ সব জিনিস। এবং মানুষ মুখোশ পরে সকল রোগ খুঁত দাগ ঘা কলঙ্ক ইত্যাদি নেতিবাচক দিক থেকে অন্য একটা রূপ নিয়ে চলে সমাজের সামনে। যাতে কেউ আমাদের সেই অবক্ষয়ী রূপ দেখতে পারে না। এই যে অন্তর্ণাট্য অভিনয়। এটা তো আমি না তুমি না। এ তো অন্য কোনও মুখোশ পরা ব্যক্তি। যার কোনও বাস্তব ব্যক্তিত্ব নেই। সেই রূপটাকে মেকাপ খোলস খুলে দেখাতে চেয়েছেন এই চিত্রপটে ছবি এঁকে। বাইরের নাটক ও অভিনয় ভেতরের নাটক ও অভিনয় এই দ্বিবাচনিক দ্বন্দ্বে নিজেকে নিজের থেকে দূরে সরে নেই। অর্থাৎ নিজেই নিজের থেকে নিজের কাছে অন্য কেউ হয়ে যায়— অন্যকোন বিপরীতসত্তা। এই গভীর বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন এখানে। তারপর তৃতীয় স্তবকে বলছেন—

''তিনি দেখছেন, ঠিক যেভাবে বালক তার
পিতৃঘাতকের সঙ্গে নিজের মায়ের
অবৈধ সঙ্গমদৃশ্য দেখে''

এইসব দৃশ্য বাইরে থেকে কেউ দেখে হয়তবা ভগবান বা ঈশ্বর। নিজের থেকে সরে গিয়ে অন্যকোনও সত্তা হয়ে গিয়ে কেউ যেন অভিনয় দেখছে—নিজস্ব সত্তা যেন এখানে শূন্য হয়তবা শূন্যের চেয়েও শূন্য। আমাদের রক্ষক চালক ঐতিহ্যকে হত্যা করে বাইরে থেকে আমাদের ব্যক্তিসত্তাহীনতার অবৈধ্য সঙ্গম দৃশ্য দেখছে। এখানে আমরা নিরুপায়। কারণ প্রতিটা ফুটোয় তো নেতিবাচক বিপন্ন ধ্বংসাত্মক প্রত্যয় ক্রিয়াশীল—ইতিবাচকহীনতা। সেখানে তো মানুষ নিরুপায়

হবেই। আমাদের সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—সকল আশ্রয়। আমরা কিছু করতে পারি না। এই সুগভীর বার্তা দিয়ে যেতে চান কবি এই সাত লাইনের ছোট্ট কবিতার ছবিচিত্রে ও চিত্রকল্পে—কারুকার্যেও।

আমাদের পূর্বসূরির সকল অস্তিত্ব, ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে ঘাতকেরা খুন করছে প্রতিমুহূর্তে আর আমাদেরকে অনাথ করছে। তাই অসহায় হয়ে আমরা শুধু দেখছি সেই দৃশ্য যা বড় বেশি কষ্টদায়ক, হৃদয়বিদারক। এই দৃশ্য বা কবির উপমা অসহনীয়। তবে কিন্তু এটাই আজকের চরমতম বাস্তব। আর কিছুই করার নেই এখানে, এই চক্রব্যূহের ভেতর থেকে মুক্তিও নেই।

আগুন ও জলের কবিতা

''একদিকে আগুন এবং জল পিপাসা এবং অন্তঃস্নান আর অন্যদিকে গ্রহীতাসত্তা ও কথকসত্তা। দুইয়ের পার্থক্য প্রতীতি এবং ঐক্যবোধ সমান সত্য। আর, সব কিছুর ভেতর দিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অনুরণিত হচ্ছে উপস্থিত ও অনুপস্থিত আর সময় ও পরিসরের নিগূঢ় দ্বিবাচনিকতা।''[৬৪]

সমালোচকের মতে এই কবিতাটি কবির একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। যেখানে কবি নিজের পৃথিবীকে সুগভীর করে তুলেছেন আরও। এখানে রণজিৎ দাশ যেন আরও বেশি পরিপূর্ণ—পরিণতও। কবিতাটির শুরু এরকমভাবে—

''গ্রীষ্মই তোমার ঋতু। তোমার সন্ত্রাস।''

প্রথম লাইনের মধ্যেই জীবনের উষ্ণতা উগ্রতা ও সন্ত্রাসের কথা বলছেন। এই 'তোমার' শব্দটির মানে এখানে সময়। এবং সময়কে ছেড়ে গিয়েও এই কবিতার বিষয়বস্তুকে আধার করার উপাদান। তারপর দ্বিতীয় স্তবকে বলছেন—

''আগুনের অন্তর্দাহে, অন্ধ পিপাসায়
তোমারই শাসন চলে এ শহরে, তাই
প্রতিটি রাস্তার বাঁকে
ছোট ছোট ঘূর্ণি—যেন বাতাসবালিকা—তারা স্কুলবালকের
হাত ধরে নিয়ে যায় দিশাহীন রৌদ্রে, তেপান্তরে।''

আদিমকালের সেই আগুন ও জল আজকে তার রূপ অন্যরকম অর্থ, মানে—সংজ্ঞাও। আর আজকের এই বিবর্ণ আগুন ও জলের মধ্যে আমাদের বেঁচে থাকা। এখানে কেবল এই মানে অর্থ সংজ্ঞাশীল আগুন ও জলের শাসন চলে। তাই প্রতিটি রাস্তার মোড়ে অনেক ঘুর্ণি, চক্রবাক। আর এইসব ঘুর্ণি চক্রবাক থেকে 'বাতাসবালিকা' 'স্কুল বালকের হাত ধরে' কোথায় নিয়ে যায়। যেখানে কোনও ভূগোল নেই তার—'দিশাহীন রৌদ্রে'। এই তেপান্তরের মাঠে—হয়তবা মাঠ ছেড়ে। এই শব্দ থেকে নৈঃশব্দ্যের দ্বারা আমাদের আজকের জীবনের রূপ বর্ণনা করছেন।

কিন্তু এই আগুন ও জলের প্রসঙ্গ দিয়ে অন্যরকম একটা জিনিস প্রকাশ করেছেন। তা হল আমাদের চিরাচরিত 'অভ্যাস' আর আগুন ও জলের ব্যবহার। এই আগুন ও জল আজ যদিও অন্যরকমভাবে গৃহিত ব্যবহৃত। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল—আগুনে কেবল অন্তর দাহ হয় আর জলে কোনও তৃষ্ণা মেটে না বরং উল্টোটা। তারপর পরবর্তী স্তবকে বলছেন কবির নিজস্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত অর্জিত অভিজ্ঞতাসহ—

''আমাকেও নিয়েছিল। চল্লিশ বছর
সেই তেপান্তরে থেকে, বাতাসের আড়কাঠি হয়ে
ফিরে এসে দেখি সেই একই গ্রীষ্ম, ট্রাফিক-আলোয়
মরুশৃগালের চোখ আজও জ্বলে নেভে।''

কবিও এই জীবনবৃত্তের থেকে বাইরে নয়। তিনি এর ভেতরের সকলের মধ্যে একজন। তাই নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন চল্লিশ বছর ধরে ঐ জ্বলন্ত দিশাহীন রৌদ্রে কবিও ছিলেন। তারপর ফিরে এসে দেখলেন যে ওই গৃষ্ম আগুন ও জলের কোনও পরিবর্তন নেই। ক্রমে আরও ভিড় বেড়েছে—জঞ্জালও। আর বাইরে থেকে দেখছেন 'মরুশৃগালের চোখ' এখানে জ্বলে আর নেভে। যুগের এই ধারাবাহিকতা আর সমসাময়িক সময়ের দহনের পরিসরকে খুলে দেখাতে চেয়েছেন যে আধুনিক মানুষ বা উত্তরাধুনিক মানুষ কিরকমভাবে নিজেরই বৃত্তে দিনের পর দিন কেবলই ঘুরছে—দহনের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু কবি চতুর্থ স্তবকে যে সত্যকে তুলে ধরেছেন তার কোনও তুলনা হয় না—

> ''চল্লিশ বছর আমি ঘুরে ঘুরে যা দেখেছি, সমস্ত তোমার
> প্রণয়দ্বিধার দৃশ্য। কোনও জলাশয়, কোনও বাস্তবতা দেখিনি কোথাও।
> ধাইবুড়ি, ফেরিঘাট, সূর্যাস্ত, রোশনচৌকি, রাত্রির গম্বুজ
> যেটুকু বাস্তব, সেও রূপকের বাস্তবতা—তোমার নির্দেশে
> কাকতাড়ুয়ার মতো দৃশ্যমান, শূন্যতার আনাচে-কানাচে।"

অনেকার্থদ্যোতক এই বয়ানের মধ্যে যে জীবন ও জীবনের অনুষঙ্গ আর প্রসঙ্গ পাই। তা তো রণজিৎ দাশের অনুভব বা উপলব্ধি নয় শুধু। এটাই আজকের সময়ের সবচেয়ে বড় গভীর বাস্তবতা। এই চল্লিশ বছর ঘুরে ফিরে দেখেছেন তার সবকিছু 'প্রণয়দ্বিধার' ছবি। কোথাও কোনও জলের দৃশ্য দেখেননি—কোনও বাস্তবতাও না। এই সব কিছু/উপাদান হারিয়ে যাওয়ার পেছনে যে কারণ তা হল আগুন ও জলের অর্থাবণতি—অর্থসংকোচও। আগুনে কোনও আলো নেই—জলে কোনও তৃপ্তি নেই।

তারপর কবি যান্ত্রিক জীবনের ঘেরাটোপে বন্দি জীবনে দৃশ্যসহ অন্য রকম বাস্তবতার কথা বললেন যে কবি কোথায় কি দেখলেন। 'ধাইবুড়ি, ফেরিঘাট, সূর্যাস্ত, রোশনচৌকি, রাত্রির গম্বুজ' ইত্যাদির মধ্যে 'যেটুকু বাস্তব, সেও রূপকের বাস্তবতা'। এই যে আসল বাস্তবতাহীন বাস্তব নিয়ে আমাদের জীবনধারণ জীবন যাত্রা তার কথাই কবি বলছেন এখানে। আর সময়ের স্রোতের নির্দেশে এই সকল বাস্তবতা দৃশ্যমান। সকল শূন্যতার ফাঁকে তা দেখা যায় যে এখানে কোনও বাস্তবতা নেই। এই বহুস্বরের কথা অত্যন্ত মর্যদাশীল হয়ে যায়।

শেষ স্তবকের মধ্যে কবি বলছেন এইসব বাস্তবতার ভিড়ে কীরকমভাবে বেঁচে আছি আমরা—

> ''রুদ্রাক্ষ লেহন করে বেঁচে আছি। অপরাহ্নকালে
> এখনও গুজব শুনি—
> তোমার চুম্বন এক অন্তঃস্নান, সন্ধ্যার আড়ালে।"

আমাদের এই অবাস্তবিক বেঁচে থাকার ওজন ও মানেটা বুঝাতে চান আসলে কবি এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। তবুও কবি স্বীকার করছেন 'তোমার চুম্বন' অবগাহনের মতো তাও 'সন্ধ্যার আড়ালে'। প্রকাশ্যে তার রঙ অন্যরকম হয়ে যায় যেন একটা গুজব আর কিছু না। এই শব্দাতীত ব্যঞ্জনা দ্যোতনার দ্বারা আমাদের আজকের জীবনের চরম বাস্তবকে দেখাতে চেয়েছেন কবি। আর তিনি বিশ্বাস করেন— অন্তঃসারশূন্য পথহাঁটা, পথ, মাঠ, রাস্তা, দৃশ্য, ছবি, পথের জল, আগুন এই সবের বাস্তবতা আসলে 'রূপকের বাস্তবতা'। কবিতাটির বয়ানে আজকের মানুষের জীবনের পরিসরটা পেয়ে যাই—মাপ ওজনও।

দুর্গের ভিতর নাটক

> ''দুর্গের ভিতর নাটক জমাতে হলে চাই বাদুড়, চাঁদ, ঝাড়লণ্ঠন, অন্ধকার, নৈশভোজ, অট্টহাসি এবং একটি লুকনো মৃতদেহ। চাই বাঘিনীর মাথা—এক হৃদয় শিকারের নিস্তব্ধ ট্রফি। বাঘিনীর নিষ্পলক মার্বেল চোখ উঁচু দেয়াল থেকে লক্ষ রাখবে দৃশ্যের সমস্ত আলোছায়া, চরিত্র, দ্বৈতসঙ্গীত এবং স্বীকারোক্তির ওপর—এটা চাই। 'আমিই এই দুর্গের স্রষ্টা এবং অধীশ্বর'—বলে যে পুরুষ মদের গেলাস হাতে ঘরে ঢুকবে তার হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গিটি পাহাড়ি কুলি-র। তার পরনে মৃতদেহটির বোতাম ছেঁড়া শার্ট। সংলাপ ভুলে গিয়ে স্বগতোক্তি করার নতুন নাট্যরীতিতে সে বলতে শুরু করবে আদিম প্রবৃত্তি জাত এক নায়িকার গল্প যে কিশোরী বয়সে বই পড়ে কাঁদত এবং যার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা অসম্ভব। বিদেশি গল্পের এই চেনা রূপক ছাড়িয়ে সে যখন বলতে চাইবে যে সেই নায়িকা ছিল আসলে এক বাঘিনী—চিত্র-প্রদর্শনীর আলোর ভিতর যার ডোরাকাটা শরীর ফুলে উঠেছিল মিলনের অভিমানে, তখনই দুর্গের বাইরে শোনা যাবে হিজড়েদের কোলাহল। সে দুর্গ ছেড়ে পালাতে চাইবে কিন্তু পারবে না, কারণ তার প্রতিটি পদক্ষেপে তৈরি হবে একটি করে নতুন দুর্গের গোলকধাঁধা।''

এইভাবে কবিতাটি শুরু হচ্ছে। যার শুরুটা পাঠকের কাছে অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু কবি রণজিৎ দাশের শব্দ ব্যবহার, শব্দ সংযোজন, বাক্যবন্ধন ইত্যাদি প্রতিটি পদক্ষেপেই হল সচেতন ক্রিয়াকলাপ। এই কথাটা সুন্দর করে বললে হয় প্রতিটি পদক্ষেপ আসলে চিহ্নায়ক, সংকেত ছাড়া কিছুই নয়। কারণ মহানাগরিক জীবনের বিষাদ, বাস্তবতাহীনতা, মিথ্যা অভিনয়, আত্মধ্বংসের গান, যৌনতা, অবসাদ ইত্যাদির নির্যাস থেকেই তো উঠে এসেছে এই সব শব্দের কারিগরী—কারুকার্যও। আরেক জিনিস হাংরি আন্দোলনের নায়কদের মতো তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন কবিতায় কী-ই না ব্যবহার হতে পারে। যদি তাকে ঠিকভাবে ঠিক জায়গায় ব্যবহার করা জানে শিল্পী।

চারদিক থেকে ধেয়ে আসা সকল ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে উন্মূল করে দেওয়ার যে প্রয়াস। সেই প্রক্রিয়া ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে বুঝানোর জন্যই এই সকল শব্দের নির্মাণ—শিল্পীর হাতে প্রয়োগ। 'আমিই এই দুর্গের স্রষ্টা এবং অধীশ্বর'। নাগরিক জীবনবোধাচ্ছন্ন মানসিকতার পরিচয় এবং নিজের সংস্কারহীন ব্যক্তিত্বের প্রচার ও প্রসার। তাতে কোনও সার্থকতা ও বাস্তবতা নেই। আসলে তার গভীরে অন্ধকার আর কান্না। এই দুর্গের ভেতরে অভিনয় তো একটা সচেতন পূর্বপ্রস্তুত অভিনয়। যেখানে নিজস্বতা বলতে কিছুই থাকে না। সবকিছু অন্যকিছু অন্য কারুর অন্য কোনও চরিত্রের অভিনয়। আবার এখানে থেকে পালাতে চাইলেও পারবে না পালাতে। কারণ দুটা হল, এক। দুর্গের বাইরে শুনা যায় 'হিজড়েদের কোলাহল', ব্যক্তিহীন, দুই। এই নিজস্ব চরিত্রহীন অভিনয় এবং দুর্গের থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রতিটা পদক্ষেপে নির্মাণ হয় আরও একটি করে দুর্গের গোলকধাঁধা। অর্থাৎ গোলকধাঁধার ভেতরে আরও অসংখ্য গোলকধাঁধা নির্মাণ হচ্ছে প্রতিটা পদক্ষেপে প্রয়াসে। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ অস্তিত্বের সংগ্রাম ব্যক্তিত্বের সংকট পথহীন জীবনের আসল ছবি তো এটাই—আমাদের মুখোশ পরা অভিনয়পূর্ণ জীবনও। তারপর কবি এই গদ্য কবিতাটিকে আরও গদ্যময়তা দিয়ে পূর্ণতা দিতে গিয়ে বললেন—

> ''অবশ্যি ইতিমধ্যেই সে অর্জন করবে নিজের জন্যে যথেষ্ট সমবেদনা, কারণ সে পুরুষ, কারণ সে অস্ফুট স্বগতোক্তির মধ্যে তিনবার 'ডাইনি' শব্দটি উচ্চারণ করেছিল। এরপর দুর্গে প্রবেশ করবেন অতিথিরা—প্রত্যেকেই স্বল্পবাক, বিচক্ষণ, বিনয়ী এবং আত্ম-

পরাঙ্মুখ। অপরাধ শব্দটির মূল অর্থ অভিশাপ কিনা, মদে চুমুক দিতে দিতে
এই হবে তাঁদের দার্শনিক বিতর্কের বিষয়। ঝাড়লণ্ঠন নিভে গেলে কে কার
ঘরে ঢুকবে কেউ জানে না। দুর্গের মাথায় গোল চাঁদের ওপর দিয়ে, ভাসমান
মেঘের ছায়ার মতো, দ্রুত এপাশ-ওপাশ সরে যাবে রমণীদের ছুটন্ত রাত্রি-
বাসের ছায়া, সারারাত ধরে। সব নাটকই নৈতিক নাটক, সুতরাং শেষে
কাঠগড়া এবং ক্রন্দন থাকবেই। থাকবে ভাঁড়, জ্যোতিষী এবং জল্লাদ।
কেবল, অভিনয়কালে চুম্বনও যে আসল চুম্বন—এই সত্য অগোচরে থেকে যাবে।"

চারদিকে যদিও গোলকধাঁধার তৈরি, একটির পর আরেকটি। তবুও এই যে অভিনয় অর্থাৎ জীবনচর্চা চর্যা শৈলী ইত্যাদির জন্য এক ধরনের সহমমতা, সমবেদনা পাবে। কারণ সে পুরুষ। তারপর যে সব মানুষ দুর্গে অভিনয় দেখবে তারা আবার 'প্রত্যেকই স্বল্প বাক, বিচক্ষণ, বিনয়ী এবং আত্মপরাঙ্মুখ'। এটাই দর্শকের বৈশিষ্ট্য এবং দার্শনিক বিতর্ক। এবং তারপর সারারাত অভিনয় শেষে আলোহীন জায়গায় লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতা। এইসব আবার নৈতিক জীবনবোধ নির্মিত। তাই বিচার ও কান্না থাকেই সমাপ্তিতে—ভাঁড়, জল্লাদ, জ্যোতিষীও।

এই শব্দ স্বার্থপর, অর্থোপার্জনকারী অভিনয় করতে গিয়ে। এমন কিছু ঘটে যায় অভিনয়ে। যা আসল সত্য হয়ে রয়ে যায় কোথাও। কিন্তু এই অভিনিত সত্যটা থেকে যায় কোথাও। কিন্তু এই অভিনিত সত্যটা থেকে যায় সকলের আড়ালে। কবি মানুষের নিজস্বতা দেখাতে গিয়ে এই সব শব্দজাল বাক্যগঠন করেছেন। এবং দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের আসল চরিত্র কীভাবে হারিয়ে যায় অন্য চরিত্রের অভিনয়ে।

কবিতাটি যে লাইন দুটি দিয়ে শেষ করেছেন। তা ওই সূচনার দুটি লাইন—আবারও উচ্চারণ করলেন—

"দুর্গের ভিতর নাটক জমাতে হলে চাই একটি লুকানো মৃতদেহ। চাই বাঘিনীর মাথা।"

কবিতাটি এইভাবে সমাপ্ত করার মানেটা মনে হয় এরকম—

"সে দুর্গ ছেড়ে পালাতে চাইবে কিন্তু পারবে না, কারণ তার প্রতিটি
পদক্ষেপে তৈরি হবে একটি করে নতুন দুর্গের গোলকধাঁধা।"

অর্থাৎ নিজের বৃত্তে সে কেবল ঘুরতে থাকে—থাকবেও। কোথাও বেরুবার পথ নেই। এটাই চরম বাস্তব। যদিও এখানে কোনও বাস্তবতা নেই—রূপকের বাস্তবতাপূর্ণ এই পৃথিবীতে।

রজনীগন্ধা

"মৃত্যুর পর একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে যায়। শরীর পচতে শুরু করে, বেরুতে
থাকে দুর্গন্ধ। ক্রমশ সেই দুর্গন্ধ বিকট আর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, যেন অন্ধ ক্রোধে
আক্রমণ করে চারপাশের সমস্ত কিছুকে। সত্তর বছর ধরে যে শরীরটা ছিল
হালকা সুবাসে ভরপুর, চল্লিশ বছর ধরে যে শরীরের সুগন্ধে মুখ গুঁজে
ঘুমিয়েছে তার প্রিয় নারী, সেই নারীও নাকে রুমালচাপা না দিয়ে সেই
শরীরের পচে ওঠা মড়ার কাছে যেতে পারে না। তাই মৃতদেহ তাড়াতাড়ি
আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হয়, কিংবা কবর খুঁড়ে মাটি চাপা দিতে হয়।"

'রন্ধনীগন্ধা' কবিতাটি গদ্য কবিতা। তার প্রথম স্তবক এরকম। যেখানে কবি মানুষের জীবনের নয় শুধু জীবের জীবনের এক চরমতম সত্যকে উত্তাপণ করলেন গদ্যছন্দে। যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য—অনস্বীকার্য।

মানুষের মৃত্যুর পর শরীরটা পচে যেতে লাগে। কারণ তার মধ্যে প্রাণ থাকে না। কবি বলছেন এতদিন সত্তর বা চল্লিশ বছর ধরে যে শরীর সৌন্দর্যে মাধুর্যে গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ ছিল বা থাকে। তা প্রাণহীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পচতে লাগে। যে শরীর মন্থন করে করে তার প্রিয়া অনেক রাত কেটেছে সুগন্ধে সেই নারীও নাকে রুমালচাপা দেয় মৃত্যুর পর, তাই এই শরীরকে জ্বালিয়ে নিতে হয় অথবা কবর দিতে হয়। এই যে মানবজীবনের চরম একটা পরিণতি বা ক্রিয়া তা আসলে একটা ঐতিহ্য ও পরম্পরার মতো। আর এই সবকিছুর মূল কথা বলছেন কবি—

> ''তাহলে, প্রাণ মূলত এক গোপন সুগন্ধ, যা আজীবন শরীরের ভিতর বাসা
> বেঁধে থাকে, এবং মৃত্যুর মুহূর্তে শরীরকে ছেড়ে চলে যায়?

এটাই কবির দর্শনিক সিদ্ধান্ত। সত্যিই মানুষের প্রাণ জিনিসটা মূলত 'এক গোপন সুগন্ধ' ছাড়া কিছুই নয়। যা মানুষের সমস্ত দেহটিকে 'গোপন সুগন্ধে' বাঁচিয়ে রাখে। একদিকে 'প্রাণ' অন্যদিকে 'শরীর' এই দুইয়ের দ্বিবাচনিক বয়ানে ফুটে ওঠছে কবির নিজস্ব দার্শনিক অভিব্যক্তি। কবিতাটি পড়ার পর পাঠক এক ধরনের ধারণা বা বোধের আভাস পায় প্রাণ সম্পর্কে। যা এর আগে কেউ এরকম করে প্রকাশ করেনি মনে হয়।

কবিতাটির নামের দিকে লক্ষ্য করা গেলে দেখা যায় যে 'রজনীগন্ধা'। কিন্তু একটিবারও রজনীগন্ধা শব্দ ব্যবহার করেননি কবিতায়। রজনীগন্ধার গন্ধের সঙ্গে প্রাণকে তুলনা করে কবিতাটির গভীরতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। হয়তবা কবি ভেবেছেন আমাদের শরীরটা রজনী গন্ধটা সরে গেলে কিছুই থাক না। অবার গন্ধটা থাকলে শরীরটা রজনীগন্ধা হয়ে ওঠে।

ডায়েরি থেকে ২

> ''সত্য কী, আমরা জানি না। অথচ মিথ্যাকে জানি, নির্ভুল, নিজের ছায়ার মতো। এই সত্যসন্দিগ্ধ চিরজীবনে, মিথ্যাই শেষ পর্যন্ত আমাদের একমাত্র নিঃসংশয় উপলব্ধি, সেই অর্থে, আমাদের একমাত্র বিশ্বস্ত সত্য। আমাদের আশ্রয়।''

এই সুগভীর বয়ানে কবি রণজিৎ দাশ সত্যের একটা মানে, সংজ্ঞা দিতে চাইছেন। যেখানে সত্য সম্পর্কে আমাদের এতদিনের ধারণা ধাক্কা খায়। এবং চিন্তা করতে বাধ্য করে নিজেকে। এই চিন্তা করানোর একটা প্রবণতা থাকে রণজিৎ দাশের প্রায় সব কবিতাতেই। কোথাও গদ্যছন্দের দ্বারা, বিবরণের দ্বারা; কোথাও সংকেতের দ্বারা, শব্দের জাদুজালের দ্বারা; আবার কোথাও নিছক পদ্যছন্দের দ্বারা। রণজিৎ-এর এই জিজ্ঞাসু কবিতা পড়ুয়ার মনে এক আশ্চর্য চেতনার জন্ম দেয় তার সকল শব্দব্যঞ্জনা দিয়ে। 'ডায়েরি থেকে ২' এই কবিতাটি সেরকম এক আশ্চর্য সন্ধান প্রবণ কবিতা। সত্যের নতুন দ্যোতনা পাচ্ছি এখানে।

আমরা সত্যকে যা জানি বা যেরকম জানি বা যতটুকু জানি। তা আসলে সত্য অর্থে গৃহিত মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ সত্যের মধ্যে টিকে থাকাটা বড় কঠিন। আমরা বড় সহজে হারিয়ে যাই এবং মিথ্যাটাকেই একমাত্র বিশ্বস্ত সত্য বলে গ্রহণ করে নেই। বিকল্প কোনও পথ থাকে না। কারণ প্রতিটি মানুষই গোলকধাঁধার ভেতরে ঘুর্ণিতে ভেসে আছে ঘুরে। এখানে তাই আমরা আশ্রয় নিয়ে বাঁচি—বেঁচে থাকতে হয় বলে।

তারপর দ্বিতীয় স্তবকে সত্য মিথ্যার ফারাকটা আজকের মানচিত্র অনুসারে বোঝাতে চাইছেন—

> ''যে স্মিথ হেসে বলে যে মিথ্যাকে জানা মানে তো সত্যকেও জানা, সে
> নচিকেতা; নীলচাষী নয়। আমরা নির্বোধ। আমাদের মাথায় একটানা

উল্কাপাত, চারপাশে ধান-চারার ডমরু-স্তূপ, আমরা পাথরের কানাঘুষো।"

কবি এই পৃথিবীকে ঘুরে ফিরে দেখেছেন সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বযুদ্ধে সর্বদা মিথ্যারই জয় হয় এই মিথ্যা জীবনজীবী মানুষের জীবনে। এখানে 'যে মিথ্যাকে জানা মানে সত্যকেও জানা' মনে করে সে-ই তো কবির কাছে সেই নচিকেতা—সে চাষী নয় যে মাটি খুঁড়ে সত্য ফলায়। মানুষের জীবন দর্পণ-মায়াবী ফাঁদে বন্দি। এখানে তাকে হেরে যেতে হয়—বিকল্প কোনও পথ নেই। যদিও আমাদের চারদিকে অসংখ্য ভিড় উত্তরাধিকারীর। তবেও আমরা অনুর্বর পাথর ছাড়া কিছুই না আজ। কোনও চিরমীমাংসিত সত্য বা ফসল রেখে যেতে পারছি না তাদের জন্য তারপর শেষ বা তৃতীয় স্তবকে কবি বলছেন—

"খুব সম্ভবত, আমরা মাতৃগর্ভ থেকেই মিথ্যাকে জানি। জিন-এর গূঢ়তম
সন্ধ্যাভাষায় হয়তো ইঙ্গিতবদ্ধ আছে মিথ্যার সংজ্ঞা এবং ব্যবহারবিধি। তবু
একবার, নাড়ি-ছেঁড়া শৈশবে, আমরা সেই মিথ্যার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ
পরিচয়ে, চমকে উঠি শুধু। জীবনে একবারই সেই বিষণ্ণ চমকে ওঠা, আমাদের
জীবনের প্রথম এবং শেষ দৈবমুহূর্ত।"

এই স্তবকের মধ্যে কবি নিজের বয়ানকে আরও ইতিহাস খুঁড়ে প্রকাশ করতে চাইলেন সত্যের ধারণা। বলতে পারি সত্য রূপে গ্রহণ করা মিথ্যাকে। বললেন যে আমরা মায়ের গর্ভ থেকেই মিথ্যাকে জানি। কারণ মা বাবার মিথ্যা তো জিনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেহে প্রবেশ করেছে। এবং এখান থেকেই আমরা জেনে আসি মিথ্যার সংজ্ঞা ও ব্যবহারবিধি। কিন্তু তবুও শৈশবে ওই রকম মিথ্যার সঙ্গে পরিচয়কালে চমকে উঠি আমরা। মেনে নিতে চাইনি। কবি বলছেন সেই পরিচয় মুহূর্তটাই মানুষের জীবনের প্রথম চমকে ওঠার মুহূর্ত আর শেষ দৈবমুহূর্ত।

এই বয়ানের মধ্যে কবি গোলকধাঁধায় ঘেরা উত্তরাধিকার ও পূর্বপুরুষের দ্বিবাচনিকতায় বেয়ে আসা মিথ্যার প্রচার প্রসার বিস্তারের কথা বলেছেন। এই স্তবকের বয়ানের সাথে কবি রণজিৎ দাশের 'ডায়েরি থেকে' কবিতার বিবরণাত্মক কাহিনির মিল আছে। কবি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁর শিশু সন্তানকে সত্য মিথ্যার এই নাটক খেলা জীবনের মিথ্যাকে—বা মিথ্যাপূর্ণ আরেকটা বার্তাও দিয়ে যাচ্ছেন যে আজকের সময়ে এই মিথ্যা কীভাবে পূর্বপুরুষের শরীর থেকে উত্তরপুরুষে ছড়াচ্ছে। আর উন্মূল করে দিচ্ছে কীভাবে সত্য আর তার সকল অনুষঙ্গ প্রসঙ্গকেও। এটাই তো সত্য বাস্তব জীবন আজ আমাদের।

দ্বিতীয় বেদনা

"পুরনো বেদনা ভুলে যাওয়াও আরেক বেদনা।"

এই সুগভীর পংক্তি দিয়েই কবি রণজিৎ দাশ মানুষের মনের এক বোধ বা অনুভূতিকে বোঝাতে চেয়েছেন। মানুষের মনে স্মৃতিতে বিস্মৃতি এই বেদনা রয়ে যায়। তারপর কবি আবার বিবরণাত্মক ব্যঞ্জনা দিতে গিয়ে বলছেন—

"শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতের মতো, চাপ দিলে আর ব্যথা লাগে না। বুকটা ছ্যাঁৎ
করে ওঠে। কই, চিতায় শোয়ানো সেই আলতা-পরা পা দুটির কথা মনে
পড়লে আর চোখে জল আসছে না তো? তাহলে কি, এতদিন পর, সিত্যই
ভুলে গেলাম তাকে? বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কান্না হারানোর শুকনো,
বোবা কান্নায় দমবন্ধ হয়ে আসে। এই দ্বিতীয় বেদনা সত্যিকারের বিমূর্ত
আর ভয়ঙ্কর। মরুভূমির বিষাক্ত বিছে-র মতো, মাথার ভিতরে এর বাস
শুরু হয়। শুরু হয় শূন্যতার। এই দ্বিতীয় বেদনার আতঙ্কে মানুষ তার প্রথম

বেদনাটিকে মায়ের স্মৃতির মতো আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু কতদিন? সমস্ত
ক্ষত শুকিয়ে দেয় যে ছদ্মবেশী সময়, এই দ্বিতীয় বেদনা তো তারই ক্ষুধার্ত কামড়।"

বেদনা আর ক্ষতের মধ্যে তুলনা করে বলছেন যে ক্ষত শুকিয়ে গেলে ব্যথা লাগে না। কিন্তু পুরনো বেদনা মনে পড়লে বুকে ছ্যাঁৎ করে ওঠে—কষ্ট হয়।

এখানে একটা কাহিনি আছে। এক নারী হয়তবা কবির প্রিয়া। তোমার বা আমারও কী এরকম কোনও প্রিয় মানুষ চিতায় জ্বলেনি? এই প্রিয় মানুষটির আলতা পরা পা দুটি মনে পড়ে আজ কিন্তু চোখে জল আসে না আর। তবে কান্নার মতো শুকনো কান্নায় বুক ফেটে যায়—দমবন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু এই বেদনাটা ভুলার বেদনা তো আরও বিমূর্ত এবং ভয়ঙ্কর। বিষাক্ত বেদনাটা মাথায় কাজ করে কষ্ট দেয়—চোখে ভাসে পুরনো বেদনা। কবি বলছেন 'দ্বিতীয় বেদনার আতঙ্কে' প্রথম বেদনাকে মায়ের স্মৃতির মতো মনে রাখি। কিন্তু বেশিদিন রাখতে পারি না। সব কিছু হারিয়ে যায় ছদ্মবেশী সময়ের গোলকধাঁধায়। সময়ের কামড়ে সকল বেদনা হারিয়ে যায় সময়ের ক্ষুধার্ত বালুচরে।

এই যে সত্য এবং তার বহুস্বরিক দ্যোতনা আমাদেরকে নিয়ে যায় অন্যভুবনে। যেখানে মানুষ নিজেকে খুঁজে পায়। এই 'দ্বিতীয় বেদনা' নামক কবিতাও তার ব্যতিক্রম নয়। মানুষের মনের এক বড় সত্য প্রকাশিত হয়েছে এখানে। মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার গভীরতা আরও গভীর হয়ে ধরা দিয়েছে। কিন্তু শেষ লাইনে কবি একটা গভীর প্রশ্ন করছেন—

"..... কেউ জেনেছে কি ঈশ্বরের মন?"

আসলে মানুষের মন নির্মিত হয় তার পথ হাঁটায় পথচলায় ও পারিপার্শ্বের সকল উপাদানের চাষে চর্চায় চর্যায়। কবিও উল্টো করে বলছেন ঈশ্বরের মনের কথা। মূলত কবি বলতে চান যে মানুষের মন কি কেউ জেনেছে, বুঝেছে, দেখেছে! সেই সুগভীর সত্য ও বাস্তবকেও প্রকাশ করেছেন তাঁর শিল্পীসত্তার কারুকার্যে। মনের এই ব্যক্তিস্বর তো সামাজিক স্বর, বহুস্বর। যেখানে আবহমানকালের মানুষের মনের ছবি ফুটে ওঠেছে।

দীপঙ্কর নাথ

তোমাকে সুন্দর হতে হবে

"সময়ের সাথে সাথে কবি তাঁর কবিতায় সময়োপযোগী বাচনভঙ্গি এবং শব্দ চয়ণে অধ্যবসায়ী হয়ে ওঠেন। ভাষার গভীরে আত্মলীন হয়ে কবি বেরিয়ে পড়েন বাউল হয়ে। যে বাউণ্ডলে স্বভাবে থাকে প্রেম এবং জীবন সম্পার্কিত উপল উপলব্ধি। এই অভিজ্ঞতায় বরাকের কাব্যভূবনে অনেক তরুণ কবির প্রতিভা ঝলসে ওঠে। তাদের মধ্যে দীপঙ্কর নাথ অগ্রগণ্য।"[৬৫]

কবি দীপঙ্কর নাথের কবিতা চর্চা শুরুর আগে এই কথাটি একবার স্মরণ করে নিতে পারি। কারণ সমালোচক খুব অল্প কথায় অনেক কিছু বলেছেন এখানে কবির মেজাজ ও স্বভাব সম্পর্কে। তাঁর প্রথম 'তোমাকে সুন্দর হতে হবে' (১৯৮২) কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটিতে তাঁর কবি স্বভাবের একটা বড় অংশ আমাদের চোখে পড়ে।

কাব্যগ্রন্থের সবশেষে এই নাম কবিতাটি স্থান দিয়েছেন কবি। হয়তবা গ্রন্থের সকল কবিতাকে আর বেশি অনুরননশীল করে রাখার জন্য। অনেক কবি নাম কবিতাকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা দিয়ে ভেবে কাব্যের মধ্যে স্থান দেন। হয়তবা তিনিও ভেবেছেন সব কবিতার শেষে নাম কবিতাটি দিয়ে কাব্য শেষ করি। পাঠকের মনে একটা আলাদা দাগ কাটার জন্য। কবিতাটির শুরু এভাবে—

''পূজোর মেরাপ থেকে তুলে এনে বসালুম কবিতার খাতায়
পুজো হলো; এবার
সাইকেল আরূঢ় কয়জনা দেখে এলে পুজো
কয়খানা।
—ক'খানা?
—আহা এ'তো আর তোমাদের কোলকেতা নয়, কিছু
বর্ধিষ্ণু গ্রামও নয়,
নেহাত এই তুচ্ছ জনপদ ঃ পাহাড়িয়া নির্জনে
বিবিধ আচার হয়।
(আচার ভাঙার মতো অনুষ্ঠানও হয় কিছু কিছু
লুকিয়ে চুরিয়ে,)
সাইকেল আরূঢ় কয়জনা দেখে এলো তা-ই,
মহাষ্টমী রাতে,
তোমার কথাই হচ্ছিলো। এবার পুজোয়
তুমিই প্রধানা, তোমাকে এনে বসালুম কবিতার খাতায়।''

'তোমাকে সুন্দর হতে হবে'—এই তোমাকে 'তুমি' কে? কবির প্রিয়া নিশ্চয়। যতটুকু সুন্দর সে তার চেয়ে আরও সুন্দর হতে হবে তাকে। হয়তবা কারণ এটা হতে পারে যে সৌন্দর্য আছে তার সেটুকু আজ আর সে রকম থাকেনি। তাই তিনি সময়ের সঙ্গে আরও সুন্দর হতে বলছেন তার প্রিয়াকে। তাই কবি পূজার মণ্ডপ থেকে উঠে নিয়ে কবিতার খাচায় বসালেন। তিনি দেখেছেন পূজার মঞ্চে সে ততটা সুন্দর নয় কবি যতটা চান। তাই তিনি নিজের মতো করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন সেই সুন্দরকে। তবুও পূজা হল, কয়েকটা পূজা দেখে এলো অনেক মানুষ। তারা নিজে জানে না কয়টা পূজা দেখেছে। কারণ মানুষ কখনও কোনদিন খুশি বা আনন্দের কোনও হিসেব করে না। দুঃখের কষ্টের যন্ত্রণার অভাবের হিসেব করে প্রতি মুহূর্ত। এটা তার প্রকৃতি। কবি মনে করিয়ে দিচ্ছেন এটা তোমাদের কলকাতা নয়, উন্নয়নশীল গ্রামও নয়। এটা তুচ্ছ জনপদ। পাহাড়িয়া নির্জনে কত আচার হয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলকে প্রকৃতির সৌন্দর্যে শোভিত রূপ দেখে তাকে Seven Sister বলা হয়ে থাকে। পাহাড়, টিলা, গাছ বৃক্ষ, বনজঙ্গলে ভর্তি যেন প্রকৃতি এখানে সবচেয়ে সজীব। আর তার মাঝখানে অনেক ধরনের জনজাতি উপজাতির মানুষের বসবাস তাদের সমাজ লোকসংস্কৃতি সংস্কৃতি আচার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। বরাকের কবি সেই গভীর সত্যকে খুঁচা মেরে দেখাতে চেয়েছেন। এবং আধুনিকতার ফলে বিভিন্ন জায়গায় এইসব আচার ভাঙার প্রচেষ্টা চলছে অনেক ধরনের অনুষ্ঠান করে করে। এইসব অনুষ্ঠান মানে আধুনিকতার অবক্ষয়ী প্রচেষ্টা কিন্তু।

সরল সহজ মানুষ সাইকেলে দেখে এলো সেই পুজা মহাষ্টমী রাতে। এই ঝাঁকজমক রাতে তোমার কথা হচ্ছিল। তোমার অর্থাৎ কবির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। প্রিয়া বললে মনে হয় বেশি ঠিক হবে। বাঙালিদের প্রধান পূজা দুর্গাপূজা। এই মহাপূজার মধ্যে থেকেও কবির প্রিয়ার আরও সৌন্দর্যের দরকার তিনি মনে করেছেন। এই সৌন্দর্য প্রগতিশীলতা ছাড়া কিছুই নয়। পূজার মাঝখান থেকে এনে কবি তাকে বসালেন কবিতার খাতায়। অর্থাৎ তিনি তার প্রিয়াকে একটা প্রতিষ্ঠা দিতে চান। যে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তার সৌন্দর্য আরও বেড়ে যাবে।

''তুমি মানে তুমি, মানে
তোমার
এখানেই শেষ নয়, বরং এবার
কিছু অনিবার্য হাত বদল হয়ে যাবে, যেমন
কবি থেকে ততোধিক বাউণ্ডুলে সম্পাদক

হয়ে কম্পোজিটর—
প্রেসের ধুলো কালি মেখে ফের সাফ সুতরো হবে
বেশবাসে সাধ্যমতো চেকনাই হবে
এক আধটু স্তুতি নিন্দে তা'ও কি হবে না?
হবে, কিন্তু তারপর,
একদিন হয়তো বা যুবক কবির স্বপ্নের মতো ঝলমলে
বাঁধানো মোড়কে
তোমাকে সুন্দর, আরো অসম্ভব সুন্দর হয়ে উঠতে হবে, এবার
পুজোর কবিতা।"

সৌন্দর্য বিলাসী কবি তাঁর প্রিয়াকে আরও সুন্দর করতে চান ভিড়ের মধ্যে কবিতার খাতায় তুলে এনে। যেখানে কোনও কালিমা থাকবে না। একেবারে নিজের হৃদয়ের রঙ দিয়ে। 'তুমি' শব্দটির এখানে তাই এক বিশেষ অর্থ আছে। কবির প্রিয়ার এখানেই শেষ নয়। আরও এগিয়ে যেতে হবে। এবং অনিবার্যভাবে তার হাত বদল হয়ে যাবে। কবি থেকে যে রকম সম্পাদকের হাত হয়ে কম্পোজিটর পর্যন্ত যায়। কবির প্রিয়ার সেই সৌন্দর্যময়ী হয়ে ওঠার পথে অনেক ধাপ বন্ধুর পথ আছে। প্রেসের ধূলাবালি মেখে পরিষ্কার হয়ে চর্বিতে পুরো হবে। যেভাবে একটা গ্রন্থ হয়ে ওঠে। তারপর সমালোচকেরা অনেক নিন্দা প্রশংসা করে। এরপর একদিন তোমার সেই সৌন্দর্য কেউ আবিষ্কার করবে—নতুন সৌন্দর্য। কোনও যুবক কবি তার স্বপ্ন মাখা চোখ দিয়ে তোমার এক অসম্ভব সৌন্দর্য আবিষ্কার করবে। এবং তুমি সুন্দর আরও সুন্দর হয়ে উঠতে হবে তখন। তারপর তোমার সেই সময়ের পূজার কবিতা হয়ে ওঠবে তোমার ওই সৌন্দর্য। হয়তবা সে সৌন্দর্য অসম্ভব। অথচ তোমাকে সম্ভব হতে হবে। কবি জানেন কবিতায় স্বপ্নে কল্পনায় অসম্ভবও সম্ভব। আর তিনি সেরকমই তাকে সুন্দর করে নিতে চান।

কবি দীপঙ্কর নাথের কবিতার আকরণের সাজসজ্জা তাঁর নিজস্ব। জীবনের চেনাজানা উপকরণ থেকে কবিতার সরঞ্জাম আহরণ করেন তিনি। আর এখানে বড় হয়ে ওঠে জীবনের কথা। সৌন্দর্য পিপাসু সকল কবিই এক প্রকার রোমান্টিক। দীপঙ্কর নাথও সে রকম এক রোমান্টিক কবি। যিনি সৌন্দর্যের পূজারি। তাঁর সেই সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় 'তোমাকে সুন্দর হতে হবে' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে। এবং তার ফাঁকে ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সংবেদনার দ্বান্দ্বিকতা রয়েছে গভীরভাবে।

আমাদের গল্প

''আমাদের গল্প' কবিতাটি একটি সহজ সংবেদনার আধুনিকতম জৌলুস। কবিতাটিতে অনুভূতির রঙ সময়োচিত উপলব্ধির মধ্যে সর্বকালীনভাবে পরিলক্ষিত। 'জল'কে কেন্দ্রে রেখে কবি তাঁর কবিতার বিষয়কে আলোকিত করেছেন।"[৬৬]

সমালোচক 'আমাদের গল্প' আলোচনা করতে গিয়ে এই কথা বলেছেন। খুব কম কথায় মনে হয় এই কবিতার মূল কথা তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। আমাদের জীবননদী স্বাভাবিকভাবে তার নিয়মেই চলে। আর এই চলার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের জীবনে অনেক গল্পের সৃষ্টি হয়। আর তখন আমরা এই গল্প দিয়ে নিজেকে আবার পুনরায় দেখি—জীবনকেও। 'আমাদের গল্প' কবিতাটিও সে রকম একটা স্বার্থক কথন। কবিতাটির শুরু এভাবে—

''এই দীর্ঘিকার জলে এক গল্পের বসতি আছে—এইখানে দীর্ঘদিন
অল্প অল্প করে তাকে গড়ে উঠতে দেখি, তার জীবন যাপন

তেমন হিশেবী নয়, বসে বসে পদ্মের নিমগ্ন ডাঁটাই চিবোয়।
কুসুমের প্রতি এই স্বাভাবিক আকর্ষণ বলে তার জলেই বসতি
তা-বলে আদৌ নিরীশ্বরবাদী নয় বরং একটু বেশিই
লোভ আছে রমণী মাংসের প্রতি, বাজার থেকেই কেনে।"

একটা গল্পের আভাস দিয়ে কবিতাটির শুরু। যে গল্প দীর্ঘদিন ধরে অল্প অল্প করে নির্মিত হয়েছে। আর এই গল্পে যে জীবনের কথা বলা হয়েছে। সে জীবনটা বেহিশেবী নয়। নিজের জায়গায় সীমানায় সে মেপে জীবনযাপন করে। তার নিজের মধ্যে নিমগ্ন থাকতে ভালোবাসে সে। নিজের মধ্যে নিমগ্ন থাকতে ভালোবাসে বলেই কুসুমের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ। আর তার জন্যই জলে তার বসতি। আবার এই জলে বসতি বলে সে নিরীশ্বরবাদীও নয় বরং আরও একটু বেশি লোভ তার পৃথিবীর প্রেম ভালোবাসার প্রতি। এই কথাকে একটু বেশি গভীর করে বলার জন্য বলেছেন 'রমণী মাংসের প্রতি' একটু বেশি লোভ। 'বাজার থেকেই কেনে'। কি কিনে? এই পৃথিবীর বাজারে চলে হেঁটে পৃথিবীকে দেখে যে বেঁচে থাকার গভীর বোধ আস্তিক্য চিন্তা এই সব সে এই দীর্ঘিকার জলের খণ্ডের বাইরে সে পেয়েছে। তাকে বলতে চাইছেন বাজার থেকে সে পেয়েছে সেই বোধ অসংখ্য মানুষের জীবনের মাঝখান থেকে। মনে হয় বাইরের পৃথিবী এই জলাখণ্ডের ভেতরে পরিচিত হচ্ছে ক্রমে। এটাই তো আধুনিকতার পদধ্বনি—অগ্রগতি প্রগতি যুক্তিবাদী চিন্তা।

''ও বাড়ির যুবতী বধূটি আসে প্রতিদিন, পদ্মদীঘিতে তার
লাবণ্য গড়িয়ে পড়ে—কলসীটি ভরে ওঠে কানায় কানায়
গল্প ভাবে একবার যদি একে পাই—বুকে স্রোত বহে যায়।
চোখে জল আসে তার, আহা, বধূটিও কীরকম উদাস উদাস।
গল্প জানে ওরও একটা গল্প আছে নির্ঘাৎ অসুখী খুব
তার চোখের জলেরো বেশি উতল করুণ, এরকম, মনে হয়
মাঝে মাঝে জলের শরীরে বড়ো হিম নামে,"

এইখানে কবি দীপঙ্কর নাথের রোমান্টিক ভাবনার এক উঁচুমানের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি যখন বলেন যে পাশের বাড়ির 'যুবতী বধূটি' জল নিতে পদ্ম ভরা দিঘির ঘাটে আসে তখন তার লাবণ্য গড়িয়ে পড়ে সেই জলে আর চারপাশে। তার হাতের ছোঁয়ায় কলসি ভরে ওঠে পরিপূর্ণ হয়ে জলে। এবং সেই সব গল্প ভাবে যদি এই 'যুবতি বধূটি'কে একবার পেতাম তবে আমরা (গল্প) সার্থক হয়ে ওঠতাম তার কাহিনিতে। বুকে কত কথা ওঠে পড়ে। চোখে জল আসে সেই গল্পের আহা বধূটিও কিরকম উদাস আত্মনিমগ্ন! যেন জীবনে অনেককিছু পাওয়ার ছিল সেইসব পাচ্ছে না সে। না পাওয়ার বিষাদে শোকে কষ্টে সে উদাস।

কবি দূর থেকে ভাবছেন গল্প জানে ওর-ও একটা গল্প আছে। যে গল্প নির্ঘাত অসুখী খুব। তার চোখের জলের চেয়ে বেশি করুন। এ রকম মনে হয় মাঝে মাঝে তার সেই জলমাখা শরীর অর্থাৎ জল দ্বারা আবৃত জীবন কখনও বরফ বা হিম হয়ে পাথর হয়ে যায়। সারাটা দিন বধূটি জল দিয়ে কাজকর্ম করে দিন কাটায় ভোর থেকে রাত পর্যন্ত। সেখানে সে-ও শীতের রাতের জলের মতো মাঝে মাঝে তার জীবনসহ অবশ হয়ে যায়।

'' গ্রীষ্মাবকাশে এক
উজ্জ্বল কিশোরী আসে এই হ্রদের কিনারে হাতে বিষভরা তূণ
বিদ্যুচ্চমকের মতো তাকে মুহূর্ত মাত্রই শুধু দেখা যায় এ, জীবনে—
গল্পভাবে এই কিশোরীরও গল্প আছে, ভয়ঙ্কর তীব্র, ওই রূপ
সূর্যকে পোড়াতে পারে—বুকে অসম্ভব ঢেউ তুলনায় হ্রদ শান্ত বড়ো
গল্পভাবে এবার কোথাও যাই, অন্য কোথাও—কোথা যাবে?"

কিন্তু ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গল্পেরও অনেক পরিবর্তন হয়। কবি বলছেন যে গ্রীষ্মের অবকাশে অন্য এক উজ্জ্বল কিশোরী আসে জলের এই হ্রদের পারে হাতে তার বিষভরা তূণ। এখানে আগের গল্পের নায়িকা 'যুবতী বধূটি' সবকিছু শোষণ যন্ত্রণা জীবনের না পাওয়া নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে বেঁচে আছে উদাস হয়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে এক কিশোরী প্রতিবাদী হয়ে ওঠেছে যার হাতে বিষভরা তূণ। এই প্রতিবাদী সত্তাকে বিচ্যুৎ চমকের মতো মুহূর্ত দেখা যায় এই জীবনে। গল্প নিজে ভাবে এই কিশোরীরও একটা নিজস্ব গল্প আছে। যে গল্প ভয়ঙ্কর ও তীব্র। তার ওই গল্পের তীব্রতা ভয়ঙ্করত্ব সূর্যকে পুড়িয়ে দিতে পারে। বুকে তার অসম্ভব ঢেউ, যে ঢেউয়ের তুলনায় জলের হ্রদ অনেক বেশি শান্ত। সেই সব গল্প নিজে নিজে ভাবে কোথায় যাবে সে। অন্য কোথায়? কিন্তু কোথায় যাবে? আমাদের মনে হয় কবি চান এই গল্পকে একটা শারীরিক রূপ দিতে। কিন্তু পরমুহূর্তে তিনি উত্তর দেন—

> ''চোখের জলেতে জন্ম এই চোখে জলেই থেকে যাবে,
> প্রত্যেকের গল্প, কিছু ভিন্ন—কেউ কারো গল্পকে চিনি না।
> এই চোখে কার গল্প, কার—তাকে প্রতিদিন একইভাবে গড়ে উঠতে দেখি
> দুঃখে ও দহনে, একদিন আমি তার শেষ দেখে যাব।''

কবিতার শুরু থেকে আটারো লাইন অবধি যে সব গল্পের কথা বলেছেন সে সকল গল্পের মূল ভিত্তি ধরা পড়েছে উনিশতম লাইনে। কবি এত সময় 'জল' 'জল' 'জল' বলেছেন সে জল আসলে মানুষের ভেতরের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ভাগ্যে নিয়তিতে সৃষ্টি হওয়া দুঃখ যন্ত্রণা কষ্ট সুখ ইত্যাদির দ্বারা চোখে বের হওয়া জলই। সকল গল্পের জন্ম এবং সকল গল্পের শেষ এই দীর্ঘিকার জলে। কবির সঙ্গে আমরাও জানি পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের গল্প ভিন্ন ভিন্ন—তাই কেউ কারুও গল্পকে জানি না, চিনি না। না জানাটাই, না চেনাটাই স্বাভাবিক। কারণ সময় সমাজ পরিবেশ দেশ ইত্যাদির জন্য প্রত্যেকটা জীবন স্বতন্ত্র হয় অন্যের থেকে। তাই প্রত্যেকটা মানুষের গল্প ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর আজ মানুষের মাঝে কেবল দেয়াল।

কবি নিজেকে প্রশ্ন করছেন যে এই চোখে কার গল্প, কার? কবি এই সব গল্পকে প্রতিদিন গড়ে উঠতে দেখেছেন একইভাবে। কবি তার চারপাশে এরকম অনেক গল্পকে গড়ে উঠতে দেখেছেন। এবং দুঃখে ও দহনে এইসব গল্প কাহিনির পরিণাম দেখে যেতে চান কবি। নিজের জীবন গল্প ভালো করে দেখে যেতে চান। পৃথিবীর অনেক গল্পকে দেখে নিজের জীবনকে আরও পরিণত করতে চান। এভাবে নিজের জীবনের গল্পকে স্বার্থক সফল করে তুলতে চান। যে গল্পে থাকবে দুঃখ ও দহনও । তার মানে জীবনে তিনি দুঃখ সুখ কষ্ট আনন্দ সবকিছুর স্বাদ পেতে চান। আর এটাই তো জীবন, এটাই তো 'আমাদের গল্প'।

দেবাশিস তরফদার

শিকার কাহিনি

> *''মহানাগরিক জীবনবোধের অনুষঙ্গ থেকে অর্জিত আত্মবিচ্ছেদ ও অস্তিত্বের কূটাভাস তাঁর নিজস্ব উচ্চারণরীতির আকর। সচেতন মেধাবী চিন্তা ও অবচেতন অনুভবের বিপরীত দেবাশিসের কাব্যভাষায় ও আকরণে ব্যক্ত হয়। সামাজিক পরিবেশের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশের জন্য দেবাশিস বাক্‌করণের অভ্যাস ভেঙে দিয়ে অন্তর্নাট্যের সংকেত ঋদ্ধ নতুন লিখনশৈলী বেছে নিয়েছেন।''*[৬৭]

সমালোচক দেবাশিস তরফদারের কবিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপরের সমালোচক এই মন্তব্য করেছেন। আমাদের

মনে হয় দেবাশিসের কবিতা সম্পর্কে এই কথাগুলি একেবারে উপযুক্ত। তাই এই কথা মনে করে আমরা এগিয়ে যেতে পারি তার কবিতা চর্চায়।

দেবাশিস তরফদারের কবিতা শ্রুতিমধুর না হলেও আধুনিক কবিতাকে পার হয়ে ওপারের উত্তরাধুনিক কবিতার মেজাজ পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। যেখানে নাগরিক জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ও শেকড়হীনতার কথা বিশেষ ভাবে ফুটে ওঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা আলোচনা করে দেখতে পারি 'শিকার কাহিনি' ছোট্ট কবিতাটি। কবি বলেছেন—

"শিকার কাহিনি। বলে কেউ কেউ।
যাদের বলার থাকে। চ্যাম্পিয়ন।"

নাগরিক জীবনের ছোঁয়ায় আঘাতে আমরা ক্রমে নাগরিক হয়ে গেছি। যার ফলে নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা যান্ত্রিকতাই আমাদের জীবনযাত্রাকে চালিয়ে নিচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে শান্ত প্রাকৃতিক জীবনের কথা ভাবা বড় কঠিন। গ্রামীণ ও শাহরিক দুটা দুই রকমের মেজাজ। দুই পারের মানুষেরা সবসময়ই দু'রকম ভাবে ভাববে চিন্তা করবে নিজস্বব্যক্তিত্ব ও জীবন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী। কবি এখানে নাগরিক জীবনের মানুষেরা যা ভাবে তার কথা বলছেন যে তারা ভাবে শিকারের গল্প। যারা বলার তারা এ রকম বলবে নিশ্চয়। কারণ তার জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা যা সে এতদিন অর্জন করেছে—সেই সবকে কেউ তো বদলাতে পারবে না। তারা এখানে চ্যাম্পিয়ন বিজয়ী। আমরা আমাদের নিজস্বতা ও অস্তিত্ব কিভাবে ক্রমে হারিয়ে নিচ্ছি Immitation করে ওপরের জীবনবোধ জীবনশৈলি, জীবনচর্চা নিজের জীবনে অর্জন করে—অথচ আমরা একটুও উপযুক্ত নই তার বরং তার বিপরীত।

"যাদের গল্প নেই। বন্দুক নেই।
যারা খুব মফস্বলে। দুটো বাস, ছটি রিক্সা,
একটা সিনেমা হল। এই।
তারা কী বলবে বলো?
হয়তো লিখবে তারা শিকার কাহিনি।"

নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন নিয়ম রীতিনীতি ইত্যাদির দ্বারা যে জীবন নির্মিত হয় তা বড় কঠিন। ধূলামাটির গন্ধ এখানে থাকে না। কিন্তু যারা মফস্বলে অর্থাৎ সদ্য নাগরিক হচ্ছে দিনদিন । জীবনে নাগরিকতা ক্রমে ঢুকছে। বাস রিক্সা সিনেমা হল ইত্যাদিতে জীবনটা আবৃত হচ্ছে। অর্থাৎ নাগরিকতায় অভ্যস্ত হচ্ছে আস্তে আস্তে। সেখানকার মানুষেরা কি ভাববে? কবি বলে দিচ্ছেন আমাদের জীবনকে তারা হয়তবা ভাববে 'শিকার কাহিনি'। সদ্য ফেলে আসা জীবনচর্চা চর্যা তাদেরকে বারবার এসে হাতছানি দেবে তাদের বর্তমান জীবনে—দিনরাতে। তখন তারা ভাববে ফেলে আসা অতীতের সেইসব কাহিনি। সে সকল কাহিনি আজ নাগরিকতা যান্ত্রিকতা কৃত্রিমতায় শিকার করে নিচ্ছে ক্রমে। কবিতাটিতে নাগরিক জীবনের পরিবর্তন, ভাঙাগড়া, গ্রামপতনের শব্দের কথা খুব বেশি গভীরভাবে ফুটে ওঠেছে। আর 'শিকার কাহিনি' কবিতাটি সেই সব বিষয়বস্তু লালিত আশ্রিত একটি স্বার্থক সফল কবিতা।

কবি দেবাশিস তরফদারের 'কথাসর্বস্ব' এবং 'আপেলের বিকল্প' কাব্যগ্রন্থ দু'টি এবং কবি উৎপল বসুর 'পুরী সিরিজ' 'আবার পুরী সিরিজ' কাব্যগ্রন্থটি পাশাপাশি পড়লে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায় যে দু'জনের মেজাজ এক ধরনের প্রায়। অথবা উৎপল বসুর থেকে তিনি সমৃদ্ধ হয়েছেন বা এ রকম পথ পেয়েছেন। সে যাই হোক দেবাশিস যে কবি দেবাশিস তা খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় তার কবিতা পড়লেই।

জালাল উদ্দিন লস্কর

কথা ছিল বেঁচে থাকার

কবি জালাল উদ্দিন লস্কর বরাক উপত্যকার অস্তিত্ববাদী কবিদের মধ্যে অত্যতম। তাঁর কবিতায় অস্তিত্ববোধ অস্তিত্ব নিয়ে অর্থাৎ জীবনে টিকে থাকার এক বিশেষ সুর আছে। 'কথা ছিল বেঁচে থাকার' কবিতাটি এই সব কথার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

এই কবিতার নামেই বোঝা যায় কবিতার ভেতরে নিজের অস্তিত্বসহ, পরিচয়সহ বেঁচে থাকার বিশেষ প্রবণতা। কারণ জীবনকে বাঁচানোই হল জীবের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্ম ধর্ম। নিজে না ঠিকে থাকলে তো আর কিছুই নেই। আর এই প্রতিকূল পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা বড় কঠিন। ডারউইনের মত কবি বলছেন এই পৃথিবীতে তারাই বাঁচতে পারবেন যারা 'Survival of the fittest'?

"যতটুকু জানি, তার চেয়ে বেশি আমি জানি না
যতটুকু মানি, তার থেকে বেশি আমি মানি না
অথচ সব কিছু মেনে নেয়ার কথা ছিল
সবকিছু জেনে নেয়ার কথা ছিল।"

এই জানা মানা বেঁচে থাকাটাই অস্তিত্ববাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই টানাপোড়েনটাই হল অস্তিত্বের প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। কারণ মানুষ নিজেকে জানতে চায় যখন তখন তার সামনে প্রশ্ন ওঠে আমি কে? কেন? কি? এবং সাথে সাথে সমাজ পৃথিবীর রীতিনীতি নিয়মকানুন এইসব সম্পর্কে কথা ওঠে জিজ্ঞাসা জন্মায়। আর কবি এই কথাটাই বলছেন। সব কিছু জেনে নেয়ার কথা ছিল, সবকিছু মেনে নেয়ার কথা ছিল। অথচ কিছু পারেননি কারণ জীবনটা পৃথিবীটা তো এত সহজ না। আমাদের সমাজ ধর্ম পরিবেশ প্রকৃতি কোনদিন কোনও সময়ই অনুকূল তাকে না কয়েক মুহূর্ত ছাড়া। এখানে নীৎসের কথা, কির্কেগার্দের কথা, সার্ত্রের কথা মনে পড়ে—তারা এইসব জিনিস বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। কবিও বলছেন—

"কথা ছিল বেঁচে থাকার
কথা ছিল যেচে দেখার
কথা ছিল কিছু শেখার
অথচ কিছুই হয়।"

পৃথিবীর পথে হেঁটে কবি দেখেছেন পৃথিবীটা স্বপ্ন নয়, জীবনটা কল্পনা নয়। জীবনের মাঠ চাষ করে বাঁচাটাই তো প্রকৃত বাঁচা, আসল বাঁচা। জীবনকে বারবার নির্মাণ বিনির্মাণ করে যেচে দেখাটা হল জীবনের মানে জানা, জীবনের স্বাদ পাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে শেখা অভিজ্ঞতা অর্জন করা। কিন্তু কবি কিছুই করতে পারেননি। তাঁর দ্বারা কিছুই হয়নি এখানে। এর জন্য ভেতরে ভেতরে একটা হতাশাবোধ কাজ করছে তাঁর মনে।

"উদাসীন প্রকৃতি আমার হাড়-পাঁজরে
ঘণ্টা বাজায়"

এখানে নিয়তিবাদ ও প্রকৃতিবাদের একটা হালকা ছোঁয়া আছে। নিয়তিকে কেট পাল্টাতে পারেনি। প্রকৃতিকে কেউ বদলাতে পারেনি। নিজ নিজ বৃত্তে তারা এমনেই ঘুরতে থাকে। এই আবর্তনকে পরিবর্তন করা জীবের অসাধ্য। কিন্তু কবি এতে দুঃখী নয় তিনি উদাসীন, প্রকৃতির রূপ দেখে কষ্ট পাচ্ছেন। এই উদাসীনতা তাঁর বুকে পাঁজরে ঘণ্টা বাজায়। এখানে কবি কি রকম করে বেঁচে থাকবেন সম্পূর্ণ!

"বুকের ভেতর মাছির বাসা
পদ্ম পাতার ভেতর মণি চুপ্‌টি যেন
অন্ধ আমি,

দেখতে তোমায় চাইনি আমি হে পৃথিবী উৎস তোমার।
অথচ কথা ছিল অনেক দেখার।"

মাছি হল রোগের ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়া ছড়ানোর প্রতীক। আর অন্য অর্থে আমরা জানি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মাছির হাজার চক্ষু। অর্থাৎ বুকের ভেতরে অনেক অসুখ রোগ। আমি জানি সব অথচ পদ্ম পাতার ভেতরের মণির মতন কবি অন্ধ। কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। পৃথিবীর উৎস রহস্য এই সবকে কবি দেখতে পাচ্ছেন না। কারণ তিনি নিজের ক্ষমতাটুকু জানেন। আর তার এই ক্ষমতা নির্ধারণ করে তার নিয়তি ও প্রকৃতি। তাই হতাশায় বলছেন যে অনেক কিছু দেখার কথা ছিল গভীরভাবে। কবির কাছে বাঁচাটা হল জীবনকে চাষ করে বাঁচা। তবুও ভালোভাবে বাঁচতেও পাচ্ছেন না!

"তবে কেন আমি মরে মরে বেঁচে আছি?
তার চেয়ে তো ভালোই ছিল মরে যাবার
কথা ছিল বেঁচে থাকার।"

এতসব কিছু জেনে কবি কিছুই করতে পাচ্ছেন। আমরাও কি কিছু করতে পারছি! এটা আমার কথা না তোমার কথা না। আমাদের অস্তিত্বের কথা, বেঁচে থাকার কথা, জীবনের কথা। কিছু করতে না পারায় কবি অন্যরকম করে বলছেন কেন মরে মরে বেঁচে আছি. তার চেয়ে ভালোই ছিল মরে গেলে। কিন্তু এই মরাটা শুধু মরা না। এটা T.S.Eliot এর 'Journey of the Magy'-র মৃত্যু। অর্থাৎ জীবনকে এখান থেকে নবমাত্রায় নবপর্যায় শুরু করা। কবির সাথে আমরাও এই প্রত্যয় রাখি।

এই কবিতার মধ্য দিয়ে কবি আরেকটা জিনিসও দেখাতে চেয়েছেন যে আমরা এই পৃথিবীতে কি রকম করে বেঁচে আছি? এই বেঁচে থাকাটা কতটুকু অর্থপূর্ণ ! আর ঠিক এই জায়গায় মনে হয় সুনীল গাঙ্গুলীর সেই বিখ্যাত কবিতাটার কথা—'আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ' । কবি জলাল উদ্দিন লস্করও ঐ নিখিলেশ অর্থাৎ পৃথিবীকে নিজের হয়ে আমাদের বেঁচে থাকা তুলে ধরতে চেয়েছেন।

মনোতোষ চক্রবর্তী

এই বাড়ি

কবি মনোতোষ চক্রবর্তী একজন প্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি এক নয়া রূপ পেয়েছে। খুব চেনাজানা শব্দ ব্যবহার করেন তিনি, যা পাঠকের পঠনে সহজবোধ্য। বরাক উপত্যকার আধুনিক কবিদের মধ্যে তিনি একজন উল্লেখযোগ্য কবি। খুব বেশি কবিতা লিখেননি। তবে যেটুকু লিখেছেন তা অনেক ওজনদার। আর এই রকম একটা কবিতা হল 'এই বাড়ি'।

এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব স্বনির্ভরশীলবোধ থাকা একান্ত জরুরি। যেখানে মানুষ এই বোধটুকু সবসময় মনে রেখে এগিয়ে চললে Standard living এমনেই চলে আসে জীবনে।

"দারিদ্র্য চিহ্নিত এই বাড়ি—
ঝুলকালি, নিকানো বেড়ার গন্ধ, বাঁশের জানালা
তবু তার আভিজাত্য আছে পুকুর পাড়ের পথে আছে তার
শান্ত নিমগাছ
আাছে বিশাল-স্তম্ভিত পুকুরের কালোজলে ছায়া
আছে পাতিহাঁসের সাঁতার—"

বাড়িতে দারিদ্রতার চিহ্ন থাকুক না কেন জীবনবোধ তো আর দরিদ্র হতে পারে না কখনও। কৃত্রিম জীবনে সুখ

বেশি সময় ঠিকে থাকে না। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন ধারণ করার সুখবোধ সবচেয়ে গাঢ় এবং গভীর। এখানে কবি কিন্তু ভেতরে ভেতরে গ্রামীণ জীবনকে উত্তম মনে করছেন। এখানে শাহরিক যান্ত্রিকতা জটিলতা নেই। কিন্তু প্রাকৃত জীবনবোধ সবচেয়ে বেশি। খোলা আকাশের নিচে, মাঠের ঘাসের গন্ধ বাতাসে ঢেউ দিয়ে আনে চারপাশ থেকে। তখন মনে হয় জীবনটা সবচেয়ে প্রাকৃতিক সুখকর যা কবি চান। আরমাও।

"এই বাড়িতেও আসে দীন-ভিখিরিরা
একমুঠো চাল ভিক্ষে চেয়ে
এই বাড়িতেও নেমন্তন্ন আসে
আসে শীত ছয় ঋতু।"

শাহরিক আবহাওয়া ও পরিবেশটা অন্যরকম। এখানে মানুষের জন্য কোনও মানুষেরই সময় নেই একটুও। সব 'ভাড়াটে কুটির' মানুষ—মানসিকতাও। কিন্তু এইসব বাড়িতে দরিদ্ররা আসে, ভিখিরিরাও। মানুষ হিসেবে তারাও উপযুক্ত দাম পায় তারাও, কখনও তৃষ্ণার জল ক্ষুধার খাদ্য তারা নিমন্ত্রণ হিসেবে খায় —পায়। আত্মিয়তা আছে ঘরে ঘরে। একে অপরের জন্য ভাবে— 'সময় দেয় মানুষের জন্য মানুষ'—সেই বোধ উজ্জ্বল এখানে। এখানে ছয়টা ঋতুকে খুব ভালো করে জানে মানুষেরা—বুঝেও, অনুভব করে উপলব্ধি করে গভীরভাবে।

"এখানে উৎসব আসে বারোমাস যদিও দুঃখের
টানাপোড়েনের
তবুও এখানে জীবনের অমোঘ স্পন্দন
ভাষাহীন পড়ে আছে
স্থির।"

এই সব প্রাকৃত জীবনে প্রাকৃত অভিজাত বাড়িতে উৎসব হয় বারোমাস ধরে। এই পৃথিবীর পূজাপার্বণ উৎসব সংস্কার লোকসংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে এই সব প্রাকৃত মানুষেরা। High Class আর High Society-র মানুষের তো সময় নেই। সংস্কার কুসংস্কার মিলিয়ে লোক সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ তারাই বাঁচিয়ে রেখেছে— রাখবেও চিরকাল। যদিও এই সব প্রাকৃত মানুষের খুব একটা অর্থবিত্ত নেই, নেই টাকা পয়সা ধনসম্পদ। তারা বেশি চায়ও না। খেয়ে বেঁচে গেলেই হয়ে যায় তাদের। আর তার মধ্য দিয়ে জীবনের অমোঘ সুখস্পন্দন। এই জিনিসগুলি ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না—প্রকাশ করা যায় না। কবি সেই বাড়ির কথা—সেই প্রাকৃত বাড়ির কথাই 'এই বাড়ি' কবিতায় তুলে ধরেছেন।

শাহজাদী

কবি মনোতোষ চক্রবর্তী 'শাহাজাদী' কবিতায় প্রেমকে এবং জীবনকে এক নয়া রূপ দিয়ে উপস্থিত করেছেন। এখানে জীবন ও প্রেম আধুনিক। নাগরিক জীবনের অনেক ছবি তার মধ্যে ফুটে ওঠেছে। 'শাহাজাদী' শব্দটার ভেতরে অনেক কথা লুকিয়ে আছে। এ শাহাজাদী কিন্তু আধুনিক পৃথিবীর মানুষ।

"ক্যান্টিনে আড্ডায় তুমি ততটা উজ্জ্বল নও যেমন ভ্রমণে
নারীকে উজ্জ্বল করে তোলে তার প্রকৃত প্রেমিক—এছাড়া নারীর
রূপ, গুণ, গান, ভালোবাসা ব্যর্থ—ব্যর্থতার জন্য আছে পণ্ডিচেরি,
রামকৃষ্ণ মিশন।"

আড্ডা একা হয় না—কয়েকজন মানুষ না থাকলে। কিন্তু আজ এই সব আড্ডায় ক্যান্টিনে প্রেম ততটা উজ্জ্বল নয়। অর্থাৎ কবির এই শাহাজাদীও আজ ওদের সাথে মিশে যাচ্ছে। নারীকে আরও উজ্জ্বল করে রাখে তার প্রকৃত প্রেমিক। কিন্তু আজ কি প্রকৃত প্রেমিক আছে এই পৃথিবীতে? আছে তবে তার সংখ্যা বেশি নয়। তাই তো প্রেমিকারা আজ শাহাজাদী হতে পারে না। তাই এইসব শাহাজাদীরার রূপ, গুণ, গান, ভালোবাসা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আর রূপ গুণ

ভালোবাসা যদি ব্যর্থ হয় তবে পণ্ডিচেরি বা রামকৃষ্ণ মিশনও ব্যর্থ। কেন না রামকৃষ্ণ মিশন তো ভালোবাসার প্রচারক। মানুষের মনকে উজ্জ্বল করার আধার।

''তবু দুঃখ পাই, তোমার প্রকৃত মূল্য স্থির করে আয়কর বিভাগ
জীবন বীমায় বাঁধা তোমার জীবন
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের লকারে থাকে তোমার গহনা।''

আজকের পৃথিবী প্রায় বেশির ভাগ নাগরিক। কারণ পৃথিবীর সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ খাপ খাইয়ে চলতে শিখে। তারা জানে আমি যদি তাদের সাথে তাল মিলিয়ে না চলতে পারি তবে পিছিয়ে পড়ব প্রতিযোগিতায়। এভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রকৃত জীবন থেকে সরে গিয়ে কৃত্রিম ও যান্ত্রিক জীবনের দাস হয়ে যাই। কিন্তু আমরা টের পাই না। আমাদের ভেতর থেকে অনেক কিছু হারিয়ে যায়। আর কিছু শৃঙ্খল আমাদেরকে শেকলে বেঁধে নেয়। এই গদবাঁধা নিয়ম রীতিনীতিই আমাদের প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করে। যা আসলে আসল নয়, প্রকৃত নয়—কেবলই মেকি।

জীবনবীমা আমাদের মূল্য নির্ধারণ করে। আমাদের গয়না যা দিয়ে নিজেকে আরও সুন্দর করতে পারি উজ্জ্বল করতে পারি—পরিশীলিত করতে পারি। সেই সব জিনিস রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের লকারে লক করা থাকে। আর আমরা বুঝতেই পারি না আমাদের বয়স হয়ে যায়। সময় চলে যায় কিন্তু আমাদের জীবন বেশ দিন বাকি থাকে না। এই জীবনবোধকে তুলে ধরছেন।

''তোমার প্রকৃত মূল্য প্রাপ্য আজ রূঢ় অবাস্তব স্নিগ্ধ কল্পনাপ্রবণ
তরুণ কবির কাছে
ওর বিষণ্ণ স্বপ্নের পাশে তোমার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে দাঁড়াও একবার
তোমার দৃষ্টির মূল্যে বৃষ্টির মতন ঝরে, ঝরে ঝরে পড়ে লক্ষ দিনার
ভিখিরিরা কিছুটা কুড়ায় তার, বাকিটা মাটির নীচে প্রত্নতত্ত্ব হয়
তুমি জেনে রাখো, একমাত্র কবির সংস্পর্শ ছাড়া ঐ রূপ কোনোদিন
তৃপ্ত হবে না।''

এত সময় কবি শাহাজাদীর আধুনিক অবক্ষয়ী রূপটার কথা বলেছেন। এবং তাকে রক্ষা করার জন্য বলছেন আজ তার মূল্য একমাত্র কল্পনাপ্রবণ তরুণ কবিই দিতে পারে। কারণ তিনি বাস্তবকে ঘেটে দেখেছেন এখানে শাহাজাদীর বেঁচে থাকাটা আর হবে না। বলছেন বিষণ্ণ স্বপ্নের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ওই কবির কাছে। তোমার উজ্জ্বলতা সে আবিষ্কার করবে নিশ্চয়ই। কিছু নিঃস্ব মানুষ হয়তবা ভিখিরি তারাও কুড়াবে তোমার এই রূপ দৃষ্টি থেকে রূপের দিনার। যারা এতদিন পায়নি কিছু—কিন্তু খুঁজেছে চারদিকে। আর বাকিটুকু প্রত্নতত্ত্ব হয়ে রবে উত্তরাধিকারের জন্য। কবি বলছেন শাহাজাদী তোমার এই গভীর অর্থপূর্ণ মধুর রূপ কোনদিন তৃপ্ত হবে না। যদি কোনও কবির স্পর্শ পায় না তোমার সৌন্দর্য রূপ।

এই কবিতার ভেতরে আরেকটা জিনিসও দেখাতে চেয়েছেন যে অবক্ষয়ী আধুনিকতার ধারক ও বাহক আজকের প্রেমিক প্রেমিকারা। যেখানে প্রেমটা গৌন হয়ে যায়। এই প্রেম ও জীবন এই দুটা জিনিসের আসল মূল্য অর্থের কথা বলছেন। প্রেমকে উজ্জ্বল করে দেখতে চান কবি। আমরাও।

স্তোত্র

মালাবার রেস্তেরাঁয় একটি অসমিয়া মেয়েকে দেখে কবির হৃদয়ে যে আলোড়ন হয়েছিল—সেই সব পদার্থ দিয়ে 'স্তোত্র' কবিতাটি রচনা করেছেন। মানুষ যে রকমই হোক না কেন আসল হল তার মন। মন যে রকম মানুষ সে রকমই

হয়।

"মালাবার রেস্তোরাঁয় কে ঐ মেয়েটি?
ঠোঁটে স্নিগ্ধ অসমীয়া ভাষা
চুলে ঢেউ, স্বরে সংগীতের স্তোত্র হয়ে ঝরে যায় কথা"

মালাবার রেস্তেরাঁয় কে ঐ মেয়েটি যার ঠোঁটে স্নিগ্ধ অসমিয়া ভাষা, চুলের সুন্দর ভঙ্গি, কণ্ঠে গানের স্তোত্র হয়ে ঝরে যায় কথা। ঐ মেয়েটির স্মার্টনেস দেখে কবির মনে এক গভীর আকর্ষণ হয়েছে। এ আকর্ষণ কিন্তু ভালো লাগার। যখন কোনও মানুষের কোনও কাজ ভঙ্গি চলন ভালো লাগে তখন মনে এক ধরনের স্ফুর্তি আসে। আর বিস্ময়ে ভেতর থেকে তার জন্য কোনও বাক্যবন্ধ বা ভাব বার হয়ে আসে। ঠিক কবিরও সে রকম হয়েছে। তাই বলছেন—

"কত-বা বয়স তার চোদ্দ বা পনের বছরে
পৃথিবীকে ধরে আছে নিজের মুঠোয়
প্রেমিকের সঙ্গে তার এখানে সাক্ষাৎকার"

কতই বা হবে এই মেয়েটির বয়স—চৌদ্দ পনেরো। এই বয়সে পৃথিবীকে মুঠোয় করে ধরে আছে। আর এখানে তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সে। এখানে কবি আরেকটা কথা বলছেন উল্টো করে বললে হবে তা যে যেখানে নারী রক্ষণশীলতার বন্দিশালায় বন্দি সেখানে ঐ মেয়েটি পৃথিবীকে মুঠোয় করে নিয়েছে। এই উন্নতি প্রগতি দেখে কবি মনে মনে প্রকাশ্যে অনেক খুশি। কবির সাথে আমরাও এই পরিবর্তন চাই। আধুনিক মননশীল এই সব মেয়েরা যদি এগিয়ে আসে তবে তাদের সঙ্গে আরও অনেক মেয়েরা এগিয়ে আসবে। পাকঘরের বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে এসে অন্তত দুনিয়াটাকে তো দেখবে। আর তারা এগিয়ে আসলে সমাজের উন্নতি মানুষের উন্নতি। কারণ হল পুরুষেরা একা অর্ধেক পৃথিবী।

"পাশের টেবিলে আমি একা, লক্ষ্য করি,—
মেয়েটি ভ্রূক্ষেপহীনা,—সহসা দিনের ক্লান্তি নিভে যায়
আর রাত্রির আঁধারে গোপনে রচিত হয়
রূপে ও সংগীতে মেশা অলৌকিক
সান্ধ্য-স্তোত্রমালা।"

কবিও ছিলেন সেখানে তাদের পাশের টেবিলে একা। তারা প্রেমিকযুগল লক্ষ করেনি কিন্তু কবি তাদের খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। এই মেয়েটি বেপরোয়া অর্থাৎ ভ্রূক্ষেপহীনা। যা আধুনিক মননের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দুজন প্রেমিকজোড়ার পাশে একা বসে যে আনন্দ লাভ বা উপভোগ হয়—কবি সেই আনন্দ উপভোগ করছেন দূর থেকে। কিন্তু হঠাৎ করে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আর রাতের অন্ধকারে গোপনে রচিত হয় রাত্রির সেই অপরূপ রূপে ও সংগীতে মেশা কোনও 'অলৌকিক সান্ধ্য স্তোত্রমালা'। এখানে কবিতাটা শেষ। কিন্তু পাঠকের মনে আরও অনেক কথা ওঠতে থাকে—তারপর কি হল? তারপর? তারপর?

কিন্তু এখানেই মনে পড়ে যায় প্রিয় কবি জীবনানন্দের সেই বিখ্যাত কবিতার শেষ স্তবক—

"সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে— সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

পাথরের সঙ্গে পাথরের সম্পর্ক

কবি মনোতোষ চক্রবর্তীকে শহরের বা শাহরিক কবি বলা যায় না ঠিক। কারণ তাঁর কবিতায় যেসব শব্দ বা শব্দ সংযোজন আছে তার প্রায় বেশিরভাগ গ্রামীণ। কিন্তু তবুও তিনি শহরের কবি। কেন না আজকের গ্রাম কি গ্রাম রয়েছে আর আজ! তবে এই কবিতায় একটু বেশি নাগরিক কবি।

এই কবিতায় কবি একটু বেশি সমাজ সচেতন ও মানবিকতা সচেতন। অবক্ষয়ী আধুনিকতার দীক্ষায় মানুষ কিভাবে একজন আরেকজন থেকে সরে পাথর হয়ে আছে তাই দেখাতে চেয়েছেন। কবি বলছেন—

"পাথরের সঙ্গে পাথরের সম্পর্ক, ঠিক এমনই
হয়ে পড়তে হবে আমাদের একদিন।
চলন্ত জিপ্‌গাড়ি থেকে তিরাপ নদীর খরস্রোতে
দেখেছি পাথরের পাশে পাথর স্থির
ফাঁক-ফোকরে জল তারপর বর্ষার অঢেল বন্যা, স্রোত
পাথরের পাশে স্তব্ধ পাথর দেখেছি আমি কত।"

পাথর যে রকম নিঃসার জড় পদার্থ । একদিন আমরাও এ রকম হয়ে যাব—হয়ে যেতে হবে। সময়ের এই তীব্রতর বেগে কবি দেখেছেন যে পাথরের পাশে পাথর স্থির। আর ফাঁক দিয়ে জল বর্ষার অঢেল বন্যা স্রোত চলছে। আর কিছু না। ঠিক সে রকমই আজকের মানুষ। আজকের মানুষের সম্পর্কও। সবাই ছুটছে কারুর জন্য তিল মুহূর্ত সময় নেই এই নাগরিক পৃথিবীতে—শহরময় পৃথিবীতে। এক একজনের মাঝখানে কত ফাঁক হয়ে গেছে—সব ভাড়াটে কুটির মানুষ। প্রয়োজন ছাড়া কেউ কারুর সাথে কথা বলে না— সুখ দুঃখের কথা তো যাক্। এখানে মনে পড়ে জীবনানন্দের কবিতার লাইন—

"দুরে কাছে কেবলি ঘর ভাঙে
গ্রাম পতনের শব্দ হয়;"

এইভাবে সব ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। মানুষ এখন সবচেয়ে স্বার্থপর জীব। শুধু একা সুখে থাকতে চায়। অথচ অন্যকে সুখে থাকতে দিতে চায় না। অন্যের সুখ দেখলে হিংসে হয়—ছিনিয়ে নিতে চায়। কারুর উন্নতি দেখলে তাকে ডুবাতে চায়। কেউ উপরে ওঠলে তাকে নিচের দিকে টানে। এটা হয়ে গেছে আজকের আধুনিক মানুষের আরেকটা (Negative) বৈশিষ্ট্য। তাই আমরা ক্রমে পাথর হয়ে পাথরের সাথে পাথরের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছি।

"আমাদের সমস্ত কথা একদিন শেষ হয়ে যায়
ভাষা ভাষার কাছে পৌঁছতে পারে না আর
আমাদের চিঠি লেখালেখি একদিন বন্ধ হয়ে যায়
শব্দ শব্দের কাছে পৌঁছতে পারে না আর
অক্ষর-প্রতিমার ভেতর ফুটে ওঠে না আমাদের প্রতিবিম্ব
বাক্যহীন, শব্দ-হারা অন্ধকার তেড়ে আসে তখন।"

এইভাবে একদিন আমাদের বয়স হয়ে যায়। আর শেষ হয়ে যায় সমস্ত কথা ইচ্ছা অভিপ্রায় স্বপ্ন কল্পনা। আমাদের ভাষা ভাষায় কাছে পৌঁছাতে পারে না আর। আমাদের চিঠি লেখালেখি বন্ধ হয়ে যায়। একে ওপরের চিঠির অর্থাৎ আপনবোধের খবর নিতে পারি না। আর আমাদের চিঠির কথা শব্দ আমরা যা চাই তার পাশে পৌঁছাতে পারে না। আমরা যা লিখি প্রকাশ করি তা সে রকম রূপ পায় না, প্রকাশ পায় না। কারণ এখন আমরা যান্ত্রিক হয়ে গেছি—কৃত্রিম হয়ে গেছি অনেক বেশি। আর যেদিন আমাদের সব শেষ হয়ে যায়—তখন সব কিছু বাক্যহীন হয়ে যায়। চারদিকে অন্ধকার তেড়ে আসে। পাথরের সাথে পাথরের সম্পর্কে পড়ে আমরা কেবলই ভোগতে থাকি একা একা। তারপর কবি বলছেন—

"স্তব্ধ পাথরের পাশে স্তব্ধ পাথরের মতো বসে থাকতে হয় পাথর
আমাদের কথা বলা হয় না, চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না পাথর
একজনের ছায়ার পাশে অন্য আরেকজন মৌন, শান্ত, স্থির পাথর
খরস্রোতা নদী সব জানে, তার বুকের উপর সারি সারি পাথর।"

নিঃস্বাড় পাথরের মতো আমরা একে অপরের পাশে পড়ে রই। যেন দুই মেরুর দুই বাসিন্দা। আমাদের কথা বলা হয় না ভাব বিনিময় হয় না। ভেতরের কথা আর কাউকে বলতে পারি না। আমরা একজন অন্য আরেকজনের ছায়ায় পাশে বসে থাকি নিরবে কত শান্ত, স্থির হয়ে পাথরের মতো। দুর্নীতিগ্রস্ত পৃথিবীতে কোথাও কোনও প্রতিবাদ নেই। চুরের ছায়ার চুর, গুণ্ডার ছায়ার গুণ্ডা, মন্ত্রীনেতার ছায়ায় খুনি ডাকাত চুর গুণ্ডা পোষা। কোনও সুপথ নেই—যেখানে আমরা কাউকে আপন বলি। কাউকে এখানে আপন হিসেবে পাওয়া এত সহজ নয়। অফিস আদালত ন্যায় বিচার সবখানে দুর্নীতি। মানুষ কোথাও নিরাপদ নেই—কোথাও গিয়ে একটু মানবিকতার ছায়া পাচ্ছে না। কারণ পরিচালক, পরিচালনা অর্থাৎ শেকড়েই রোগ। সময় সব কিছু জানে তার বুকে কেবল সারি সারি পাথর তাই উন্নতি অগ্রগতি প্রগতির কোনও পথ দেখা যাচ্ছে না। মানুষ বড় অসহায়—পাথর।

"স্থানবদল করে তুমি বেড়াতে যাও একজায়গা থেকে অন্য জায়গায়
আমার চিঠি তাড়া করে যাবে না তোমার পিছু পিছু
পাথরে সঙ্গে পাথরের সম্পর্ক ঠিক এমনই
হয়ে পড়তে হবে আমাদের একদিন।"

এই সম্পর্ক ভাব আবেগ মানসিকতা মানবিকতা সভ্যতা মনুষ্যত্ব এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবে—যায়। কিন্তু কবি বলছেন এই স্থান বদলালেও কবির চিঠি যাবে না সেখানে। এই অবস্থার পিছে পিছে কবির কথা পৌঁছাবে না। কারণ সময়সচেতন কবি জানেন সময় চিরদিন সমান যায় না। আমাদের বয়স হয়ে গেলে আর পরিবর্তন আসবে না। পাথরের সঙ্গে পাথরের সম্পর্কের মত আমরাও আবদ্ধ হয়ে যাব। হয়তবা আমরাও পাথরের মতো হয়ে যাব পাথর।

কবিতাটি যেখানে থেকে শুরু হয়েছে সেখানেই এসে শেষ হয়েছে। কবি পৃথিবীকে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, যেখানে মানুষ পাথরের মতো হয়ে গেছে—হয়ে যাচ্ছে। সেই চরম বাস্তব রূপকে তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি এই কবিতার মধ্যে দিয়ে। এখানে T.S. Eliot এর The Waste Land কবিতাটির কথা মনে পড়ে—

"There is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road."

মঞ্জুগোপাল দেব

বাপীকে

বরাক উপত্যকার কবিদের কবিতায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে যুক্তিপ্রমাণের একটা দৃষ্টিকোণ আছে. সেই সব কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন কবি হলেন মঞ্জুগোপাল দেব। তাঁর কবিতায় বাস্তব জিনিসটা একটু বেশি স্থান পেয়েছে। তিনি জানেন জোর করে কোনও কিছুকে মিলিয়ে দিলে হয় না—বাস্তবের সাথে তার মিল থাকতেই হবে। এই ধাতু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন 'বাপীকে' কবিতাটি।

কবিতাটির নাম 'বাপীকে'। এ বাপী কবির প্রেমিকা হতে পারে! ভালোবাসার আধার হতে পারে। এই বাপীর সাথে কবির সম্পর্কের কথাই বলছেন এখানে।

"আমি আছি, শব্দ আছে
শব্দের ভেতর শব্দ, তার ভেতর
নিরবয়ব শূন্য-স্তব্ধ মাঠ..."

কবির অস্তিত্ব আছে তাই কবি আছেন। তাকে ধরা ছোঁয়া যায়। শব্দ আছে শব্দের ভেতরে শব্দরা আছে। আর তার ভেতরে শব্দ ও শব্দের ভেতরে আকারহীন শূন্যতা অবয়বহীন মাঠ। যেখানে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। কবি ঘুরে ফিরে কেবলই নিজেকে খুঁজে পান। তাই শুধু তাঁর নিজের উপর বিশ্বাস আরও ঘাঢ়তর হয়। মানুষ যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেকে দেখে—দেখে নিজের এইসব সম্পর্ক তখন এখানে তার কোনও মানে অর্থ আর থাকে না। সম্পর্কটাও স্বার্থহীন হয়ে আর ওঠে না।

"ভালোবাসা কি ফুল?
নাকি সার্জন?
তা হলে তুমি নার্স!
আমার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে
ট্রের 'পর সাজিয়ে রেখো
দেকবে কোথাও ভালোবাসার ছিটে-ফোঁটাও নেই।"

কবি তাঁর প্রিয়াকে তাদের সম্পর্ক যে 'নিরবয়ব শূন্য-স্তব্ধ মাঠ' তার প্রমাণ দিচ্ছেন এভাবে। ভালোবাসাটা কি ফুল ? নাকি সার্জন? যদি তা হয় বাপী যেন নার্স। প্রিয়াকে কবি বলছেন আমার প্রতিটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে কেটে একটা থালায় সাজিয়ে রাখো। দেখবে এখানে কোনও ভালোবাসার ছিটেফোঁটাও পাবে না। আজকালকার এই যান্ত্রিক কৃত্রিম জীবনে মানুষ শুধু স্বার্থের জন্য সম্পর্ক বাঁধে। সেখানে প্রকৃত ভালোবাসা ও প্রেমকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কবি জানেন আজকে পৃথিবীর ভালোবাসার মানে ভালোবাসা নয়—প্রেমের মানে প্রেম নয়। তাই এই মিথ্যা মায়াময় বন্ধনকে কেটে কেটে ভালোবাসা ও প্রেমকে দেখার প্রস্তাব দেন তার বাপীকে।

"শুধু—
শব্দের পর শব্দ
ধ্বনির পর ধ্বনি
তার ভেতর শুয়ে আছি যেন
নিরবয়ব স্তব্ধ-শূন্য মাঠ!"

মানুষকে অস্ত্রপচার করে কেটেকুটে ভালোবাসা খুঁজলে শুধু শব্দের পর শব্দ মেলে, ধ্বনির পর ধ্বনি। আর এইসব শব্দ ধ্বনির ভেতরে কবিকে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় তার মাংস রক্তকে—আর কিছু না। কবিকে এখানে পাওয়া 'নিরয়ের স্তব্ধ শূন্য মাঠ' হয়ে পড়ে থাকেন। এটা কবির কথা নয়—আজকের ভালোবাসা কতটুকু অর্থময় তা দেখাতে চেয়েছেন। মানুষের ভেতরের ভাব আবেগ অনুভব বোধ অনুভূতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে পোষ্টমর্টেম করে খুঁজে পাওয়া যায় না। কবি জানেন সে কথা। তবুও তিনি এ রকম খুঁজে দেখার কথা বলছেন। তার অর্থ হয়তবা এ রকম পৃথিবী আজ গভীরতর অসুখ রোগী। এখানে প্রেম ও ভালোবাসার রূপটা তুলে ধরতে চেয়েছেন। এখানে রাজশেখর বসুর 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। তারপর কবি বলছেন—

"আমি কি সন্ন্যাসী?
রসায়নে কেলাসিত ভালোবাসা—
তার ভেতর আমি... শূন্য স্তব্ধ মাঠ...
তোমার জমাট ভ্রূণের ভেতর কি আমি?
জনারণ্যে উদাস হাওয়ায় খোলস ছেড়ে
শুয়ে থেকো বহুকাল।"

কবি নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করছেন আমি কি সব মায়ামোহ থেকে মুক্ত? এই সব ভালোবাসা প্রেমের মধ্যে আমিও তো আছি। শূন্য-স্তব্ধ মাঠ হলেও কবির একটা কাঠামোহীন অস্তিত্ব তো আছে। প্রিয়ার জমাট ভ্রূণের ভেতরে কি আছেন কবি? যেখানে খুঁজি কবির অস্তিত্ব শূন্যতায় মিলে যায়। একটা শূন্যতার মাঠ পাওয়া যায়। মানুষের বিশাল

ভিড়ে উদাস বাতাসে খোলস ছেড়ে কবির প্রিয়া শুয়ে থাকে বহুকাল। অর্থাৎ এইভাবে মানুষের ভিড়ে সব কিছু হারিয়ে যায়—প্রিয়াও। তবে ভালোবাসা ও প্রেম কোথায়? কোথায় যায়? কবির সাথে আমরাও সেই জিনিসটা খুঁজছি। আমাদের প্রেম ও ভালোবাসা শুধুই কি শূন্য-স্তব্ধ মাঠ?

দীনেশলাল রায়

সুজন মাঝি

'সুজন মাঝি' কবিতাটিতে অস্তিত্বচেতনার এক গভীর রূপ ধরা পড়েছে। কবি দীনেশলাল রায়ের অনেক লেখায় এই অস্তিত্বের ঠিকে থাকার/রাখার এক বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীটার রূপ ক্রমে বদলাচ্ছে দিনদিন। এখানে মানুষ বাঁচতে পাচ্ছে না সহজ সরল হয়ে। কবির মতে অস্তিত্বযুদ্ধই এখানে বাঁচার একমাত্র হাতিয়ার।

''রাঙ্গা মেঘের ভোর আকাশে ডিঙ্গি ভাসাও সুজন মাঝি
বুকের খাঁচার শুকসারীকে শেখাও বুলি মাভৈ মন্ত্র
ভালোবাসার অমল ফুলে কীটের দশন তীব্র আজি
চারিপাশের ছায়ার নীচে ভরাডুবির ষড়যন্ত্র—"

রাঙ্গা মেঘের ভোরের আকাশে সুজন মাঝি তোমার ডিঙ্গিটা ভাসাও। বুকের ভেতরে তোমার যে সত্তা লুকিয়ে আছে তাকে তুমি শেখাও অভয় মন্ত্র। কেননা আজকের পৃথিবীতে ভালোবাসার পরিস্কার ফুলেও বিষাক্ত কীটের বাস—তীব্র দংশন। আর চারপাশে যে সব ছায়া রূপ দেখা যাচ্ছে তার পেছনে মানুষের ভরাডুবির ষড়যন্ত্র। অর্থাৎ এই পৃথিবীকে কবি ঘুরে ঘুরে দেখে তার আসল রূপ জেনেছেন দেখেছেন বুঝেছেন। এখানে বেঁচে থাকাটা এত সহজ নয়। কারণ চারপাশের রূপ মানুষকে তার ইন্দ্রজালে বেঁধে রেখেছে। এ সব জেনে এখানে বসে থাকলে হবে না। নিজের জীবনের পট পরিবর্তন বা বাঁকপরিবর্তন করতে হলে গভীর সাহসে ভেতরের অস্তিত্ব সত্তাকে মাভৈ মন্ত্র শিখিয়ে এই শ্বাপদসংকুল জনসমুদ্রে ডিঙ্গি ভাসাতে হবে। এ যাত্রা অনন্ত—জীবনকে নতুন করে পাওয়ার, নির্মাণের বিনির্মাণের। তাই কবির সতর্ক-বাণী উচ্চারণ—

''সুজন মাঝি—
সমঝে চলো—
সুজন মাঝি—
বদর বলো—"

এ কোন্ 'সুজন মাঝি'? আর কোন্ সুজন মাঝিকে সমঝে চলার কথা বলছেন কবি? কোন্ মাঝিকে বদর বলার কথা বলছেন? এই 'সু-জন' কবির অস্তিত্ব, কবির সত্তা। আর কবির হয়ে আমাদেরও। এই জীবন এক মহাজনসমুদ্র। এখানে সমঝে না চললে নৌকাডুবিতে মরে যাবে আমাদের ভেতরের সুজন মাঝি। মুসলমানেরা সমুদ্র যাত্রায় পাঁচপীরের প্রধান 'বদর'-কে স্মরণ করে। কবিও সেই 'বদর'-কে স্মরণ করার কথা বলছেন সুজন মাঝিকে। কারণ মানুষের লোকবিশ্বাস যে, পীরদেবতাকে নিজস্ব এলাকায় স্মরণ করলে কোনও অমঙ্গল হয় না। বরং জীবনযাত্রা নিরাপদ হয়। এই শব্দের মধ্যে লৌকিক ঐতিহ্য খুব সুন্দর করে সজীব হয়ে ওঠছে।

''রাঙ্গা মেঘের মোহন রূপ বদলে যাবে সাঁঝের বেলা
ঝড়ের দানব মেলবে ডানা মেলবে নখর ভয়াল রূপে
অভয় বন্ধু জানিয়ে দাও মরণকে আজ জীবন আমার কেবল খেলা—
ভালোবাসার বকুল ফুল ঝরবে জেনো বুকের মাঝে চুপে চুপে।"

আকাশের রাঙ্গা মেঘ তার মোহন রূপ বদলে নেবে সন্ধ্যাবেলা। অর্থাৎ আমাদের উপরে ছায়া হয়ে আছে যে

আশ্রয়টা। তা বদলে যাবে আমাদের বয়স হয়ে গেলে। এবং তার সাথে সাথে ঝড়ের দানবরা অর্থাৎ চারপাশের নেতিবাচক শক্তি তাদের হিংস্র রূপ বার করে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে চাইবে। এখানে আমাদেরকে ঠিকে থাকতে হলে ভেতরের শক্তিকে আরও শক্তি দিতে হবে। দুঃসাহসী হয়ে কবি তার সত্তাকে বলছেন 'অভয় বন্ধু' ভয় পেয়ো না। মৃত্যুকে জানিয়ে দেও জীবনই আমার খেলা। কবি মৃত্যুকে ভয় করেন না। আর যারা মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে পারে তারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়। ভালবাসার বকুল ফুল ঝরবে তার বুকের ওপরে লুকিয়ে লুকিয়ে। জীবনকে জয় করতে পারলে জীবন তো আনন্দময় হয়ে যায়। আর তখন তো এমনেই ফুলের বৃষ্টি ঝরে। কবি তাঁর ভেতরের সত্তাকে ও আমাদেরকে এই চেতনা দিচ্ছেন এখানে। তারপর বলছেন—

''সুজন মাঝি সময় হলো
অভয় বন্ধু, কাছি খোলো
বদর বল—বৈঠা তোলো।''

ভেতরে যখন এতটুকু সাহস নির্ভরতা কর্মক্ষমতা অভিজ্ঞতাবোধ থাকে তখনই আমরা কোনওকিছু করার প্রকৃত সময় মনে করি। কবিও বলছেন সুজনমাঝি সময় হয়েছে আমার অভয় বন্ধু কাছিটা খোলো। আবার শুভকার্য শুরু করার আগে বদরের নাম নিয়ে বৈটা তোলো। অর্থাৎ এগিয়ে চলো। থেমে থাকলে তোমার জীবনও থেমে থাকবে। তোমার চারপাশকে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলো। এই চলা জীবনকে আরও সজীব করার—উন্নতি করার—পরিশীলিত করার। এই কথা তো পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানষের কথা। কবিতাটি শেষ করেছেন এভাবে—

''দিগন্তের এই ঝড়ের ডাকে—ভালোবাসাই ধরো না বাজি
রাঙ্গা মেঘের ঘোর আকাশে ডিঙ্গি ভাসাও সুজন মাঝি।''

পৃথিবীর চারদিক থেকে একটা ঝড়ের ডাক বাজছে। এই ডাক জীবনকে জয় করার সাথে পৃথিবীকেও। কারণ জীবনতরীতে মানুষ ভাসতে ভাসতে কত ঘাটে কত হাটে কত মাঠে কত কিছু দেখে। আর এই দেখার সাথে সাথে তাকে বদলাতে হয় তার অনেক কিছু তার জীবনের অনেক কিছু। এবং স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতির টানেও অনেক কিছু বদলে যায়। বদলে যেতে হয়। কেন না মানুষ অস্থির প্রাণী। সে তার জীবন নিয়ে কোথাও একটা স্থানে বসে থাকতে পারে না। তাকে বদলাতে হয় নিজেকে—বদলাতে হয় তার জীবনকে। আর এই বদলানোটা দিগন্তের ডাকেও অনেকটা। নিজস্ব ভালোবাসাটাকে বাজি রাখার কথা বলছেন কবি। দিগন্তের ডাকে নিজের সবচেয়ে প্রিয় ও মূল্যবান জিনিস ভালোবাসাকে সেতুবন্ধন হিসেবে ধরার কথা বলছেন কবি। কারণ কবি জানেন জীবনতরী বেয়ে এগিয়ে চলাটা এত সহজ না। আর এখানে ভালোবাসাটাই সবচেয়ে উত্তম পদার্থ। এই পদার্থ নিয়ে রাঙ্গা মেঘের ঘোর আকাশে থাকলেও সুজন মাঝি হারিয়ে যাবে না। যদি ভালোবাসাসহ সেই সব অভিজ্ঞতা থাকে। যা দিয়ে জীবন জয় করা যায়। এখানে মনে হয় জীবনানন্দ দাশের 'নাবিক' কবিতাটার কথা। যেখানে নাবিকের সবকিছু অতিক্রম করে নিজের অস্তিত্বকে নিয়ে অগ্রসর সূর্যালোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা—নতুন দিগন্তের আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে।

জন্মজিৎ রায়

অন্দর থেকে বারান্দা

মানুষ যে রকম করে চলুক না কেন এই পৃথিবীর একটা হিসেব ও নিয়ম আছে। তার বাইরে যেতে পারে না কখনও কোনদিন মানুষ। অনেকে এই হিসেবটাকে নিয়তি বলে। আরও অনেকে অনেক কিছু। জন্মজিৎ রায়ের 'অন্দর থেকে বারান্দা' কবিতাটা মানুষ এবং তার নিয়তির দ্বিরালাপ। মানুষ যত বড় হয় বা হতে থাকে তার অঙ্ক তত বড় হয় ও হতে তাকে। ভেতর থেকে বিস্ময় কমে যায়। যুক্তি প্রমাণে বিশ্বাস করতে চায় দেখতে চায় তার সেই সব জিনিস যা তাকে

বিস্মিত করেছে—বন্দি করেছে অথবা স্বাধীন করেছে। যা-ই হোক না কেন। কবিও এ রকম একটা বিস্ময় অঙ্কের কথা বলছেন—

''ঈশ্বরবাবু মানে আমার স্মৃতিহীন বাল্যের
অঙ্কের মাস্টারমশাই আমাকে একদিন
বলেছিলেন, 'ক-খ ব্যাসার্ধ নিয়ে
একটি বৃত্ত আঁক তো হে।'
মাস্টারমশাই সেই থেকে
অদ্যাপি নিখোঁজ...''

শৈশবে বাল্যকালে যে জ্ঞান ধ্যান ধারণা আমাদেরকে দেওয়া হয় তা সারা জীবন মনে থাকে। যে রকমই হোক তা। ঈশ্বরবাবু অর্থাৎ কবি বলছেন তার বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাওয়া সেই মাস্টারমশাই যে আজও কবির কাছে নিখোঁজ। যে শিক্ষক কবিকে 'ক-খ' ব্যাসার্ধে বৃত্ত আঁকতে দিয়েছেন। কিন্তু কবিকে শিখিয়ে দিলেন না কি রকম করে? শিশু বাল্যকালের সমস্ত ধ্যান ধারণা বড় হওয়ার সাথে সাথে পরিষ্কার হয়, আবর্জনামুক্ত হয় অর্থাৎ সংস্কার হয়। কবি যত বড় হচ্ছেন—হয়েছেন কিন্তু সেই জীবনধারণ কিভাবে কিরকমভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে সে পথ দেখিয়ে দেননি তার মাস্টারমশাই। তাই তিনি সেই গুরুকে খুঁজছেন যে তাকে জীবনের সেই অংক শিখিয়ে দেবে।

''কালো শ্লেটে আমি কিছু হিজিবিজি লিখি,
ক যদি অন্দর হয়/খ তবে বারান্দা নিশ্চয় জ্ঞ
ইত্যাকার পদ্যও দু'চার,
শ্লেটে ক্রমে রচি এক
সাঙ্কেতিক কোষ...''

প্রথম বয়সে যে চিন্তা পেয়েছিলেন সেই সব চিন্তাকে মিলিয়ে মিলিয়ে ভাবছেন ক যদি অন্দর হয় তবে খ তো বারান্দা হবে নিশ্চয়। নিজের জীবনের মাঠে এই সব আঁকছেন। এবং কিছু পদ্য রচনা করে যাচ্ছেন। প্রথম অঙ্কের শ্লেটে আজও কতকিছু লিখে যাচ্ছেন সাংস্কৃতিক মহাকোষ এক বিরাট জীবনলিপি।

কবি বলছেন কালো শ্লেটে কি লিখছেন তা নিজেই বুঝতে পাচ্ছেন না। সব হিজিবিজি লেখা অর্থাৎ জীবনের শুরুতে যদি বিজ্ঞ পরিচালক না পাওয়া যায় তবে জীবনটা এইরকম হিজিবিজ হয়ে যায়। আর এই হিজিবিজির মাঝখানের কথা কাহিনি বোঝাটা বড় কঠিন হয়। যতই সাংকেতিক হোক না কেন জীবনীকোষটা।

''কাকে যে কেন্দ্র করে বৃত্ত আঁকতে হবে
সেটা আজো যায়নি তো জানা!
অন্দর থেকে বারান্দায় এবং
বারান্দা থেকে অন্দরে আমি
ঘোরাফেরা করি...''

মানুষ যখন কোনওকিছুতে লেগে যায় বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন তার বৃত্ত সেটাই হয়ে যয়। কিন্তু মানুষ যখন দিশাহীন হয় তখন কোথা থেকে কি করবে। কোনখান থেকে শুরু করবে শেষ করবে কিছুই ভেবে পায় না। কবিও বলছেন কাকে কেন্দ্র করে বৃত্ত আঁকবেন সেটা তিনি আজও জানেন নি। শুধু ভেতর থেকে বাইরে আসছেন আর বাইরে থেকে ভেতরে হাঁটছেন। এই বৃত্তেই তিনি ঘুরাফেরা করছেন। মানুষের ভেতরের সেই সত্তার কথা বলছেন যা বাইরের সত্তার সহযোগী ও পরিপূরক। অন্তরে বাইরে কেবলই ভাবছেন। মানুষ যখন কিছু করতে পারে না তখন তার বাইরে ভেতরে বিরাট দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলতে থাকে—কি করে কি করবে? কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে? একটা পীড়া হয় ভেতরে ভেতরে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সেই রূপটার কথা বলছেন কবি। এটা আধুনিক মানুষের এক প্রধান লক্ষণ ও

বৈশিষ্ট্য। তারপর কবি বলছেন—কবিতাটির শেষে—

"কখনো হঠাৎ এই অ-জ্যামিতিক জীবনে
পদাঙ্কমালায় যদি রামধনুর মতন
এক ভাঙাবৃত্ত হয়..."

মানুষের জীবন যতই ধারাবাহিক হোক না কেন এই নিয়মাফিক জীবন আজ এইভাবে চালানো যায় না। কারণ জীবন সত্যিই অ-জ্যামিতিক। এই রকম জীবন যদি হঠাৎ করে পেশাগত হয়ে যায় তখন তো জীবন সোনালি হয়ে যায়। কবি এই সুন্দর জীবনের আকাঙ্খা করছেন। যেখানে রামধনুর মত জীবনের সকল রঙ থাকবে—জীবনের স্বাদ পাওয়া যাবে। জন্মজিৎ রায়ে 'অন্দর থেকে বারান্দা' সেই জীবনযুদ্ধ, অস্তিত্বযুদ্ধ, বাইরে ভেতরের দ্বন্দ্বযুদ্ধের এক দলিল।

অনুরূপা বিশ্বাস

বিপন্ন পৃথিবী

'কিছু কিছু বৃক্ষ আছে বলে' কাব্যগ্রন্থের কবি অনুরূপা বিশ্বাস কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের 'অদ্ভুত আঁধার এক' (১৯৮০) কবি না। এখানে তিনি একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা, আরও এক নতুন কবি। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি অন্য এক নয়া সুর স্বর নিয়ে উপস্থিত। কবির ভাষায়—

"আমার দ্বিতীয় বই 'অদ্ভুত আঁধার এক' সেই অপ্রত্যয়চ্যুত হয়েছে প্রত্যয়ের দৃঢ় ভূমির তলায় লেগেছে ভুকম্পনের আবেগ। বহু যুগের সংগ্রামে মানুষ তার জন্যে যে বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলেছিল সেখানে নেমে এসেছে এক আদিম অন্ধকার। এই অদ্ভুত অন্ধকারে এখন কেউ কাউকে চিনতে পারছে না। হতাশায়, অবিশ্বাসে দুলে উঠেছে এতদিনের অর্জিত ও অধীত জ্ঞান-বিজ্ঞান বুদ্ধি ও জিজ্ঞাসার চালচিত্র।"[৬৮]

('আমার কথা'—অদ্ভুত আঁধার এক'—অনুরূপা বিশ্বাস)

'অদ্ভুত আঁধার এক' কাব্যগ্রন্থের সুদীর্ঘ কবিতা 'বিপন্ন পৃথিবী' সেই সব কথার প্রমাণ। এই কবিতায় তথা এই কাব্যগ্রন্থের সব কবিতাতেই একটা প্রতিবাদী সুর বেজে ওঠেছে। এই প্রতিবাদটা হল বিপন্ন পৃথিবীকে কিভাবে বাঁচানো যায় এবং আমরা কিভাবে বাঁচতে পারি সে দিকের একটা প্রচেষ্টা। কবিতাটার শুরু এ রকম—

"কে কাকে সান্ত্বনা দেয়, কার চোখে জল কেবা দেখে!
এমন অকাজে শুধু বোকারাই জড়ায় নিজেকে।
সবাই ঘুরছে নির্বিকার
চিরতরে আলো নিভল কার
কার দায় এমন ভাববার?
আহ্নিক বার্ষিক গতি সকাল বিকাল মানুষের
ইচ্ছামত মেপেজোপে দেবে, তোমাকে এমন এক্তিয়ার
কে দিয়েছে? মনোলোভা!—ভোলাও পলকে
সে জানে না বাঁধা আছ অদৃশ্য খোঁটায়
সময় তোমাকে নিয়ে কি খেলা খেলায়।
থোকা থোকা দ্রাক্ষাফল পিষে নিংড়ে সোনালী নির্যাস
পাত্র ভরে বিলি করে নামী রেস্তোরাঁয়
কার কিবা দায়?
ঝুলে থাক, যেমন ঝুলেই আছ শূন্যের বোঁটায়
ঘানি টানো, টেনে টেনে ক্লান্ত হও আরো
তারপর রাজার গোয়ালে রাত্রিতে জাবর কাটো
কেউ দেখবে না।"

১৯৫০ এর পর থেকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রগতি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এবং তার সাথে সাথে মানব সভ্যতার। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ স্বাধীন হয়ে যেতে শুরু করল। এবং প্রত্যেক দেশই নিজস্ব প্রগতি করতে লাগল। দেশের Infrustructure খুব দ্রুত বদলে যেতে শুরু করল। এবং কম্পিউটার এর সাথে যোগাযোগ যাতায়াত এই সব যখন উন্নততর হতে শুরু করল। ক্রমে পৃথিবীটা Globalised হয়ে গেল। এবং এই সব উন্নতি প্রগতি আবিষ্কার প্রতিযোগিতার ফাঁকে মানুষও ক্রমে যান্ত্রিক হয়ে ওঠল। ১৯৮০ এর পর থেকে বিশ্বায়নের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হয়ে গেল। কিন্তু মানুষের রূপও ক্রমে বদলে গেল। মানুষের বাইরের রূপের সাথে ভেতরের এবং ভেতরের রূপের সাথে বইরের রূপ আমূল পালটে গেল। আর এইখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে ক্ষয় হল মানব সভ্যতার, মানবতার, মূল্যবোধের, বুনিয়াদের—সর্বপরি মনুষ্যত্বের। কবি অনুরূপা বিশ্বাসের 'বিপন্ন পৃথিবী' কবিতাটিতে এই রূপ ধরা পড়েছে।

কে কাকে আশ্রয় দেয় শান্ত্বনা দেয়? এখানে কারুর একটুও সময় নেই। কারুর চোখের জল কেউ দেখে না। কিন্তু মানুষ আছে যারা বোকার মতই নিজে ভেবে ভেবে মরছে। মনুষ্যত্বে আলো নিবে যাচ্ছে কেউ দেখছে না। এই পৃথিবীর মানুষের সকাল বিকাল সবকিছুকে মানুষ পরিবর্তিত করে নিচ্ছে। পরিবেশের অবস্থা প্রকৃতির অবস্থা রূপ মানুষের ক্রিয়াকলাপের জন্য অনেকটা বদলে গেছে। তাই ক্রমে পৃথিবীটা নরকের দিকে, ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। নামি দামি রেস্টোরেন্টে মদের ব্যবসা আর যতসব বেআইনি কারবার আইনি হয়ে গেছে। কারুর কোনও দায় নেই। এই রকমভাবে দিন যাপন করে করে ক্লান্ত হলে রাজা অর্থাৎ আজকের গুণ্ডা, মন্ত্রী, পাণ্ডাদের গোয়াল ঘরে অন্ধকারে রাতে জাবর কাটতে থাকে। জাবর অর্থাৎ মানুষ হিসেবে না বেঁচে অমানুষ হয়ে বেঁচে থেকে যা অর্জন করেছে সঞ্চয় করেছে জীবনে। এই সব রাজাদের জন্য মানুষ এক কাপ চায়ের বিনিময়ে একশত মিথ্যা কথা বলতে পারে তার আপনকে ঠকাতে পারে। এখানে মানুষ এই ভাবে বেঁচে আছে। কবি বলছেন—

''লাইট পোস্টে ঝুলছে বিজ্ঞাপন, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো
মহান পৃথিবী, তোমাকে দৃষ্টান্ত করে এখানে মানুষ
কক্ষপথে ঘুরে মরে, ফিরেও চায় না উল্কাপাতে
নক্ষত্রের অপমৃত্যু কাতর করে না তাকে
উদাসীন পাথর ফলক ঙ্খ ঘাস মাটি জল নয়!
জল নেই, চরাচরে খরা, চোক জ্বলে, চোখ গেল পাখি
চোখে বালি, চোখ যায় যাক্, তাই ভালো
তবে তাই হোক্, তবে বেঁচে যাই—
চারদিকে এতো দেখনাই, সুখ আর আহ্লাদের।
সাজানো বাগান, ফ্লুরেসেন্ট ফোয়ারার জলে
কাঁচ ঘেরা সুইমিং পুল
জীবন পিছলে যাচ্ছে ধড়িবাজ মাছের মতন
বড় শক্ত পাকা আঁশ, হাজার চোখের তারা
জরিপ করছে, গিলে ফেলতে পারে কি না
গোটা গোটা তোমাকে আমাকে।
ঝাপটা মারছে লেজে, ছিট্‌কে যাচ্ছে
অনেকেই দিশাহারা, খুঁজে পথ আলোর ধাঁধায়
হতোদ্যমে বাগ্যের গোড়ায়
রোজ ঢালে ঘটি ঘটি জল
পাথরে কি ফুল ফুটে, ঘোর এই অমা রজনীতে
কে দেখবে চাঁদের উদয়?"

লাইট পোস্টে বিজ্ঞাপন দুলছে আর আমরা নিশ্চিন্ত। কারণ আমাদের জীবনটাই বিজ্ঞাপিত। এই দু'একটা বিজ্ঞাপন

ফটো লাগিয়ে তোমাকে আমাকে কিনে নেয় তাদের ইন্দ্রজালে। 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'—কারণ আমরা আমাদের আসল মুখ রূপ দেখি না। এই বিজ্ঞাপনের আড়ে তা হারিয়ে যায়। অনেক আলো এখানে মরে যায়। আমরা পাথর হয়ে কেবলই দেখতে থাকি। ঘাস নেই এখানে মাটি জল তাও ঠিক সে রকম নেই। জল নেই এখানে কেবল খরা— চোখ জ্বলছে। চোখে আবর্জনা ভর্তি হয়ে গেছে শুধু বেঁচে থাকতে চাই মরে মরে। কৃত্রিম জীবন আমাদেরকে গিলে নিতে চাইছে। কুমিরের মত গিলে নিচ্ছে গোটা গোটা মানুষকে।

আলোর ধাঁধায় পথ খুঁজছি আমরা। মরীচিকায় কী জলতৃষ্ণা মেটে? সে রকমই আমরা ভাগ্যের জোড়ায় কেবলই জল দিচ্ছি। কিন্তু আমরা জানি না যে তুমি আমি আমরা কবে পাথর হয়ে গেছি। আর এই পাথরে জল দিলে কি ফুল ফোটে! ঘোর আমাবস্যার রাতে ঘিরে নিয়েছে পৃথিবী। এই আবস্যায় কি চাঁদ দেখা যায়? আমরা সামাজিক জীব—কিন্তু কতটুকু সামাজিক তা আবার নতুন করে দেখতে পাই 'বিপন্ন পৃথিবী' কবিতায়। তারপর বলছেন কবি—

''সূর্য শুধু সারাদিন গনগনে চুলায়
চর্ব চোষ্য নানাবিধ ব্যঞ্জন বানায়, হাজার মশলায়
তুমি শুধু নাকে নাও এমন সুঘ্রাণ, মনোলোভা।
দূর হতে দেখো
রেগে গিয়ে বাতাসকে টুঁটি টিপে মারো
নিস্তার দাও না মাটিকেও, মাটি-ঘাস-জল
অন্যদিকে কঠিন পাথর
কার দিকে যাবে? ত্রস্তে এই প্রশ্ন হেনে
হু হু ছুটে চলে গেল সন্ত্রস্ত বাতাস ক্যামফ্লেজে।''

সূর্যটা শুধু সারাদিন ধরে উপরে থেকে আমাদের চর্বি শুষতে থাকে। হাজার মশলায় নানা রকম ব্যঞ্জনা জাগায়। এই প্রাণ শুধু নাকে লাগে আর আমাদের মন হরণ হয়। আমাদের পিঠ থেকে চর্বি নিয়ে আমাদেরই বাজা করছে এই সূর্য। এই সূর্য অর্থাৎ আমাদের কর্তা, চালক, পরিচালক ধর্মের সমাজের দেশের। আমাদের যা প্রাপ্য, শ্রম, মর্যাদা, দাম তা কিন্তু পাচ্ছি না—পাই না। যে সব মাটি ঘাস জল আছে তাতে মানুষের বাসযোগ্য থাকতে দিচ্ছে না নিজের স্বার্থের জন্য। আমরা কোন্ দিকে যাব কেবলই পাথর। আমাদের ফুসফুসে এইসব কৃত্রিম বাতাস বড় কষ্ট দিচ্ছে। প্রাকৃতিকভাবে আমরা আর বাঁচতে পারছি না। কারণ—

''সাইরেন বেজে গেছে, বেজেই চলেছে
এক ঝাঁক বলদর্পী বোমারু বিমান
ঝাঁক বেধে নেমে আসছে—বাঁচতে চাও
তাড়াতাড়ি চলে যাও হামাগুড়ি দিয়ে
আদিম গুহায়, নিরাপদ শেলটারে!
অপেক্ষায় বসে থাকো, কতোক্ষণ পরে
বেজে উঠবে 'অল ক্লিয়ার' ধ্বনির সংকেত
আদৌ বাজবে কিনা, কিবা অভিপ্রেত সময়ের!
মানুষের কতো দেনা শুধবার বাকি?
হেঁট মাথা, ন্যুব্জ দেহ বারবার খুঁজছে উত্তর
ব্যাফল ওয়ালে পিঠ—কখন দাঁড়াবে সোজা
বিপদ কেটেছে কে বলবে?
কে বাজাবে জোরে ঘণ্টা?''

চারদিকে ধ্বংসের সাইরেন বেজে ওঠেছে। এখানে আমরা মনে করতে পারি ১৯১৪-১৯১৮ এর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা, ১৯৩৯-১৯৪৫ এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা এবং তার পরে cold warl এর কথা। এই সবের ভেতরে খুঁজলে

মানবতা, সভ্যতা, বর্বরতার হিসেব আমরা ভালোভাবে দেখতে পাই।

এইসব অমানবিকতা সভ্যতার রোগ বোঝা চারদিকে নেমে আসছে। কবি বলছেন আমাদেরকে বাঁচতে দাও। বর্বরতা তুমি চলে যাও আদিম গুহায়—সভ্যতার কলঙ্কও। কবে যে বেজে ওঠবে 'অল ক্লিয়ার' বলে সেই সবুজ সংকেত। কবি শঙ্কা করছেন আদৌ কি বেজে ওঠবে? মানুষের মনুষ্যত্বের মানুষের মানবতা সভ্যতার যে সব ক্ষত হল ক্ষয় হল তা তো পূরণ করতে হবে। সেই সব দেনা শুধবার বাকি আছে মানুষের। বারবার কবি উত্তর খুঁজছেন। ওয়ালে পিঠ লেগে গেছে—সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না মানুষ। মানুষের এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কে বলবে? কে বাজাবে ঘণ্টা ও বলবে এখন আর কোন বিপদ নেই? কবি বলছেন তারপরেই—

''কেউ তো দেয় না সাড়া, সময় এখনও নিরুত্তর!
দিন যায়, রাত্রি আসে,
কক্ষপথে ঘুরে যায় অবিরাম গোলাম পৃথিবী
ঝরে ঘাম, বালিতে শুকায়
রোদ বড়ো কড়া হাতে চাবুক মারছে।''

মানুষের কর্মের 'সাইড এফেক্ট'এর জন্য আকাশের বায়ুমণ্ডলের স্তর ছিদ্র হয়ে ক্ষতিকারি অতিবেগুনি রশ্মি প্রত্যক্ষভাবে জীবের ওপর পড়ে রোগ বাড়ছে পৃথিবীতে ক্রমে। কেউ কোনও সাড়া দিচ্ছে না কার্বনডাই অক্সাইট ইত্যাদি বাড়ছে ক্রমে। দিন রাত তার সমান তালে চলছে। কক্ষপথে পৃথিবী ঠিকই ঘুরছে তার নিজস্ব পথে। আমাদের পরিশ্রম বিফল হচ্ছে। শুকনো বালিতে ঘাম ঝরছে আর বালি শুষে নিচ্ছে তা। রোদ খুব কঠিন। আমরা যে আলোয় বেঁচে আছি সেটা শুদ্ধ নয়। কবি শুদ্ধ আলো চান। কিন্তু কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই কবির তির্যক কণ্ঠে এ রকম উচ্চারণ। চারদিকে পৃথিবীকে জয় করার প্রতিযোগিতা। তাই প্রতিযোগির দিকে নজর না দিয়ে সবাই শুধু দৌড়াচ্ছে। কিন্তু কোথায়? কোন্‌খানে? কবি বলছেন এক ভয়ঙ্কর পৃথিবীর দিকে জীবনের দিকে যাচ্ছি আমরা আমাদের কাম্য নয় যা কোনদিনই।

এত সময় কবিতাটার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কবি শুধু হতাশায়, কষ্টে, যন্ত্রণায়, নরকীয় পৃথিবীর কথা বলছেন। পৃথিবীর ভয়ানক সম্ভাবনাহীনতার কথা বলছেন। কিন্তু তিনি আশাবাদী। তাই কবি নতুন সম্ভাবনার কল্পনা করছেন—

''মানুষ পাথর নয়, মিছে কথা, মানুষ কাঁদছে
কাঁদুক কাঁদছে যারা কাঁদতে দাও
তবু যদি খরা কেটে জল হয়, জল জমে নদী হয়
তখন নদীকে বলবো ঘুঙুর বাজাও,
রুনুঝুনু পায়ে যাও না সাগরে
পাথর ফলকে চিড়, শাবল গাইতি, অরণ্যের অধিকারে
মনোলোভা, তোমাকেই দু বাহু বন্ধনে
আবার বাঁধতে চায়, ধমনীতে রক্ত বয়,
পেশীতে অনেক বল,
মাথা তুলে বন্দনায় আবার মানুষ
জুগুপ্সায় জিঘাংসায় বিপন্ন যদিও তুমি
বিলুপ্ত হবে না জানি আমার পৃথিবী!''

কবির বিশ্বাস মানুষ পাথর নয়—যদিও পৃথিবীতে অনেক পাথর, মাটি খুব কম। পৃথিবীটা রোগে জঞ্জালে আবর্জনায় পূর্ণ যদিও তবে মানুষ পাথর নয়। যে সব মানুষ কাঁদছে তারা কাঁদুক—কাঁদতে দাও। এই সব অবস্থা, এই ভয়ঙ্কর খরা কেটে জল হয় জল জমে গিয়ে নদী হয়। সেই জল ছোঁয়া জমিতে নিশ্চয় প্রাণ জন্মাবে। এই জলপূর্ণ নদীকে বলব সগরের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য রুণুঝুণু ঘুঙুর বাজিয়ে ছন্দে তালে আনন্দে। অরণ্যের অধিকার অর্জন করতে হবে—লাগবেও। জীবনের অধিকারকে জয় অর্জন করার জন্য তোমাকে মনোলোভা হতে হবে। তোমাকে দুই হাতে

বাঁধতে হবে কারণ তোমার রক্ত বইছে ধমনীতে পেশীতে অনেক শক্তি আছে। মাথা সোজা করে মানুষের বন্দনা করতে হবে—জীবনেরও। যদিও তুমি বিপন্ন আজ জিগাংসায় জুগুপ্সায়। কিন্তু আমার পৃথিবীটা কখনও বিলুপ্ত হবে না। জীবনের বন্দনা করে এগিয়ে যাও। শেষে কবি বলছেন—

''তবু বলি, কতকাল আর কতকাল
নিরবধি পাপের জঞ্জাল আটকে রাখবে পথ?
মনোলোভা, আর তুমি লোভের শিকার
কখনও হবে না বলো, —সময়ের নির্মম বিকার
তোমাকে আঘাত হেনে আর কোনোদিন
জয়ী হতে পারবে না— এই কথা বলে দাও
ক্ষতচিহ্ন মুছে দাও তোমার ঐশ্বর্যবান ঘামে!
কাল ভোরে সূর্যোদয়ে পাখিদের ঘরে
আবার ডানার শব্দ শোনা যাবে
আকাশে সাঁতার দাও—এই ডাক কেউ একজনা
নিশ্চয় কালকে দেবে—আজ রাতে ঘুমাতে যাবো না।''

কবি এক শত শতাংশ বিশ্বাস করেন তার পৃথিবী বিলুপ্ত হবে না। মানুষ যদিও বিপন্ন। তবু আর কতকাল নিরবধি পাপের জঞ্জাল আবর্জনা ইত্যাদি নিজের পথ আটকে রাখবে? নিশ্চয় এই সব ভেঙে চুরমার করে জীবনকে জয় করবে কিন্তু। এতদিন মিথ্যা সোনার হরিণের পিছে পিছে ছুটে চলেছে। কিন্তু এখন থেকে আর কোনদিন কোনও লোভের শিকার হবে না বলো। তবে সময়ের নিষ্ঠুর বিকার তোমাকে আঘাত করে কোনদিন জয়ী হতে পারবে না। এই কথাটা বলে দাও। এত জীবন যে সব ক্ষয় ক্ষত হয়েছে এতদিন পর্যন্ত এই সব মুছে ফেলো তোমার ঐস্বর্যবান ঘামে। এতদিন বৃথা চলে গেছে—যাক্। কিন্তু এখন থেকে তুমি তোমার কর্মে ধার্মে পুরোনো সব ক্ষতিকে পূরণ কর।

কাল ভোরে সূর্য উঠার সাথে সাথে পাখিদের ঘরে আবার ডানার শব্দ শুনা যাবে। এবং একটা নতুন দিগন্ত খুলবে—খুলে যাবে এক সম্ভাবনার দিক। আকাশে সাঁতার দাও অর্থাৎ উড়তে শিখো আকাশকে জয় করবে। এবং তোমার সাথে সাথে এই ডাক অন্য একজন নিশ্চয় কালকে দেবে। আর এই ডাকের সাথে সাথে এক সম্ভাবনাময় আহ্বান বেজে ওঠবে নতুন করে জীবনকে, পৃথিবীকে আবিষ্কার করার। কবি বলছেন তিনি আজ রাতে আর ঘুমাতে যাবেন না। কারণ এতদিন ঘুমিয়েছেন। আর ঘুমালে হবে না।

'বিপন্ন পৃথিবী' এই সুদীর্ঘ কবিতার মধ্য দিয়ে আমাদের হারিয়ে যাওয়া মানবিক, প্রাকৃতিক, লৌকিক, প্রাকৃত জীবন সৌন্দর্যকে, মাধুর্যকে আবার আবিষ্কার করতে চেয়েছেন কবি।

তৃষ্ণার ভৃঙ্গার

'তৃষ্ণার ভৃঙ্গার' কাব্যটি ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। কবি অনুরূপা বিশ্বাস সম্পর্কে সমালোচক প্রাক্‌কথনে বলেছেন—

> ''কবি অনুরূপা বিশ্বাস জেগে আছেন, জেগে থাকবেন সময় প্রহরী হয়ে, আগামীকালের জন্য পরশপাথর আর পৃথিবীর মায়াবী চোখ খুঁজে খুঁজে।''[৬৯]

কবি চল্লিশের দশক থেকে কবিতা লিখে আসছেন। কিন্তু আশির দশক থেকে তার কবিতায় পৃথিবীর প্রকৃতির কুৎসিততম রূপ ধরা দিয়েছে। এবং নব্বই দশকে তিনি না পওয়ার কথাটাই বেশি করে বলেছেন। 'তৃষ্ণার ভৃঙ্গার'। কাব্যটি সেই রূপেরই একটা স্বার্থক উদাহরণ। না পাওয়া, হতাশা, যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে একটা প্রতিবাদী সুর বেজে ওঠেছে এই কাব্যগ্রন্থে। এতদিন কবি দিয়েছেন আমাদেরকে—এখন তিনি চান—

"আমাকে তুমি কী দিতে পারো
শূন্য আকাশ মেঘলা
আর কিছু না দম্‌কা হাওয়া
হু হু উদাম পাগলা"

একটা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে কবি এতদিনের দানের প্রতিদান চাইছেন। আর আমাকে কি তুমি দিতে পারবে শুন্য মেঘলা আকাশ? যেখানে কিছু মেঘ আছে। এবং কিছু দমকা বাতাস হু হু পাগলা উদাম। কেন না কবি চান মেঘলা আকাশে পাগলা বাতাসে তার স্বপ্নের মেঘকে উড়াতে চান। কারণ পৃথিবীটা এত যান্ত্রিক সেখানে প্রাকৃতিক কিছু জিনিস ছাড়া আর বাকি সব কিছু যান্ত্রিক হয়ে গেছে। এমন কি মানুষের সম্পর্কও। এর পরমুহূর্তে কবি বলেছেন—

"স্তব্ধ বনস্থলী
পাতা ঝরায় খালি
বন পাহাড়ে আগুন দেখে চৈত্র হতভম্ব
কেমনতরো রাগ না ওটা দম্ভ?"

কবি দেখছেন জঙ্গল অরণ্য স্তব্ধ হয়ে কেবলই পাতা ঝরাচ্ছে। বনজঙ্গল আজ আর নিরাপদ থাকতে পারছে না মানুষের নোংরা হাত থেকে। সবাই পাগল হয়ে ঘুরছে। কারুর একটু সময় নেই। কেউ দেখেও দেখছে না অরণ্য পাহাড় জ্বলছে। Global Warming বাড়ছে ক্রমে অরণ্য ধ্বংসের সাথে সাথে পৃথিবীটা জীবের বাসযোগ্য যাকছে না বিভিন্ন রোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। তার মধ্যেও মানুষেরা চুপচাপ শুধু দৌড়াচ্ছে। কবি বলছেন তাকেও যেন সেই মন্ত্র শেখানো হয়—তিনিও রাগ না ওঠা দম্ভ লিখে নিতে চান।

"আমাকে তুমি কী দিতে পারো
পাথরভাঙা ঝরনা
অন্তত তো দিতেই পারি
পানীয় স্ফটিক-বর্ণা"

আবারও কবি চান। কিন্তু একটু অন্যরকম চাওয়া। এখন তিনি চান পাথরভাঙা ঝর্ণা। আগে তিনি আকাশের মেঘলা রূপ চেয়েছেন কিন্তু এখন পাথরভাঙা ঝর্ণা চান। প্রকৃতিকে বলছেন এতটুকু দিতেই পারো তুমি—অন্তত পানীয় স্ফটিক বর্ণা। পানীয় যা পান করা যায়। অর্থাৎ কবি চান ঝর্ণা হয়ে নদীতে মিশতে, নদী হয়ে সাগরে, সাগর হয়ে মহাসাগরে। বড় কবির এটাও একটা সহজাত ধর্ম তারা শুধু এগিয়ে যেতে চান সাগর সঙ্গমে। তারপর শেষে বলছেন—

"এইটুকুনি বলে
হেসেই গেল চলে
দেখিনু চেয়ে আর্ত আকুল তৃষ্ণা সারাৎসার
উল্টে গেছে ভিস্তি—না ভৃঙ্গার?"

এখানে কবিতাটার সুর নিম্নগামী হয়ে গেছে। কবি বলছেন যে এই সব বলে চলে গেল দেখলেন আর্ত আকুল তৃষ্ণার সারাৎসার। কবি খুঁজেছেন কিন্তু কি পেয়েছেন সবদিকে কেবলই তৃষ্ণার সারাৎসার। তাই তার মনে হচ্ছে উল্টে গেছে ভিস্তিটা হয়তবা ভৃঙ্গারও। ভৃঙ্গার মানে জলপাত্র। কিন্তু কবি দেখেছেন চারদিকে তৃষ্ণা আর তৃষ্ণা, কিন্তু তৃষ্ণার জলপাত্রটা উল্টে আছে সময়ের বিকারে।

কবি কি চান তাঁর নিজের কথায় শেষ করছি বিশ্লেষণটি—

> "আকাশ এখনও ঘোলাটে স্বচ্ছ নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন আমার দীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে আবার একটা বড় বাঁকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। জীবনের অবক্ষয়ে এসে এতো মর্মপীড়া প্রকৃতির দ্বারস্থ ছাড়া পথ নেই। নির্মল জলের পিপাসায় চারদিকে খুঁজছি জানি না কে দেবে আমাকে।"[৭০]

উমা ভট্টাচার্য

কিছু অতীব সুদৃশ্য এবং সুশ্রাব্য

''ষাটের দশকের কাব্য-আন্দোলনে উমা ভট্টাচার্য বলিষ্ঠ কাব্যরীতির জন্য অনেকেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।''[৭১]

কবি উমা ভট্টাচার্য বড় কম কবিতা লিখেছেন। কিন্তু যে সব কবিতা তিনি লিখেছেন তার ওজন অনেক বেশি পাঠকের কাছে। সেরকম একটা ওজনদার কবিতা হল এই কবিতা। কবিতাটার শুরু এভাবে—

''পত্রিকা মানেই শুধু একরাশ খালি সাদা পাতা
সংবাদ মানেই হলো আমাদেরই মুণ্ডহীন ধড়
জোরালো চশমার কাছে ভূগোলটা বর্ধমান দূর
পাগলেরা পরস্পর মুখ ভেংচে হি হি করে হাসে''

মানুষ যখন সমাজের কথা ভাবে তখন তার ওপর সামাজিক অনেক দায়িত্ব কর্তব্য এসে পড়ে। পত্রিকা ম্যাগাজিনও একটা বিশাল সামাজিক দায়িত্ব পালন করে—মানুষের খবর মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে। তবে অনেক সময় পত্রিকা মানেই কতকগুলি শূন্য খালি সাদা পাতা মনে হয়। আবার সংবাদ যা পত্রিকাকে পত্রিকার মানে অর্থটা দেয়। তাও কখনও কখনও আমাদের মুণ্ডহীন ধড়ের মত হয়ে যায়। আর তখন কালি চোখে না দেখে চশমা দিয়ে দেখি এবং মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার মত দূরত্ব বেড়ে যায়। কবির এ রকম মনে হয়। পাগলেরা পরস্পর মুখ দেখে অর্থহীন হাসি হাসে। এইসব কথারর মানে হলল আমরা আমাদের কথা মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাই—সমাজের কথাও। মানুষের জীবন ক্রমে যান্ত্রিক হতেত হতে সীমা ছেড়ে আরও দূরে চলে গেছে। তাই পত্রিকা সংবাদ ভূগোলের দূরত্ব বেড়ে যায়। মানুষের মাঝে কেবলই দূরত্ব বাড়ছে। একে অপরের মুখ দেখে বোকার মত হাসছি আর বাঁক কাটিয়ে সরে যাই আমরা মানুষের থেকে দূরে।

''হাত বুলাবার মত প্রশস্ত জায়গা জেনে অপরের মাথা
দেখাদেখি সকলেই আমার মাথায় তোলে হাত
শেষকালে নিরুপায় দন্তরুচি পংক্তি মহাশয়
আমারই হাতের পিঠে কিছুকাল স্বস্তি ফিরে পান।''

অন্যের মাথার উপর হাত বুলানো দেখে কবির মাথায় হাত তুলে অর্থাৎ অন্য মানুষের জীবনে চিন্তায় কাজে কর্মে সমাজের উপরতলার মানুষ হস্তক্ষেপ করে চালায় তাদেরকে। কবির জীবনচর্চায় চর্যায় তিনি তা মেনে নিতে পাচ্ছেন না। কবি চান স্বাধীন হয়ে একেবারে নিজের মত জীবনধারণ করতে। কিন্তু এইসব মানুষেরা অবশেষে এখানে সফল হতে পারে না। শেষকালে তারা নিরুপায় হয়ে কবির মাথা থেকে সরিয়ে নেয় হাত। কবির প্রতিবাদী কণ্ঠ যখন পালটা জবাব দেয়। কবির হাতের পিঠে এই সব কথা প্রতিবাদ আলাদা একটা স্থান আশ্রয় স্বস্তি ফিরে পায়—কবি নিজেও। সমাজের কর্তা চালকের অত্যাচার যখন বেড়ে মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায় তখন প্রতিবাদী কণ্ঠ ফুটে বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহের পর শোষিতরা একটা স্বস্তি পায়। তারা বুঝতে পারে আমি বা আমরা আজও বেঁচে আছি। কবি উমা ভট্টাচার্য সে কথাই বলছেন এখানে অন্য রকমভাবে—

''সকলের মুখ দেখি আমার মুখেরই মত ঠিক—
এই নিয়ে কিছুকাল কিছুটা গোলমালে পড়ে গিয়ে
প্রমাণ্য আয়নায় আমি মুখ দেখব ঠিক করে তবু
খুঁজে খুঁজে হদ্দ হয়ে শেষকালে বিরতি দিয়েছি''

এখানে একটা লালিকা দেখা যায়। অর্থাৎ উপহাস সহকারে জবাব। কবি বলছেন এই পৃথিবীর সব মানুষের মুখের মতই কবির মুখও। এইসব নিয়ে কিছুকাল কবি গোলমালে পড়ে গিয়ে নিজের আসল মুখ দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু

তবুও তাঁর আসল মুখ দেখতে পাননি। তাই শেষকালে এই প্রকৃত মুখ দেখা বাদ দিয়েছেন। অর্থাৎ এই পৃথিবীর মানুষের মুখের ভিড়ে কবির আসল মুখটা হারিয়ে গিয়েছে। এখানে কবি নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না। মানুষের মুখে এত মেকাপ এত মুখোশ। এই সবের ভিড়ে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন না। এই পরিচয় পাওয়ার জন্য পথ হেঁটে অবশেষে পারেননি। নিজেকে এই প্রচেষ্টা থেকে বিরতি দিয়ে দিয়েছেন—সরিয়ে নিয়েছেন।

''অতীব সুদৃশ্য কিছু মননের নাকে দেয় কখনো বা উকি
অতীব সুশ্রাব্য কিছু মননের কানে ধরে কদাচিৎ নাড়ে
অতীব সুদৃশ্য কিছু মননের দৃশ্যে মারে আকস্মিক খোঁচা
তাই নিয়ে পাগলেরা প্রাণ খুলে হি হি করে হাসে''

অত্যন্ত সুদৃশ্য কিছু জিনিস ছবি প্রকৃতির সমাজের জীবনযাপনের যা মননের নাকে দেয় কখনও কখনও উঁকি। চারদিকে কেবল দৃশ্য জন্মাচ্ছে—সৃষ্টি হচ্ছে নতুন যান্ত্রিক ছবি। সেই সব কবির চিন্তায় দাগ কাটে আর কবি ভাবেন অত্যন্ত সুশ্রাব্য কিছু কবির কানে এসে কড়া নাড়ে। কবি খুঁজেন তার অস্তিত্ব মানে অর্থ। অত্যন্ত সুদৃশ্য কিছু কবির চিন্তায় মননের ছবিতে হঠাৎ একটা খোঁচা মারে। কবির এই সব চিন্তা সুদৃশ্য সুশ্রাব্য জিনিস ভাববস্তু নিয়ে পৃথিবীর মানুষেরা পাগলেরা প্রাণ খুলে কেবল হেসে যায়। কবির মনে কত সুদৃশ্য আছে কত সুশ্রাব্য কথা আছে। কবি চান এই সব কিছু দিয়ে জীবনকে আরও মধুর উজ্জ্বল করতে। কিন্তু কবি যাদের মাঝে বাস করে এসব করতে চান তারাই তাকে নিয়ে হাসে। নিজস্ব চিন্তাচেতনা মানুষের দরবারে পৌঁছাতে চান এবং প্রগতিশীল করে তুলতে চান সমাজকে—সমাজের মানুষকে। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্যে তিনি এইসব বলছেন তারা অর্থাৎ সমাজের মানুষেরা কিন্তু এইসব গ্রহণ করতে পাচ্ছে না। তাদের চিন্তাচেতনার মাপ অনুযায়ী ছাড়া তারা মেনে নেয় না। শেষ স্তবকে কবি বলছেন—

''আত্মগত বিবৃতির কিছু কিছু বিড়ম্বনা কবিতাই ভাবি
সমস্ত কাগজে আমি আমার বিবৃতি লিখে যাই
'বক্তব্য কিছুই নেই' 'বক্তব্য কিছুই নেই' বারে বারে লিখে
নির্বোধ পাঠক আর আমি শুদ্ধ হি হি করে হাসি।''

কবিতাকে তিনি আত্মগত বিড়ম্বনা বলছেন। কারণ তিনি যা কিছু বিবৃতি কথা বলতে চেয়েছেনও চান তা তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। সমস্ত কাগজের মধ্যে তিনি যা কিছু লেখেন সবই এক একটা বিবৃতি। কিন্তু এখন এই বিবৃতিতে বলছেন, 'বক্তব্য কিছু নেই।' অর্থাৎ আর কিছু বলার নেই। যা কিছু বলতে চান তা কেউ বুঝতে চায় না, বুঝানো যায় না মানুষকে। তা-ই এখন ক্রমে বক্তব্যহীন হয়ে যাচ্ছেন। নির্বোধ পাঠক— লেখা পড়ে অথচ বোধত্ব নেই। তাই তারা বুঝতে পারে না। নির্বোধ পাঠকের সাথে কবির হি হি করে হেসে ওঠেন শুধু।

এই পৃথিবীর প্রত্যেক স্রষ্টাই চায় তার সৃষ্টি ভালো করে সম্পূর্ণ মানুষের কাছে বোধগম্য হোক অর্থময় হোক—সম্পূর্ণ সত্তাসহ পৌঁছাক। কবি উমা ভট্টাচার্যও সেই চেষ্টাই করেছেন।

রুচিরা শ্যাম

ক্রান্তিক্ষণ

''রুচিরা শ্যামের প্রায় সব কবিতাই গূঢ় মনন চিন্তা ধারা নির্মিত। বরাকের সকল আধুনিক কবিদের থেকে একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের বয়নক্রিয়া তাঁর কবিতাকে করে তুলেছে উচ্চকোটির। 'ক্রান্তিক্ষণ' কবিতা পাঠের অনুভূতি আমাদেরকে রুচিরা শ্যামের কাব্য জগতের মেধাকুম্ভে নিয়ে উপস্থিত করে। তাঁর কাব্যকথন বড় নিবিড়।''[৭২]

কবি নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের কন্যা রুচিরা শ্যামের সম্পর্কে সমালোচক এই মন্তব্য করেছেন। এই কথাটা প্রায় সর্বজন

স্বীকৃত যে বরাক উত্যকার আধুনিক কবিদের মধ্যে কবি রুচিরা শ্যাম একটু অন্য রকম আধুনিক। কবি বুদ্ধদেব বসুর চিন্তাচেতনায় যারা আধুনিক কবি রুচিরা শ্যাম সে রকম একজন আধুনিক কবি। 'ক্রান্তিক্ষণ' কবিতাটি সেই কথার প্রমাণ দেয়। এই কবিতা আলোচনায় তাঁর কবি স্বভাব সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা আমরা পেয়ে যাব। কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে—

"আর এ বৃক্ষের ছায়া দীর্ঘায়ত হবে না উদ্যানে
পাথেয় গুছিয়ে নাও চর্মপাত্রে ভরে রাখো জল,
হে আমার প্রিয়তম, হে আমায় নিশ্চিত নির্বেদ,
ত্রিতাপ তৃষ্ণার শান্তি পাঠ করো আনত নয়নে
সব পাতা ঝরে যায় নির্বিকার অবর্ণ সময়।"

মানুষ নিজেকে নিয়ে অহঙ্কার করে। কিন্তু এখন পৃথিবীতে গভীর যান্ত্রিক অসুখ। এখানে বাঁচতে হলে ক্রান্তি ছাড়া সম্ভন নয়। কবি বলছেন যে আর তোমার জীবনটা তোমার উঠানে বেশি দীর্ঘ হবে না। পথহাঁটতে শুরু করতে হবে প্রস্তুত হতে হবে ক্রান্তির জন্য। পথের মধ্যে একলা বার হয়ে পড়লে হবে না পাথেয় সঙ্গে নিতে হবে। এবং চর্মপাত্রে ভরে রাখতে হবে জল। কারণ জীবনের পথে হেঁটে যেতে কবি জানেন অনেক জল ঘাম হয়ে বার হয়ে যায়। যাতে পথে যেন না ঠেকে কবির প্রিয়তম ব্যক্তি। কবি তাঁর এই প্রিয় ব্যক্তিকে তখনই বলছেন নিশ্চিত নির্বেদ যখন সে Survival for the fittest। পর মুহূর্তে বলছেন একটু আনত হয়ে ত্রিতাপ তৃষ্ণার অর্থাৎ দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাকে জয় করতে শান্তির বাণী পাঠ করতে। কারণ সময়ের রঙ নেই জীবনের গাছ থেকে অনেক পাতা ঝরে যাচ্ছে ক্রমে। কবি চান এই সময়কে জয় করার জন্য জীবন সংগ্রামে নামুক তার উদ্দিষ্ঠ ব্যক্তি পথিক। কবিও নিজে কিন্তু সেই ব্যক্তি পথিক। কারণ ব্যক্তিকে পার হওয়ার পর নৈর্ব্যাক্তিক হয়। তারপর কবি বলছেন—

"স্থির করতল চেপে আলোকিত নিরপেক্ষ কাঁচে
আরক্ত বিভায় দেখো রেখাচিত্র অপর পৃষ্ঠায়
অনুবিশ্বে একাকার কোটিমুখ অজস্র আয়তি
কে আমার পিতামহ, কে আমার প্রথম জননী,
সমস্ত সময় ধরে ঝরে গেল সকল সংলাপ।"

কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকে কবি তাঁর অতীতকে টেনে এনে দেখাতে চেয়েছেন। হাতের তলায় চেপে ধরে 'আলোকিত নিরপেক্ষ কাঁচে' অর্থাৎ আয়না কখনও মিথ্যা কথা বলে না সে সব সময়ই নিরপেক্ষ। আরক্ত বিভায় যেখানে কেউ বেঁচে নেই রক্ত নেই সেই অপর পৃষ্ঠায়। তোমার পূর্বপুরুষের মুখ কত বড় বড়। খুঁজে দেখ কে আমার পিতামহ কে আমার প্রথম জন্মদাত্রী জননী। এখানে কেউ নেই শুধু কথা থেকে যায়—থেকে যায় অজস্র সংলাপ যখন সময় ঝরে যায়। তার মানে কবি চান সময় ঝরে যাবার আগে পথ হেঁটে এক গন্তব্য স্থান খুঁজে নিতে। তা না হলে কবিও একদিন অতীত হয়ে যাবেন কিন্তু কিছুই করতে পারবেন না তার আগে। ইতিহাস থেকে কবি এই অভিজ্ঞতা আর শিক্ষা পান যে, সময় ঝরে যাওয়ার আগে সব কিছু উজ্জ্বল করে নিতে হয়। কারণ মানুষ জীবন একবার পায়। অনেক মানুষ মরে গেছে। তাঁদের মুখ শুধু মনে পড়ে আর কিছু না—এখানে আর কিছু খুঁজে পান না। কিন্তু কবি চান একটা কিছু করে গিয়ে পৃথিবীতে তাঁর পরিচয় রেখে যেতে। তৃতীয় স্তবকে বলছেন—

"আন্তরিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্না কুমারী দেহলী
এক মুঠো ঝরাপতা অঞ্জলির কবোষ্ণ আশয়ে
গাঢ় ঘুমে সুপ্ত হোক পূর্ণহোক অশব্দ তর্পণ
হে স্বগতা বৈতরণী শাখা মেলো সুফলা বদ্বীপে
সব পাতা ঝরে গেলে শান্ত হবে স্পন্দিত মর্মর।"

অন্তরের অন্ধকারে সম-আচ্ছন্নতা বা অন্ধকারে আন্তরিক সম-আচ্ছন্নতা কুমারীর দেহের মত সুন্দর কিছু ঝরা পাতা অঞ্জলির নাতিশীতোষ্ণ আশ্রয়ে গাঢ় ঘুমে সুপ্ত হোক সকল নৈঃশব্দ্য তর্পণ। অর্থাৎ শরীর নিয়ে মানুষের অহংকার যা পাতার মত কখন হঠৎ ঝরে যেতে পারে। যা মানুষকে কিছু সময় আনন্দ দিতে পারে। পূর্বপুরুষেরা কত যে মৃত্যুর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে কবে কোথায়। আমার সুকর্মের ফলভাগ অঞ্জলি হয়ে তারাও পায়। পরমুহূর্তে কবি বলছেন যে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত প্রতিভা, কাজ, জীবন ও জীবন মৃত্যুর মানুষের মাঝখনে বৈতরণীতে শাখা মেলাতে চান। সুফলা বদ্বীপে শাখা মেলাতে চান—যেখানে সুফল ধরবে। কারণ কবি জানেন সময় এসে গেলে সকল পাতা ঝরে যাবে। আর পাতা ঝরে গেলে শান্ত হয়ে যাবে সমস্ত স্পন্দিত মর্মর। অর্থাৎ জীবনকে নিয়ে বয়ে যেতে চান না তিনি চান নাবিকের মত এগিয়ে যেতে। 'ক্রান্তিক্ষণ' কবিতার এটাই মর্ম কথা। তাই শেষ স্তবকে কবি বলছেন—

''রাত্রিমুখী যত শোক মিশে গেলে নিমগ্ন করবে
প্রসারিত প্রার্থনায় স্তব্ধ হবো বৃক্ষের মতন
হে আমার প্রিয়তম, হে একক প্রণয়ী নির্বেদ,
উদ্যানের দ্বারে রেখে এ জন্মের সমস্ত নির্মোক
ত্রিতাপ তৃষ্ণার শান্তি পাঠ করো সর্বশেষ যামে।"

রাতের নির্জনে মানুষ যখন তার নিজের মুখোমুখি হয়। তখন তার কৃতকর্ম ও সম্ভাব্য স্বপ্নকল্পনা কর্ম তাকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। তখন অতীত কথা মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভাবায় কষ্ট দেয়। আর এই সব না পাওয়া করতে না পারা নিম্ন করবে মিশে যায় বড় বৃক্ষের মত স্তব্ধ হয় স্থির হয়ে যায়। এখানে কবি বলছেন যে আমার প্রিয়তম একক প্রণয়ী অর্থাৎ কবিতায় উদ্দেশ্য ব্যক্তি, আমাদের উদ্যানের দর্জায় রেখে এ জন্মের সমস্ত কাজকর্ম পাওয়া নাপাওয়া সুখ দুঃখ ইত্যাদি আমরা যেন শেষবারে শান্তির মন্ত্র পাঠ করে যেতে পারি। ত্রিতাপ অর্থাৎ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এই ত্রিতাপের সকল তৃষ্ণার শান্তি পাঠ করে নিজে আমরা যাতে শান্তিতে শেষ রাতকে যেন জয় করে যেতে পারি।

'ক্রান্তিক্ষণ' কবিতা জীবনকে জয় করার জন্য একটি অধ্যাবসায়ের কথা বলে। জীবনে মানুষ মুক্তি পায় যেন তার সকল তাপ থেকে শান্তির আশ্রয়ে গিয়ে তার একটি দ্বিরালাপ। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের কথায় কবিতাটির আলোচনা শেষ করতে পারি—

> ''আজ থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে (১৯৬৪) বরাক উপত্যকার অপ্রস্তুত জমিতে অজস্র সীমাবদ্ধতার অচলায়তন সত্ত্বেও যখন নান্দনিক আধুনিকতার সুত্রপাত হচ্ছিল—রুচিরা শ্যাম 'ক্রান্তিক্ষণ'—এর মত মননঋদ্ধ কবিতা লিখেছিলেন। এ যে আধুনিক বীক্ষণের জন্য এক ধরণ সে কথা সম্ভবত তখন তলিয়ে কেউ ভাবেননি।"[৭৩]

পারুলের কথা

রূপকথাও তো এক ধরনের মিথ্। মানুষের ভেতরে যা মিথের মত কাজ করে। কবি রুচিরা শ্যামের 'পারুলের কথা' কবিতাটিও পাঠকের মনে মিথের মত কাজ করে। আর এই কাজ রূপকথার বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে একেবারে প্রাকৃত জীবনের উপাদান দিয়ে। মানুষ তখনই কিছু পায় যখন সে ওই জিনিসের মধ্যে নিজেকে পায়—পায় তার নিজের মনকে। 'পারুলের কথা' কবিতাটিও সে রকম একটা কবিতা। যে রূপকথায় আমরা আবার নিজেকে খুঁজে পাই, বিনির্মাণ করি নিজেকে। কবি বলছেন—

''দিন দুপুরের ঘোরে এখনো কে প্রজাপতি খোঁজে
অথচ নামলে ঢল ভুঁইচাপা ভেসে গেছে সব
এ গাঁয়ে নৌকো নিয়ে কূল কই আষাঢ় শ্রাবণে

জলের আড়ালে সব একাকার অপথ বিপথ।"

দিনে দুপুরবেলার রোদে এখনও কে প্রজাপতি খুঁজে কবি বলছেন। কিন্তু তিনি জানেন পারুলের কথা আমাদের কাছে থেকে গেলেও পারুল আর নেই আজ। কারণ পারুলের আগে পারুলের বেঁচে থাকার গ্রাম পৃথিবী পরিবেশ ধ্বংস হয়ে গেছে কবে। যদিও আমাদের পারুল প্রজাপতি খুঁজে খুঁজে ঘুরছে আজও। কিন্তু কোনও ফুল নেই ভূঁইচাপা সব ভেসে গেছে। এখন এই গ্রামে নৌকা নিয়ে কূল পাওয়া যায় না আষাঢ় শ্রাবণে। চারিদিক বন্যার ঘোলাজল আর এইরকম ঘোলাজলে অপথ বিপথ সব এক হয়ে গেছে। এই পরিবেশের পৃথিবীতে পারুল কি খুঁজে পাবে কোনও ফুল বা প্রজাপতি।

"গ্রাম ডুবে গেছে জলে খোড়োঘর খামার গোয়াল
লক্ষ্মীর ঝাঁপির সব কানাকড়ি যশোদার পট,
এখনো আঘাটে হাঁক—বিশবাঁও জলের হদিস
কে আসে রাজার চর, কোথা সে শতেক দূর গ্রাম।"

আমাদের রূপকথার রাজ্য ক্রমে হারিয়ে গেল কোথায়। কারণ গ্রাম ডুবে গেছে নগরায়ণের ঘোলাজলে। সাথে সাথে ডুবে যাচ্ছে খোড়োঘর খামার গোয়াল ঘর লক্ষীর ঝাঁপির সকল কানাকড়ি যশোদার স্মৃতিপট। এখন যেখানে ঘাট নেই সেদিকেই ডাক সুনা যায়। যে জল ভেসে গেছে আর ডুবে নিয়েছে আমাদের সেই ঐশ্বর্যশীল সাম্রাজ্য প্রাকৃত জীবনের উজ্জ্বলতা তা আর ফিরে আসবে না। এখন যে স্রোত বইছে অন্য রাজার অনুচর সেখানের অধিকারী। কিন্তু সে পারুলের গ্রাম কোথায়? যেখানে আমরা পারুলকে খুঁজে পেতাম। খুঁজে পেতাম আমাদের রূপকথার সম্ভাবনাময় এক সাম্রাজ্য তারপর কবির উচ্চারণ—

"পারুল ডাকোরে কেন রূপকথা কবে গেছে ডুবে
অকূলে কূলের খোঁজ। ছইয়ে রেখো হাতের লণ্ঠন
কখনো ঘড়ার জল, দুনৌকায় দেখা যদি হয়—
পুরোনো কাঁথার ফোড়ে গালগল্পে দুপুর বিকেল।"

সত্যিই তো কৃত্রিম যান্ত্রিক জীবন আমাদের জীবনকে পৃথিবীকে এমনভাবে ঢেকে নিয়েছে এখানে রূপকথার রাজ্যের কথা ভাবাই কঠিন। এখন এখানে রূপকথা খোঁজা মানে অকূলে কূলের খোঁজ করা। চালের উপর লণ্ঠনটি রেখে কখনও ঘটার জল দেখা যায়। যদি আবার দুইনৌকায় দেখা হয় পারুল তোমার আমার। অর্থাৎ আজ পারুল আর রূপকথা এক নৌকার যাত্রী এবং আমরা অন্য নৌকার। তার মানে দূর থেকে অতীতকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাদের। পারুল তার রূপকথার সাম্রাজ্য নিয়ে অতীতের নৌকায় বয়ে গিয়ে ডুবে গেছে। এবং তার সমস্ত গালগল্পও পুরোনো হয়ে গেছে। সে সব হারিয়ে গেছে তার সঙ্গে । কবি বলছেন তাঁর ছোটবেলাকার সেই সব সকাল দুপুর বিকেল হারিয়ে গেছে যা পারুলের মত রূপকথায় পূর্ণ ছিল।

"ভাসানে ভেসেছে গ্রাম খোড়োঘর ঘামার গোয়াল
চাঁপা পারুলের গাঁয়ে একাকার অপথ বিপথ।"

যান্ত্রিকতাহীন কৃত্রিমতহীন প্রাকৃত জীবন গ্রাম খোড়োঘর গোয়াল ইত্যাদি চাঁপা পারুলের গাঁয়ে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে—হয়ে গেছে অপথ বিপথ। ফুল পাখি গাছ প্রজাপতি মেঠোপথ শস্য ইত্যাদিতে ভরা উজ্জ্বল গ্রাম আজ নেই। সেই সজীব গ্রাম আজ ভাসানে ভাসছে। পারুলের গ্রামের মত আমাদের গ্রামও হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমে। 'পারুলের কথা' কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় 'রূপকথা' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। এবং কবিতাটি আলোচনা শেষে মনে পড়ে জীবনানন্দ দাশের 'পৃথিবীলোকে' কবিতাটির কথা। যেখানে তিনি বলছেন—

"দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে;
গ্রামপতনের শব্দ হয়;"

শৈশব

কবি রুচিরা শ্যামের 'শৈশব' কবিতাটিতে নারীচেতনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়েছে। শৈশব কাটিয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যায়ে পৌঁছে কবি দেখেছেন তাঁর শৈশব কিভাবে শোষিত বঞ্চিত মানুষের দ্বারা নির্মিত। আজ তিনি বুঝতে পাচ্ছেন শৈশবে তাঁর নাপাওয়া কতটুকু ছিল—পৃথিবীর মানুষেরা কিভাবে তাঁর শৈশবকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করেছিল। সেই ভাব কথা পটভূমি 'শৈশব' কবিতার ভেতরের কথা। কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে—

''ডাকিবে না বৌ কথা কও
এ বাগানে মালতী ফোটে না
ঘুমায় ঘুমায়ে পড়ে মেয়ে
মুখে তার সুখের চাঁদিনী।
(ঘুম ঘুম ভোমরার পাখা
মাগো, তুমি কোন কথা কও ?)''

শৈশব কোনও মেয়েই বুঝে না সে কিভাবে নির্মিত হচ্ছে। বোঝার ক্ষমতা হয় না—থাকেও না। এতটুকু চিন্তা চেতনা হয়াও সম্ভব নয়। কারণ তার চারপাশ পরিবার পরিবেশ সমাজ সংস্কার ইত্যাদি তাকে চালায়—বড় করে তুলে। এই পরিচালনা চালকের বুদ্ধিজ্ঞান চিন্তাচেতনা অনুযায়ীই সে চিন্তাশীল চেতনাশীল হয়ে ওঠে।

কবি বলেছেন শৈশবের বাগানে মালতী ফুল ফোটে না। তাই 'বৌ কথা কও' বলে পাখি আর ডাকিবে না। শৈশবের সেই ছায়াময় অঞ্চলে সেই শৈশবের মেয়ে সুখের চাঁদ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সব ঘুম ঘুম ভোমরার ওড়াওড়ি প্রজাপতি পাখি মালতী এই সবের মানে আজ অন্য কিছু হয়ে যায়। কবির কাছে তার শৈশব অন্য কোনও অর্থ নিয়ে আসে আজ। তারপর কবি বলছেন—

''উড়াল শেখেনি টলমল,
এ মেয়ে সরল যেন পাখী
সে জানে না কপালে আগুন
কারে কয় জনম দুখিনী—
পিতা, নীল ছায়া রাখো
তুমি জানো ফোটে না মালতী।''

শৈশবের সেই ছোট্ট মেয়েটি ওড়তে শেখেনি টলটল করে। এই মেয়ে খুব সরল সহজ পাখির মত। সেই বয়স থেকেই সে ক্রমে পিছিয়ে পড়তে থাকে আর তার 'নারী' পরিচয়টি বড় হতে শুরু করে। সে জানে না ভবিষ্যতে তার জীবনে যে কেবলই আগুন। সে জানে না কাকে বলে জনম দুখিনী। মেয়ে হয়ে জন্মানোটা কত বড় পাপ তা আজ কবি রুচিরা শ্যাম মেয়েদের দুর্গতি দেখে তা আজ বুঝতে পাচ্ছেন। তাই বলছেন শৈশবের সেই ছবিকে ফিরে দেখে যে জনম দুখিনী কাকে বলে? জন্মদাতা তোমরা শুধু ছলনা করো নীল ছায়ার মধ্যে রেখে। তুমি তো জানো শৈশবে কোনও মালতী ফুল ফুটে না। নিজের শৈশবকে চোখের সামনে রেখে কবি আজ অতীতের সেই রূপটিকে প্রকাশ করছেন। শেষ স্তবকে কবি বলছেন—

''ডাকিবে না বৌ কথা কও
তোমার অঙনে গাঢ় ছায়া
ছায়ায় ঘুমায়ে পড়ে মেয়ে
ঢল ঢল সুখের চাঁদিনী
জানে না সে লালট লিখন
কারে কয় যোগিয়া বৈরাগী

উড়াল জানে না—টলমল
এখনো সরল যেন পাখি।"

শৈশবের সেই খেলা খেলাঘর পাখির ডাক প্রজাপতি মালতী কবির মনে এসে ভিড় করছে। কিন্তু সেই বউ কথা কও পাখি আজ আর ডাকবে না। কারণ আজ তোমার আমার উঠানে গাঢ় ছায়া আর সেই ছায়ায় সম্ভাবনাময় মেয়ে এবং মেয়ের জীবন ঘুমিয়ে পড়ে। সেই Innocent রূপটা কোথায় আজ, ঢলঢল সুখের চাঁদনি কত কথা রূপ মনে পড়ে কবির। ওই ছোট্ট মেয়েটি জানে না তার কপালে কি লিখেছে এই পৃথিবীর মানুষ, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি। সে জানে না কাকে বলে 'যোগিয়াবৈরাগী'—অর্থাৎ ভবিষ্যতের বিরক্তিকর সেই জীবন। শৈশবের সেই সুন্দর রূপের ভেতরে বড় হয় তারা জানে না তার! পর কি হবে সে? কি রকম করে কিরকমভাবে তাকে নির্মাণ করবে এই পৃথিবী ওই মেয়েটি বড় সরল সহজ সে ওড়তে জনে না পাখির মত। তাই তো এত বাঁধন, নিষেধাজ্ঞা, যন্ত্রণা, বিষময় জীবন।

কবি রুচিরা শ্যাম 'শৈশব' কবিতাটিতে নারীচেতনার এক বড় জায়গাকে তুলে ধরেছেন সাংকেতিক ভাষার মধ্য দিয়ে। সিমোন দ্যা বোভোয়ার মত কবি জানেন শৈশব থেকেই একটি মেয়েকে কিভাবে 'নারী' করে তুলে সমাজ। তাই তিনি এই সব সাংকেতিক ভাষায় নারীর চেতনার কথা বলছেন যেন শৈশব থেকেই মুক্ত শৈশবসহ মানুষ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন কবি যে যাদের শৈশব হারিয়েই গেছে শৈশবে অর্থাৎ শৈশব পেয়েও শৈশব হারাতে হয়ে বাধ্য হয়ে তারা যেন তাদের উত্তরাধিকারকে সুন্দর স্বাধীন মুক্ত শৈশবের সুযোগ করে দেয়। এখানে কবিতাটি স্বার্থক হয়ে ওঠছে আরও বেশি।

শঙ্করজ্যোতি দেব

আমার সময়

"একদিকে আমূল নিসর্গ,, অন্যদিকে ঐতিহ্যের নতুন মোহনা সন্ধান, একদিকে উত্তরণ আকাঙ্খা, অন্যদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের দ্যুতিময় আভাস—এই হলো শঙ্করজ্যোতির অনুবিশ্ব। এক ধরনের পুনরাবৃত্তিময় বাক্‌বিন্যাস তাঁর কবিতার স্থাপত্যকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়। এইটে নিশ্চিত যে, আধুনিকতাবাদের জাল ছিন্ন করে কবির প্রয়াস শুভ আস্তিক্যবোধের দিকে, কবিতার প্রকরণেও চলছে তার প্রস্তুতি।"[৭৪]

কবি শঙ্করজ্যোতি দেবের কবিতা চর্চা করতে গিয়ে সমালোচক এই মন্তব্য করেছেন। কবিতা সম্পর্কে এটাই স্বার্থক উক্তি। শঙ্করজ্যোতি দেবের কবিতা আলোচনায় আমরাও এই কথাগুলি মনে রেখে এগিয়ে যেতে পারি। কারণ শঙ্করজ্যোতি এমন একজন কবি যিনি মনে হয় সবচেয়ে বেশি সময় সচেতন কবি। তাঁর কবিতায় সময় সমাজ এবং জীবন পরিবর্তনের কথা খুব নিবিড়ভাবে স্থান পেয়েছে। এরকম একটা স্বার্থক কবিতা হল 'আমার সময়'।

তাঁর কবিতাবিশ্বের এক বিশেষ দিক পাওয়া যায় এই কবিতায়। কবিতাটি উল্লেখ করে এ কথার প্রমাণ দিচ্ছি—

"আমার সকল বর্ণমালা যেন আজ থেমে গেছে
যেন স্তব্ধ মৃত বাক সময়ের কাছে
তোমাকে দিয়েছি সঁপে
তোমাকে দেবার মতো আমার কিছুই আর নেই,
প্রতি রাতে শহীদের আলপনা মাড়িয়ে মাড়িয়ে—
আমি খুলে দিতে চাই ঘুমের জানালা
ভোররাতে নিদ্রাহীন জাগরণ শুনে
প্রতিশোধ, প্রতিশোধ
কী নির্মম ঘাতকতা, সময় আমার..."

এটা শুধু কবির সময় নয়—আমাদের প্রত্যেকের সময়। কারণ আমরা খুব ভালো করে জানি সময় আজ নিজেই আগুন আর নিজেই জ্বালানি কাঠ। পতঙ্গের মত আমরাও কিভাবে এই আগুনের টানে আমাদের ডানা জ্বালিয়ে নিচ্ছি সে কথাটাই বলছেন কবি এই কবিতায়।

আমাদের এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে কবি বলছেন যে তাঁর সকল বর্ণমালা অর্থাৎ কথাচিন্তা থেমে গেছে। যে রকম মৃত স্তব্ধ নির্বাক হয় সময়ের কাছে। কবি সময়কে বলছেন যে সবকিছু তাকে সঁপে দিয়েছেন। আর কিছু নেই দেবার তাঁর। কেন না সময় তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিকূল। মানুষের জীবন চারদিক থেকে জটিল থেকে জটিলতর যান্ত্রিকতর কৃত্রিমতর হচ্ছে দিনদিন। সেখানে মনুষের নিজস্বতা হারিয়ে গেছে। সেই বোধ খুব ভালো করে বোঝা যায় এই কবিতায়।

কবি দিন রাত এখন কিভাবে কাটছে আমাদেরকে জানাচ্ছেন তিনি। প্রতিটা রাত শহীদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে মাড়িয়ে কবি খুলে দিতে চান ঘুমের জানালা। কেন না মানুষ নিজেকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি করে ভাবে কল্পনা করে নির্জন রাতে। কারণ তখন সে নিজের মুখোমুখি হয়। এবং নিজের অস্তিত্ব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মুখোমুখি হয় প্রশ্নে জিজ্ঞাসায়। কবিও খুঁজছেন সময়ের গভীরে নিজের অস্তিত্ব। ভোরবেলা ওঠে ঘুম ভেঙে দেখেন সব কিছু বিপরীত প্রতিকূল। এখানকার পৃথিবী তাঁর নয়—সময় তাঁর অন্যরকম। তখন শুধু প্রতিশোধের কথা মনে পড়ে। সময়ের এই নির্মম ঘাতকতা কবিকে গভীর আঘাত করে। তাই কবি সময়ের সেই ঘাতক রূপটা তুলে ধরেছেন আমাদের কাছে। এটাই তো আমাদের সময়, সময়ের বাস্তবতা—সময়ের সত্য রূপ।

জানালা

> ''আধুনিকতাবাদী নৈরাজ্য থেকে কবিতার ভাষাকে বাঁচাতে পারে প্রণালীবদ্ধ বিন্যাস, কবিতায় নতুন মাত্রা যুক্ত করতে পারে সাংস্কৃতিক আকরণের গ্রন্থনা—এইটে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি তাঁর 'ঘুমের জানালা' নামক সংকলনের সাহায্যে।''[৭৫]

'ঘুমের জানালা' (১৯৮১) এ কবি শঙ্করজ্যোতি দেব এক নয়া রূপ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। যেখানে সময়ের ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন প্রণালী পৃথিবীর রূপ এক নয়া রূপ লাভ করেছে। যে রূপ আজকের পৃথিবীর সময়ের জীবনের। আর আধুনিকতার অবক্ষয়ী দিকটা আমাদেরকে কিভাবে আক্রান্ত করছে আমাদের ভাষাকেও। তাঁর কবিতা তার থেকে মুক্তির প্রয়াসী। সে রকম একটা অনবদ্য কবিতা হল 'জানালা'।

এই 'জানালা' কবিতাটি তিনটা স্তবকে মোট বারো লাইনে সমাপ্ত। আর এই বারো লাইনের কবিতায় কবির মেজাজের এক বিশেষ রূপাই আমরা। কবিতাটি এভাবে শুরু হয়েছে—

> ''চলার ছন্দ আর ধৈর্যে টানটান শব্দমালা
> থেমে থাকা পিছুটান দীর্ঘতর দিন বলে মনে হয়
> খুলে দাও দিন আর ঘুমের জানালা
> রাতের গভীর হলে খেলা করে প্রিয় অনুভব''

শঙ্করজ্যোতি দেব আমাদের পরিচিত একেবারে সরল সহজ শব্দগুলিতে এবং শব্দসংযোজন ব্যবহার করেন কবিতায়। তাই বড় সহজে তিনি পাঠকের মনে দাগ কাটতে পারেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গতি আমাদেরকে কিভাবে পরিবর্তিত করে নিচ্ছে। আমাদের চলার ছন্দ ও ধৈর্য কোনওভাবে মেলাতে পাচ্ছি না। এতদিন থেকে থেমে থাকা পথগতি অনেক দীর্ঘতর মনে হয়। সময়ের পরিবর্তন হয়, পথেরও। কিন্তু আমরা তার আঘাতে আঘাতে সময়ের পারে গতির চরে হারিয়ে যাচ্ছি।

কবি বলেছেন যে স্বপ্নের দ্বার জানালা খুলে দাও। কারণ বাস্তবে আমরা আমাদের কিছুই পাব না। বাস্তবে আমরা নিজস্ব পায়ের মাটিতেই সীমাবদ্ধ। যতই আধুনিকতার ময়ূরের লেজ লাগাই না কেন! আমরা নিজের পরিসরে বাস্তবে কাক ছাড়া কিছুই নই! তবে রাত গভীর হলে যখন নিজের মুখোমুখি হই তখন আমাদের অনুভব স্বপ্ন কল্পনা নিজের মধ্যেই খেলা করে—খুলে দিয়ে ঘুমের জানালা। তারপর কবি বলছেন—

"দূরে যেতে পারে বহুদূর যেতে পরে
একার ভেতরে একা যেতে যেতে একা
চারদিকে বাজে ছন্দে ছন্দে বাজে কান্না
বুঝি নে, বাড়িতে কেউ নেই—একা
একার ভেতরে যেতে চায় শব্দজল"

দ্বিতীয় স্তবকে কবি এই সব কথা বলেছেন। চারদিকে মানুষের এত ভিড় তবু কেউ নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে না। কেন না সকল মানুষই আসলে একা। প্রত্যেক মানুষই নিজেকে খোঁজার জন্য দূরে অনেক দূরে যেতে পারে। এই যাওয়াটা নিজের একক সত্তার ভেতর দিয়ে। পৃথিবীর পথে ঘুরে ফিরে দেখেছেন চারদিকে ছন্দের সঙ্গে কান্নার সুর শুনা যায়। এই কান্না কিন্তু অস্তিত্বের কান্না—শেকড়হীন তার কারণে । কবি বলছেন যে বুঝি না সেইসব ক্রন্দনরত মানুষের বাড়িতে কি কেউ নেই? অর্থাৎ তাদের আপনজন কি কেউ নেই। যার কাছে নিজের কথা মনের কথা বলতে পারেন তারা। সেই নির্জন একক সত্তার গভীরে ভেতরে যেতে চায় শব্দের জলকণা। কারণ কবি আশাবাদী। তিনি চান সেই শব্দজলের স্পর্শে মানুষের ভেতরে আশ্রয়ের স্থান গজে উঠুক—শেকড়কে তাজা করে। কবিতাটির শেষ স্তবকে কবি বলছেন—

"তবে আজ হোক নীরব কথার কলি
তোমার আমার কথা
রেখে যাবে কুসুমের ডানা।"

এই তৃতীয় বা শেষ স্তবকে নিজের কথার সঙ্গে কবিতাটি শেষ করেছেন। কবি বলছেন যে তবে আজ হোক নীরব কথার আলাপ। যে কথা তোমার আমার। আর এই কথা দিয়ে রেখে যাব আমরা কুসুম ফুটে। আসলে আমরা যে কত সীমাবদ্ধ কত বন্দি তা জানি না। তাই নীরব হয়ে একা একা ভাবি। নিজের সেই বন্দিদশাকে প্রকাশ করতে পারি না বলেই আমরা এত একা।

শঙ্করজ্যোতি দেবের কবিতায় পাই লৌকিক কথা আধুনিকতার অবক্ষয়ী রোগ দ্বারা আক্রান্ত শেকড়কে সুস্থ করার প্রয়াস। তার মাঝে মাঝে সময় সমাজ এমনভাবে মিশে আছে গাছের মাঝে পাতার মত।

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

পুড়ে পুড়ে স্বর্ণ হোক সম্মিলিত পাপ

"জীবনে যে অগ্নি প্রতিটি মুহূর্তকে ইন্ধন করে নিয়ে জ্বলছে নির্বাধ, এই সময়ের নান্দীপাঠে, কবিতায়, সেই অগ্নিকে চয়ন করেছে বিজয় তাঁর দিনযাপনের আর্তি, নিরুচ্চার কিংবা সোচ্চার বেদনা, মীমাংসাহীন প্রশ্ন, ক্রোধ, নিসর্গলীন বিশ্বাস,—এ সবের সমস্ত-ই ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক ভূমিকার অসহায়তাও আমরা, পাঠকেরা, টের পাই অহরহ। ছন্দের দোলা কিংবা শব্দের দ্রুতি জীবন ও মননের অনেক জটিলতার ভিত্তি খুঁড়ে যায়।"[৭৬]

মননশীল সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য এই বয়ানটা করেছেন কবি বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের 'পুড়ে পুড়ে স্বর্ণ হোক সম্মিলিত পাপ' গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে। সমালোচকের এই কথা থেকে বিজয়কুমারের কবিতার একটা বড় পরিচয় পাই। বিশেষ করে এই রকম মননশীল কবিতায়। ব্যাখ্যা করার কোনও ইয়ত্তা রাখে না এখানে।

'পুড়ে পুড়ে স্বর্ণ হোক সম্মিলিত পাপ' গ্রন্থের নাম কবিতাটি এই ভাবজাত দিক দিয়ে আগে চর্চার দাবি রাখে। কবিতাটি শুরু হয়েছে এ রকমভাবে—

''আমি যে বিনিদ্র আছি এ কথা জানাতে
রাত্রি
গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়''

আমাদের দিনযাপনের মধ্যে আমরা কীভাবে কালের অন্ধকারে ডুবে আছি নিজেই জানি না। আর এই ডুবে থাকাটাকে প্রমাণ করতে যেন অন্ধকারটা আরও গভীরত হয়—গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। কবি এই কথাটি বোঝাতে চান যে আমরা কতটুকু জীবিত আছি—বেঁচে আছি কী রকম করে? আর ঐ সময়ের ফাঁকে একটা তুমুল পরিবর্তন হয় সময় বদলে গিয়ে—

''আর, সে সময় অন্ধকার সিঁদ কাটে ঘরে
আমি দেখি, ভালোবাসা,
বাসর নিশ্ছিদ্র করে কোনও এক
অলৌকিক হাত।
আমি সে হাতের সুগভীর নৈপুণ্য দেখেছি,
আর, ভেবেছি
রাত্রির শেষে সম্ভাব্য সিঁদুরহীনা কাউকে ভাসানো হবে
গণ্ডকীর জলে।''

আমাদের চারপাশ কত গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই জিনিসটা কবি বুঝেছেন। এবং এখানে দেখেছেন এই রাত্রি কীরকমভাবে ছেয়ে আছে জীবনের সকল সামগ্রীকে। আর কবি দেখেছেন কীভাবে একজন রমণীর দেহ ভাসানো হয় 'গণ্ডকীর জলে'—রাতের শেষে। আসলে আমরা 'মানুষ' এই জায়গা থেকে ক্রমে নেমে যাচ্ছি আমাদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা। সাধারণ বাস্তব বলতে যা বুঝি এই বাস্তবতা তার থেকে শতাধিক জটিল কঠিন। যেখানে কর্তা গৌন কিন্তু কর্মই মূখ্য। অর্থাৎ সবকিছু আড়াল থেকে করছে—পুতুল নাচের মতো। চারদিকে ফাঁদ—বেরোবার পথ নেই। এই জায়গা থেকে মুক্তি পেতে হলে যা চাই কবির মতে তা হল—

''আমাকে চৈতন্যযুক্ত কর।
ঊর্ধ্বমুখী আগুনের দাহে আমাকে বিশুদ্ধ কর
পুড়ে পুড়ে স্বর্ণ হোক আমাদের সম্মিলিত
পাপ।
কারণ, আমিও
সমান পাপে পাপী, অভিযোগ
আমারও সমান প্রাপ্য, চক্রান্তের গুপ্ত সাক্ষী
আমি,
আমিই দেখেছি রাতে কালসর্প
কেটেছে কনিষ্ঠা তার লৌহবাসরে।''

এখানে কবি বলছেন যে মানুষ নিজের অভাব ও দুর্বলতাকে কেটে উঠতে হলে সবচেয়ে আগে তাকে চেতনাশীল হতে হবে। কারণ চেতনা না থাকলে বিচারক্ষমতা তো হবেই না। যে আগুন উপরে উঠে সেই আগুনে নিজেকে বিশুদ্ধ করতে চান। আর এই প্রগতিশীল চেতনাশীল আগুনে 'পুড়ে পুড়ে স্বর্ণ' করে দিতে চান 'সম্মিলিত পাপ'। এই পাপ একা কারুর নয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন 'সমান পাপে পাপী' বা 'সমান প্রাপ্য' কিংবা 'চক্রান্তের গুপ্ত সাক্ষী'। এই সকল স্বীকারোক্তি এটাই প্রমাণ করে যে তিনি কতটা সমাজ সচেতন। ব্যক্তি নিজেকে ঠিক করে নেওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দিকে চোখ দেয়। কারণ ব্যক্তি তো সমাজের মূল খুঁটি।

এখানে তিনি বস্তুবাদী। কারণ মানুষের প্রকৃত পরিচয় আবিস্কার করার প্রধানতম ও প্রথম পদক্ষেপ হল নিজের দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তি দোষত্রুটিকে জানা। তারপর সংশোধন, মার্জন, পরিমার্জন ইত্যাদি। এখানে আধুনিক বা নাগরিক হয়ে ওঠা বড় কথা নয়। বড় কথা হল নিজের পরিচয় খোঁজ সন্ধান করা। এটাই মূল জিনিস মানুষের জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপই নির্মিত হয় তার মাপ অনুযায়ী। আর কবি এই জিনিসটাকে চাষ করার জন্য বলতে চান। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ উন্নতি না হলে পৃথিবী ব্যক্তির কাছে পানসে জিনিস হয়ে যায়। কিন্তু কবি চান জীবনকে সুন্দর সুচারুবাবে পথ হেঁটে যেতে এই মহাপৃথিবীতে।

তারপর কবি আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেন—

''এ পাপ তোমার আমার—এ ভাবেই
জীবিকার সাপ কাটে
অঙ্গুরি ও অঙ্গুলি তোমার, অন্ধকারে
ষড়যন্ত্র—ভালোবাসা
জীবনের চোরাবালি
ঢাকে
বিশ্বকর্মা নিরপেক্ষ নয়; সে-ও দেখি জীবিকাদেবীর কাছে
নিদারুণ আত্মবিড়ম্বিত।''

বেঁচে থাকার জন্য যে সব ক্রিয়াকলাপ করে থাকি তারই বেড়াজাল আমাদেরকে একঘেয়েমির পথে চলতে বাধ্য করে। যেখানে বিকল্প পথ চয়ন মুশকিল হয়ে পড়ে। আর এই কর্মের ফাঁকে পাপ বেড়ে গিয়ে পথ ঢেকে যায়। আমরা মানুষের হাত ধরতে পারি না। কারণ কেটে যায় আমাদের 'অঙ্গুরি ও অঙ্গুলি'। এর পেছনে কারণ আছে যে যেসব বিশ্বকর্মা আমাদের চালাচ্ছে আসলে তারাও নিরপেক্ষ নয়—'জীবিকাদেবীর কাছে নিদারুণ আত্মবিড়ম্বিত'। এই বয়ানের গভীরে এই বার্তা মিলে আছে। ষড়যন্ত্র ভালোবাসা এই সব আজ সমার্থক হয়ে গেছে। তাই মানুষের পথ আজ এত কণ্টকময়। এই কথাগুলির ভেতরে অস্তিত্ব সচেতনাও খুব নিবিড়ভাবে কাজ করছে। কিন্তু শেষ স্তবকে কবি আবারও বলতে চান—

''রাত্রি তাই গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়,
আমি একা জেগে আছি
ত্রিকালের সাক্ষী মহাশয়।''

কবি সমসাময়িক বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চান। আমরা চারদিক থেকে কীরকম বন্দি? পথ হাঁটা, জীবনচাষ, জীবিকা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে যে সাপ, ষড়যন্ত্র, পাপ, অন্ধকার এই সবে ঘিরে আছে নিজস্ব শিকলে। এই যে বন্দিত্বকে প্রমাণ করার জন্য রাত আরও গাঢ়তর হয়। কবি বলছেন তিনি একা দাঁড়িয়ে আছেন ত্রিকালের সাক্ষী হয়ে। কিন্তু কিছুই করার নেই তাঁর এখানে। নজরুল ইসলামের মতো তিনিও একা রক্ত ঝরাতে পারেন না তাই লিখে যান কবিতায় রক্তলেখা। আসলে আমাদের সম্মিলিত পাপকে পুড়ে পুড়ে স্বর্ণ করতে চান কবি।

সন্দীপ দ্বীপের গল্প

''সন্দীপ দ্বীপের গল্প' কবিতাটি হৃদয় স্পর্শ করে। কবি বিজয়কুমার ভট্টাচার্য বাংলাদেশের জলোচ্ছাসের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে রবিঠাকুরের সোনারতরীকে মৃতদেহের গন্ধময় লাশ দিয়ে পূর্ণ করতে বলেছেন। জীবনানন্দের রূপসী বাংলার প্রকৃতি কতো নিষ্ঠুর হতে পারে—কবি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে

দেখেছেন। নিঃসন্দেহে কবিতাটি আমাদের সময়োপযোগী এবং আমাদেরকে দুঃখের ছোঁয়ায় আপ্লুত করে রাখে।"[৭৭]

এই কবিতাটি পড়ে বাংলাদেশের সমালোচক রোমেনা চৌধুরী এই মন্তব্যটি করেছেন। এখান থেকে কবিতাটির মর্যাদা, উচ্চতা, মাপ ইত্যাদির একটা ধারণা পেয়ে যাচ্ছি আমরা। 'সন্দীপ দ্বীপের গল্প' কবিতাটি কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। উপরের এই বয়ানের সমর্থন পাচ্ছি কবিতাটিতে।

এই কবিতাটির পটভূমি খুঁজলে একটা ইতিহাস পাওয়া যায় যে ১৯৮৫ সালের মে মাসের ২৪ তারিখের ভয়ানক ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছাসে বাংলাদেশের বীভৎস রূপ থেকে তাঁর জন্ম। বা এখান থেকেই কবি প্রেরণা পেয়েছেন। কবিতাটি শুরু হয়েছে এ রকম করে—

''তখনও হয়নি সন্ধ্যা দীপ হাতে
দাঁড়িয়েছে বধূ
রমজান চাঁদের আলো সন্ধ্যা রাতে
দেখা গেল শুধু
সহসা আকাশ কালো, জল হল
আরও কৃষ্ণকায়
মহিষে আরূঢ় মৃত্যু নেমে এল
যুগপৎপ্রায়
ভেঙে গেল ঘরদোর জালোচ্ছ্বাসে
এবং বাতাসে
নির্বাপিত দীপাধারে মৃত্যু আসে
ভয়ংকর বেশে"

এই প্রথম স্তবকে কবি যেন কবিতাটির ভূমিকা করেছেন। সন্ধ্যা হচ্ছে সবে মাত্র আর হাতে দীপ নিয়ে বলতে এসেছে ওপারের বধু 'সন্দীপ দ্বীপের গল্প'।

হঠাৎ করে চারপাশ মেঘলা করে উঠল জলোচ্ছ্যাসে ঝড় তুফানে ভেঙে গেল সকল ঘরদোয়ার। চারদিক ছেয়ে যেতে লাগল অন্ধকারে। মানুষেরা মরতে শুরু করল— যে মৃত্যু দেখার জন্য কেউ নেই এখানে। সময় সচেতন কবি সময়কে প্রকাশ করার জন্যই এই স্তবকে ব্যঞ্জাত্মক আয়োজন করেছেন। পাঠকেরা একটা অন্য রকম অনুভব ও উপলব্ধি পাচ্ছেন—যা দ্বিবাচনিক। একদিকে মেধাবী সৌন্দর্য আর অন্যদিকে মৃত্যুর এবং মৃত্যুচেতনার চিহ্ন থেকে চিহ্নায়কের দ্যোতনা। এই দুটি দিক অন্যরকম এক মাত্রা যোগ করেছে এখানে। দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলছেন সন্দীপ দ্বীপের ভয়ঙ্কর সংকটপূর্ণ রূপের কথা—

''উন্মত্ত টাইফুন ঝড় সন্দীপের
চারপাশে জল
আদিম প্লাবনে ভাসে জীবনের
যা' কিছু সম্বল
লাখো লাখো মৃতদেহ সর্পাঘাতে
যেন লখিন্দর
জলস্রোতে ভেসে যায় ঘূর্ণাবর্তে
বঙ্গোপসাগর
নোওয়াজের নৌকোখানি টুইটুম্বুর
ভরে গেছে জলে
দাঁড়াবে কোথায় তুমি মৃত্যুর
ভগ্ন উপকূলে"

চারদিকে জলে ভরে গেছে সন্দীপ দ্বীপ উন্মত্ত থাইফুন ঝড়ে। এখানে কবি মনে মনে কল্পনা করছেন বাইবেলের নুয়াহ-এর আদিম প্লাবনকে। সন্দীপের এই ভয়ঙ্কর রূপে কবি দেখতে পাচ্ছেন সেই আদিম বিধ্বংসের ছবি। আর মানুষ লখিন্দরের মতো সর্পাঘাতে মরে পড়ে রয়েছে নিঃস্বাড় হয়ে। এবং জলের স্রোতে ভাসছে সেইসব মৃত মানুষের শব। এই দ্বীপের 'নোওয়াজের নৌকাখানি'-ও বাঁচেনি। এখানে কোথায় দাঁড়াতে পারবে মানুষ। অর্থাৎ কী ভয়ঙ্কর বীভৎস রূপ ছিল ঐ প্লাবন ঘুর্ণিঝড়ের তার বর্ণনা অসাধ্য।

কিন্তু এই নিষ্ঠুর পরিবেশে মানুষ নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না। সমাজ ধর্ম ইত্যাদির সংকটের চেয়ে বড় সংকট হচ্ছে মানুষ নিজেকে বাঁচানোর সংকট। জীবনের ক্ষয় অবক্ষয় বড় সহজে ঘটে গেছে এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে। কিন্তু কেউ পালাতে পারবে না। কোথায় পালাবে? এই চুরমার ঘরদুয়ার ফেলে। যা তাকে এতদিন ধরে আশ্রয় দিয়েছিল। এই গভীর অভিব্যক্তি প্রকাশের মধ্যে মানুষের রূপান্তরও দেখাচ্ছেন কবি।

আসলে মানুষের নৈরাজ্যহীনতার বেদনাটা সবচেয়ে বড় আঘাত। যখন মানুষ ভালো করে বুঝতে পারে তার নীড় ভেঙে গেছে তখন সে নিজেকে যাযাবর ভাবে না ঠিক। কিন্তু এই নীড় গড়ার পটভূমি উদ্দেশ্য আশা ইত্যাদি তাকে যাযাবরের মতো করে দেয়। কবি 'সন্দীপ দ্বীপের গল্পে' এই বয়ান তুলে ধরেছেন সুগভীরভাবে।

তারপর তৃতীয় স্তবকে আরো গভীরভাবে এই বয়ানকে আরও প্রসারিত করেছেন ঐতিহ্যের অনুসঙ্গে—

"সোনারতরীর মাঝি আমাদের
রবীন্দ্রঠাকুর
তরীখানি নিয়ে গেলে এ' ঝড়ের
আগে' বহুদূর
বলো হে জীবনানন্দ বাংলাকে
কী চোখে দেখেছো?
সমুদ্র নারীকে তুমি
কী ভালোবেসেছো?
বাংলার রূপ দেখে বলে গেলে
শুধুই রূপসী
দ্যাখোনি বাংলার বুকে ঢেউ তোলে
তটিনী রাক্ষসী
বারেক ভিড়াও তরী হে নাবিক
রবীন্দ্রঠাকুর
মৃতদেহে পূর্ণ করো, চর্তুদিক
গন্ধে ভরপুর
গাঙ্গেয় শকুনপাখি ছিঁড়ে খায়
মৃত মাংসগুলি
মৃত্যু আজ মৃত্যু দেখে চোখে হায়
দিয়েছে অঙ্গুলি"

এই বাচনের মধ্যে বাংলার রূপকে দেখানো হচ্ছে অন্যরকম করে। যা পূর্ববর্তী দুই মহারথী এগিয়ে গেছেন অন্য রূপ প্রকাশে। এই দুই রূপের সংযোগ ও বিয়োগের টানাপোড়েনে যা নির্মাণ হয়। সেই অনেকার্থদ্যোতক ছায়াঞ্চলের দিকে সংকেত দিচ্ছেন কবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী'-র কথা বলতে গিয়ে বলছেন যে সন্দীপের এই ঝড়ের আগেই নিয়ে চলে গেছেন তিনি তাঁর তরী—অনেক দূরে। আর জীবনানন্দ দাশ বাংলার রূপ দেখে কেবল সেই 'রূপসী' বলে গেছেন। তিনিও দেখেননি এই 'তটিনী রাক্ষসী' রূপটা। যে বাংলার রূপ এত ভয়ঙ্কর হতে পারে। তাই কবি তাদেরকে আবেদন করছেন যে তাদের কল্পিত বাংলার রূপ থেকে বাইরে এসে বাংলার নেতিবাচক রূপটাকে দেখতে।

'সোনার তরী'-তে মৃত লাশ ভরে নিতে বলছেন। যা শকুনের খাদ্য আজ। মৃত্যুর এই ভয়ানক রূপ দেখে মৃত্যুও আঙুল দিয়েছে তার চোখে। এই শেষ লাইনের দ্যোতনায় পাঠককে আরও বেশি সহমর্মি করে তুলে।

আসলে এতদিন ধরে পাঠকের মনে 'সোনার তরী' আর 'রূপসী বাংলার'-র যে রূপ ছেয়ে আছে, গেঁথে আছে। তাকে কবি এই সুযোগে ভাঙতে চেয়েছেন । এবং উলটো দিকে দেখাতে চেয়েছেন বাংলার রূপ কত রক্তাক্তভাবে রূপান্তরিত হতে পারে অন্যকোনও রূপে। এখানে শব্দ আর নৈঃশব্দ্যের দ্বিবাচনিকতায় বক্তব্যটা আরও গভীর আরও সংকেতপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এখানে নাগরিক ব্যথাবিষন্নতা নেই। কিন্তু মানবিক ব্যথাটা বড় নির্মম হয়ে ফুটে ওঠেছে করুণাময় রূপ ধরে। এখানে ক্রোধ, না-পাওয়া, বেদনা, অবক্ষয়, যান্ত্রিকতা, মুখোশ ইত্যাদির আদিপত্য নেই। কিন্তু কঠিন সময়কে পার হওয়াটাও বড় কঠিন। 'রাক্ষসী' সময়কে অতিক্রম করাটাই তো জীবনজয়ের কথা। এই ইঙ্গিতও পাচ্ছি ভেতরে ভেতরে যে রূপসী রূপটা মায়াময় মায়াচ্ছন্ন দীর্ঘ সময় বড় কম মুহূর্তে কেটে যায়। তার উল্টো দিকে 'রাক্ষসী' সময় মুহূর্ত বড় দীর্ঘ সময় হয়ে যায়—শুধু যেতে থাকে। এই যে একটা বোধ তার গভীর অনুভব ও উপলব্ধির কথাও বলছেন এই বয়ানে। চতুর্থ স্তবকে সন্দীপ দ্বীপের বিপর্যস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যকে আরও বেশি বাস্তবিক করে প্রকাশ করছেন—

''সন্দীপ দ্বীপের নাম মানুষের
বসত মৃত্তিকা
আপাত কিছুই নেই, টাইফুনের
মত্ত বিভীষিকা
সন্দীপ দ্বীপের নাম জলরাশি
পূর্বে ও পশ্চিমে
দুনির্বার বয়ে যায়, অবিশ্বাসী
জলাতংক নামে
দিনান্তের উপবাসী রমজানের
পাণ্ডুর জোছনা
মৃত্যুর লহরী দেখে সন্দীপের
সাক্ষীও থাকে না''

যে সন্দীপ দ্বীপে একদা মানুষের বসতবাড়ি ছিল অর্থাৎ মানুষ বসবাস করত। আজ কিছুই নেই থাইফুনের আক্রমণে সবকিছু তুলপাড় হয়ে গেছে। চারদিকে জলের আতংক। মৃত মানুষের শব দেখে জীবিত মানুষেরা আতঙ্কে বিবোর। সব ঘোলা জলে ঢেকে গেছে—ডুবে গেছে অসংখ্য সংসার। চারদিকে নির্জন, দিনরাত কেবল বয়ে যাচ্ছে ভূমধ্যসাগরের উদ্দেশ্যে—মহাসাগরে মিশে যাবার জন্য। আর প্রকৃতির সৌন্দর্য চাঁদ, রমজান চাঁদ সন্দীপ দ্বীপের ভয়ঙ্কর ঢেউয়ে মানুষের মৃত লাশ দেখে সাক্ষীও থাকে না— বিমুখ হয়ে গেছে।

এখানে বেঁচে থাকার মাটি সন্দীপ দ্বীপে আর নেই আপাতত। এই জিনিসটার। দিকেও ইঙ্গিত করছেন কবি। প্রকৃতির এই বিভীষিকায় বাসযোগ্য আর থাকেনি সন্দীপ দ্বীপ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ'-এর দুর্দিনের কথা মনে পড়ে। কিন্তু এখানে অন্যরকম দুর্দিন। হাহাভাতের নয় বেঁচে থাকার—টিকে থাকার। 'আনন্দমঠ'-এ কল্যাণী মহেন্দ্র শিশুকন্যা নিয়ে পালাতে চাইছে। কিন্তু এখানে জলের ঢেউয়ে লাশশব বইছে। কোথায় পালাবে মানুষ? যারা এখনও জীবিত আছে। সেই দুর্দিনের কথা এই বয়ানে পাওয়া যায় নতুন করে। কবির স্বর হয়ে যায় বহুস্বর। কবিতাটির সকল উপাদান হয়ে ওঠেছে ক্ষুরধার গভীর অর্থময়। প্রতিদিনের আলো আর বাতাস এখানে আলাদা মাত্রায় প্রকাশিত সন্দীপ দ্বীপের পারিপার্শ্বে —পরিবেশেও। ঠিক বাক্যে বললে বলা যায় ঐ সময়ের সমসাময়িক পরিস্থিতি রূপকে সুগভীর আয়তনে ধরতে পেরেছেন কবি এখানে।

তারপর কবি শেষ স্তবকে গল্পের কথককে আর সামনে এনে দাঁড়িয়ে। দেখালেন যে এই মত্ত বিভীষিকার ইন্দ্রজালে বা মৃত্যু উপত্যকায় মানুষ দাঁড়িয়ে জীবনের জায়গা করতে পারে ওপার থেকে এসে এপারে—

''ঝড়ের সন্ধ্যায় সেই দীপ হাতে
দাঁড়ানো বধূটি
প্রাণপণ জল ভেঙে শেষরাতে
স্পর্শ করে মাটি
জীবনানন্দের গ্রামে দুর্যোগের
মৃত্য সে দেখেছে
তা-ই বলে যেতে বধূ সন্দীপের
এ'পারে এসেছে।''

'ঝড়ের সন্ধ্যায়' সন্দীপ দ্বীপ ঘিরে গেছে। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন আর সংকটময় স্থানে দাঁড়িয়ে 'দীপ হাতে' বধূটি মানুষকে আলো দেখাচ্ছে যে এই অন্ধকারেই হারিয়ে গেলে হবে না। তকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে আলো জ্বেলে। এই যে জীবনবোধ এটা জীবনের জয় ঘোষণা—থাইফুন মত্ত বিভীষিকা অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগ্রাম—তা অস্তিত্ব চেতনার গূঢ়ার্থ, সংকেত। বিপন্ন বা বিপজ্জনক সময়পরিসরকে অতিক্রম করার চরম উদ্যম—সমস্ত শব লাশ জল ভুলে গিয়ে নতুন করে বেঁচে থাকার জেগে ওঠার মন্ত্র দিচ্ছে এই বধুটি 'দীপ হাতে' নিয়ে দাঁড়িয়ে।

এই কাব্যের ভূমিকায় কবি বলছেন—

> ''সন্দীপ দীপের গল্প' শুধু পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশেরই ভয়ঙ্কর প্লাবনের 'গল্প' নয়, আমার আশৈশব তারুণ্যের ভূমি বরাক উপত্যকার 'গল্পও' তাই।''

এই বয়ানের ভেতরে শুধু সন্দীপ দ্বীপ বা বাংলাদেশের কথা নয় আন্তর্জাতিক চিন্তার প্রকাশ পেয়েছে। আর কবিতাটির সামগ্রিক বয়ানকে সামনে রেখে বলতে পারি আসলে এটা বিশ্বের সকল প্লাবনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন সুমাত্রা দ্বীপের কথা, চীনের কথা, ফিলিপিন্‌সের কথা ইত্যাদি। এখানে কবিতাটি বিশ্বজনীনতার মর্যাদা পেয়ে যায় তার বিষয়গত গূঢ়ার্থ, সংঙ্গার জন্য—সংকেত বিশ্বের জন্যও।

তোমাকে নিয়েই অবশেষে

''তোমাকে নিয়েই অবশেষে মাটির মৃদঙ্গ বাজানো হবে
ভাবতে পারিনি—
আকস্মিক
গানে গানে পাকা ধানে বৃষ্টি নামে মাঠে
এই নব আঘ্রানের মাঠে—''

এই বিস্ময়বোধ আর শূন্যতাপূর্ণ প্রেমের বার্তা দিয়ে শুরু করেছেন কবি বিজয়কুমার ভট্টাচার্য 'তোমাকে নিয়েই অবশেষে' কাব্যের নাম কবিতাটি। প্রথম স্তবকেই কবি অপ্রত্যাসিত বোধকে নিজের বয়ানে প্রকাশ করছেন প্রত্যাসিতভাবে। কারণ কবিও সমাজ সচেতন মানুষ—হয়তবা সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল সচেতন।

যে পথে যেতে চেয়েছিলেন জীবনকে নিয়ে পারেননি বা জীবনকে অন্যরকম করে গড়তে চেয়েছিলেন হয়নি। কিন্তু যাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন সব সময় হয়তবা অস্বীকারও করেছিলেন। আজ সেই পথ ধরেই চলতে হচ্ছে। এটা কিন্তু গ্লানি নয়—আত্মগ্লানিও নয়। তবে আফসোস নিশ্চয়। আর এই বোধের ফাঁকে সময় হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংযোজক বিয়োজক। পাকা ধান, গান, বৃষ্টি, অঘ্রাণের মাঠ আসলে এগুলি এক একটা সংকেত—যৌবনের প্রকাশ মাধ্যম। ছন্নছাড়া ছড়ানো যৌবনের প্রেমের ও ভালোবাসার সময়কে এক সূত্রে গেঁথে দিয়ে প্রকাশ করছেন পুরাতন এক জীবনবোধ—আজকের সময়ে। কিন্তু যা-ই করুন না কেন মানুষের যৌবন সারাজীবন তার সঙ্গে ইতিহাস হয়ে জীবিত

থাকে অবশেষ পর্যন্ত।

তারপর দ্বিতীয় স্তবকে যৌবনের বয়ানকে আরও প্রসারিত করলেন কবি—

"আমার যৌবন নিয়ে আমি ভীষণ ব্রিবত যখন
আমার যৌবন নিয়ে আমি ভীষণ বিব্রত যখন
সে সময় কুয়াশার বুক চিরে সুতীক্ষ্ণ আলোর মতো
সরল রেখায় তুমি চলে যাচ্ছো ধীর
তোমাকে দেখেই আজ কেন মনে পড়ে
গীতিকবিতার মতো সুগন্ধি বিষাদ,
আমাদের যাওয়া আসা—এ যেন বৃহৎ
গম্বুজ সংলগ্ন কোনো দীর্ঘ করিডোর।
উত্তরের অধিকার দেবে বলে তুমি বুঝি
নিজের ছায়াকেও সঙ্গে নিলে না!"

বলা হয় যৌবনকাল তীব্র চাপের কাল। সেই চাপপূর্ণ যৌবনের ছবি আঁকতে গিয়ে বলছেন যে যৌবন নিয়ে কবি যখন প্রচণ্ড বিব্রত। তখন সোজাসুজি 'তুমি' চলে গেছে কবিকে অতিক্রম করে। কিন্তু আজ সেই ছবিকে কবির মনে হয় 'সুগন্ধি বিষাদ'-এর মতো বা গীতি কবিতার মতো। কবিকে রেখে চলে গেছে কবির 'তুমি'—এমনকি তার ছায়াকেও সঙ্গে করে নেয়নি। আসলে এই তুমিই কিন্তু যৌবনের সময়পাখি। যা বড় চঞ্চল তরঙ্গময়। বয়সকে বাড়িয়ে একটা জায়গায় রেখে 'সময়' এগিয়ে গেল কবিকে ছেড়ে। সেই দুর্দম দুর্বার প্রাণশক্তিশীল সময়ই কিন্তু কবির 'তুমি' 'তোমাকে'ও। এই বয়ানের মধ্যে পাচ্ছি আবহমানকালের মানুষের যৌবনের 'সুগন্ধি বিষাদ' এবং 'গীতি কবিতা'। সময়ের যুগসন্ধিক্ষণ বড় হয়ে ওঠছে ভেতরে ভেতরে। আর তার বিপরীতে যৌবন আর উত্তর যৌবনকালের স্মৃতি ছবি মানচিত্র ইত্যাদির টানাপোড়েনে অনেকার্থদ্যোতক হয়ে ওঠছে বয়ানটা এবং কবিও এই করিডোর আঁকা যৌবনকালের চিত্র এঁকেছেন যৌবনের বিচিত্র উপাদানের অনুষঙ্গে। এই জিনিসটা আরও বেশি প্রকট হয়ে ওঠেছে কবি যখন বলেছেন—

"তুমি চলে গেলে—'

তারপর প্রাকৃতিক অনুসঙ্গে স্মৃতিকথা যৌবনের ছবি আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠেছে—

"আমি তো দেখলাম, নৈশপাখির ঠোঁটে
তৃতীয়াতিথির একটুক্‌রো চাঁদ ডেকেছিল, 'আয়—আয়—আয়...
রাতের সুগন্ধযুক্ত ফুল ফুটে বলেছিল, 'আয়—আয়—আয়...
অথচ জোছনা যে রৌদ্রের শুধু শুধু লুকোচুরি খেলা,
ফুল ফুটে ঝরে যায় পায় অবহেলা,
খুব দ্রুত, আগেভাগে, কথাগুলি তুমিই জানলে।"

কবিও গভীরভাবে বিশ্বাস করেন আমাদের অতীতই নির্ধারণ করে বর্তমান কীরকম হবে—আর বর্তমান ভবিষ্যতকে। তবু কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়কাল যৌবনের অতীতটা সবচেয়ে প্রগাঢ়—সুগভীর। তার কাছে বাকি সকল খণ্ড সময়কাল হেরে যায় তার নিজস্ব উজ্জ্বলতায়। এই স্মৃতিপূর্ণ যৌবনকালের সীমানা বেড়ে যায় সারাজীবনের চেয়ে ঢের বেশি। এই যে সময়চেতনা তাকেই কবি এখানে গভীর মূল্যবান করে তুলেছেন, প্রকৃতির উপদানে বর্ণনা করে।

সময় দিনরাতের মতো ঘুরে ঘুরে খেলা করে কালকে এগিয়ে নিয়ে যায় শারীরিক পরিসরে। কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে এই গভীর সময়কালই সবকিছু জেনে নেয় ব্যক্তিসত্তার চেয়ে অনেক আগে —ব্যক্তিমানুষকে অতিক্রম করে। সময়ের এই ঘূর্ণাবর্তকে কবি এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন কালজ্ঞানের কূটাভাসে।

কিন্তু কবিতাটির শেষ স্তবকে এই সময়ের উপসংহারপূর্ণ একটা পরিণতির দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন শব্দ নৈঃশব্দ্যের দ্যোতনায়—

''আজ সারাদিন আমার ফুস্‌ফুসে ছিল
কড়া তামাকের ধোঁয়া,
পাকস্থলীতে এককণা শস্যও ছিলনা, অথচ যখন
মৃত্তিকার ঢাল বেয়ে মানুষের ঝরে পড়া
ঘর্মবিন্দুগুলি
পাকা ধানে সাফল্যের হাস্য নিয়ে এল
তখন তোমার চিতার আগুনে হল আকাশটা বড়ো বেশি লাল
আমাদের স্বর্ণশস্য পুড়ে পুড়ে ছাই হয়
শেষ হয় ক্ষীণ আয়ুষ্কাল!

শরীরের যে বয়স হয় আর বয়সের ভারে তার শক্তি জীবনশক্তি কমে আসে এই কথাটির কথা বলছেন এখানে। এই স্তবকের মধ্যে সময় আর কবির প্রিয়া একাকার হয়ে গেছে। ফুসফুসে বিষাক্ত বাতাস, সাম্যহীন পাকস্থলী এইসব কিছু অতিক্রম করে মানুষ এগিয়ে যায়। কবিও অতিক্রম করেছেন। পাকা ধানের মতো সাফল্যের হাসিও দেখতে পান, কিন্তু তখন 'সময়' আর নেই তার। প্রিয়ার ভালোবাসা ও প্রেমের জন্য এই আততি তা তো জীবনচাষের নামান্তর। কবির সকল পথে জীবনের সকল বাঁকে ছিল সেই সব জীবনময় উপাদান। কিন্তু জীবনের অবশেষে প্রিয়ার চিতার আগুনে তার জীবনের সকল আকাশ লাল হয়ে ওঠল। পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখেন কিছুই নেই শুধু নৈঃশব্দ্য ছাড়া। কবির সকল স্বপ্ন কল্পনা 'স্বর্ণশস্য পুড়ে পুড়ে ছাই হয়'। আর ক্রমে আয়ুষ্কাল ক্ষীণ হতে থাকে। এখানে মৃত্যুচেতনায় কবিতাটির শেষ হয়েছে। জীবনের একটা অধারাবাহিক যাত্রা প্রকাশ পেয়েছে এখানে।

সময়ের বয়ে যাওয়াটাই বড় কথা নয়। সময় ও জীবনের কূটাভাসের কথাই বড় কথা। অর্থাৎ জীবনের সকল সংগ্রাম দ্বন্দ্ব অস্তিত্বচেতনা জীবনবোধ এবং তার ভেতরে ভালোবাসা ও প্রেমের মাত্রা। সব মিলিয়ে কবিতাটি পরা-বিবরণের দ্যোতনায় আকীর্ণ। এই বহুস্বরিক পাঠকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে সংকেতময় জীবনের একটা অখণ্ড রূপ। আর তার মর্মে বিধৃত আছে সময় অর্থাৎ কালজ্ঞান।

হে আমার দর্পণে বিম্বিত মুখ

''আশির দশকের শুরু থেকেই বরাক উপত্যকায় বাংলা কবিতার ভুবনে বিজয়কুমার ভট্টাচার্য এক উজ্জ্বল নাম। প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ও আধুনিক মননে বিজয় এক ব্যতিক্রমী কবি। এক প্রতিবাদী কণ্ঠ তাঁর কবিতার সর্বত্র বিরাজিত। তাঁর কাব্যে সমকালীন আসাম তথা বরাকের পরিস্থিতি ও উত্তেজনাকর অস্বস্তিকর অনিশ্চিত অবস্থা ফুটে উঠেছে আশ্চর্য দক্ষতায়।''[৭৮]

সমালোচক সসামগ্রিকভাবে আলোচনা করে কবি বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের কবিতা সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন। আর ঠিকই কবি বিজয়ের মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে ১৯ মের রক্তাক্ত কাহিনি, আসামের বাঙালির অস্তিত্বের সংকটের গল্প,, উদ্বাস্তু বাঙালির করুন কাহিনি। কিন্তু এই সব কিছু পার হয়ে গিয়ে এমন অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখেছেন যা আসলে আজকের সময়ের মানুষের বিম্বিত মুখের ছবির কথা। অস্তিত্ব সংকট, বেঁচে থাকা, নাগরিক বিষণ্ণতা, অনাগরিক জীবনের হীনমান্যতা ইত্যাদি তাঁর কবিতাকে আলাদা একটা মাত্রা দিয়েছে। এ রকমই একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা হল—'হে আমার দর্পণে বিম্বিত মুখ' কাব্যের নাম কবিতাটি। কবিতাটির শুরু হয়েছে এ রকমভাবে—

''জানি না, কখন সে ফিরে এলো নির্বাসন শেষে
বোধহয়,
একটি সূর্যোদয়ের সকাল, তোমার কপাল থেকে
সিঁদুরের লাল তুলে নিয়ে
সে হলো গর্বিত—

জানি না কখন সে
ফিরে আসে দুঃসাহসের মতো।"

এই অমোঘ উচ্চারণ দিয়ে কবিতাটির যাত্রারম্ভ। অস্তিত্বের মূল খুঁড়ে খুঁড়ে দেখতে চান। এই সব কথার ভেতরে লুকিয়ে আছে হারিয়ে যাওয়া বস্তু বা অস্তিত্বের সন্ধান। আর এই জিনিসটা কিন্তু ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে গিয়ে নৈর্ব্যক্তিকতায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

এই প্রথম স্তবকে দর্পণের বিম্বিত মুখের ছবির ভূমিকা করেছেন যেন। শব্দ কীভাবে নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে মিলেমিশে সিঁড়ি নির্মাণ করে এবং বহুস্বরিকতার দিকে সংকেত দেয়। এই কথাটির ভেতরে অনেক কিছু প্রকাশ পাচ্ছে। চারদিকে অন্ধকার, মায়ার ফাঁদ, সোনার খাঁচা, কৃত্রিমতা, বিলাসীতা, মুখোশ, যৌনতার বিষাদ সব মিলিয়ে জীবন ক্রমে অবনতির দিকে যাচ্ছে। এই সব ভিড় সাঁতরে কখনও দর্পণের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় নিজেদের আপন রূপ কত বিম্বিত—বিকৃতও। এই নিজস্বতাহীনতার নৈরাজ্যে সকলই তো নির্বাসনে। এখানে আসলে আমরা প্রত্যেকই অন্যরকম নির্মিত হই—হয়ে যাই অন্যরকম। তাই এই নিনর্বাসন কাটানোর পরও বুঝতে পারি না যে আমরা কত বিম্বিত মুখ নিয়ে বেঁচে আছি এই পৃথিবীতে।

তারপর কবি 'বিম্বিত মুখ' বদলানোর চেষ্টা করেছেন। কারণ কবি জানেন আয়নায় নিজের আসল চেহারা দেখা যায় না নিজের মুখ বিম্বিত থাকলে —

"হে আমার দর্পণে বিম্বিত মুখ
আমার একাকী থাকার দুঃখ এবং সুখ।
তুমি প্রাজ্ঞ হয়ে ওঠো এইবেলা;
যে জলে দিয়েছো ঢেউ, সে জলের বিপরীতমুখী স্রোতে
তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে
সাঁতারের উপযোগী ভেলা।"

এই স্তবকের তাৎপর্য হল 'বিম্বিত মুখ' নিঙড়ে নিয়ে আপন মুখের সন্ধান। আমরা প্রত্যেকই জানি রহস্যের মতো যে এই বিম্বিত মুখ নিয়েই বেঁচে থাকি—আছি দুঃখে বা সুখে। যে রকম তরঙের সঙ্গে স্রোতে মিশে বিম্বিত হয়েছে এই মুখ। কবি তার বিপরীতে গিয়ে খুঁজে নিতে চান 'সাঁতারের উপযোগী ভেলা' । অর্থাৎ বিম্বিত মুখের থেকে সরে গিয়ে নিজেকে পরিস্কার করে দেখার প্রচেষ্টা। কারণ কবি বিশ্বাস করেন মানুষ যতক্ষণ নিজেকে না জানে, না বুঝে, না দেখে ততক্ষণ সে চিন্তাই করতে পারে না যে সে আসলে কতটা জালে আবৃত—কতটা অন্ধকারেও।

অস্তিত্ব খণ্ড খণ্ড হয়ে মানুষ শত খণ্ডে বিভক্ত। সে সম্পূর্ণ নয় এবং কোনও খণ্ডের মধ্যেই সে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে না—পাবেও না। ভাঙন আর দহনের কূটাভাসে আজকের জীবন। নতুন নির্মাণের কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ সত্তা শত খণ্ডে খণ্ডিত। চমৎকারভাবে ফুটে ওঠেছে এখানে আজকের মানুষের ছবি—বিম্বিত মুখ। আর কবি এখান থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে গিয়ে খুঁজছেন হাতিয়ার।

তারপর পরবর্তী স্তবকে প্রকৃতির উপাদান টেনে বিষয়টা আরও গভীর করে তুলেছেন—

"সমস্ত দিনের শেষে, এই রাত্রি তার
তমসার স্বাস্থ্যবর্তী শরীর বিছিয়ে শুয়ে আছে—
দু'একটি নক্ষত্র দ্যাখো, ম্লানালোয়
গোপন উদ্ভাসগুলি ফুটিয়ে তুলেছে—
কয়েকটি সুপক্ক ফলের বল্কল চুঁইয়ে, এসময়, ঝরে যাচ্ছে
গ্রীষ্মের ঘামের মতো বিন্দু বিন্দু মদ..."

আজকের সময়ে মানুষ সচেতনভাবে বিষ খেয়ে নাগরিক মাতাল হয়ে বেঁচে থাকতে আনন্দ পায়। দিনের সব আলো রাত্রির তমসাপূর্ণ শরীর বিছিয়ে শুয়ে আছে জীবনে। দু'একটি নক্ষত্রে দেখে আমরা আসলে আমাদের ম্লান

আলোকে উজ্জ্বল করে রাখতে চাই। আমরা ভুলে যাই আকাশে আরও লক্ষকোটি তারা নক্ষত্র আছে—জীবনেও। আমাদের সকল কাজের ফল চুঁইয়ে ঝরছে বিন্দু বিন্দু মদ—পরিশ্রমী শরীরের ঘামের মতো। কিন্তু এখানে জীবনবোধ আর জীবন আনন্দ কতটুকু? আসলে মুখোশ পরা জীবনের আগাগোড়াই ফাঁদ আর বাঁধে বন্দি। এই অন্তর্জালকে ভেঙে মুক্তির দিকে ইঙ্গিত করছেন কবি।

দুর্বলতাপূর্ণ ব্যক্তিসত্তাকে সবলতায় পূর্ণ করতে চান কবি। তা না হলে ঐতিহ্য, সমাজ, ইতিহাস ইত্যাদি অনুসঙ্গে প্রসঙ্গে ব্যক্তিসত্তাকে সমৃদ্ধ করা যাবে না। এই বোধটাও কাজ করছে ভেতরে ভেতরে। প্রকৃতি ক্রমে আমাদের জীবনের থেকে কমিয়ে নিচ্ছে তার উর্বরতা। তাই ক্রমে মানুষ যান্ত্রিক বা কোনও জিনিস হয়ে যাচ্ছি—হয়তবা যন্ত্রও। সে জন্যই তো মানুষের প্রতিবিম্ব এত বেশি। আসল ছবি সোনার হরিণের মতো পলাতক। আধুনিকতার নামে মিথ্যা, মুখোশ, রঙ সব নেতিবাচক বোধকে আকড়ে ধরে শেকড়কে ভুলে যাওয়া। এ কী আধুনিক জীবন? আধুনিকতা?

তার পরবর্তী স্তবকে সমস্ত মিথ্যা মুখোশকে অতিক্রম করে নিজের ছবি পরিস্কার করে একটা অর্থমানেসহ নির্মান করার প্রয়াস দেখা যায়—

> "হে আমার দর্পণে বিম্বিত মুখ
> তুমি প্রাজ্ঞ হয়ে ওঠো এই বেলা। খেলাচ্ছলে,
> যে-জলে দিয়েছো ঢেউ, সে জলেই ম্লান সেরে
> উঠে এসেছে বসুন্ধরা ঃ
> আগুনের পোড়া মাটি—
> তোমাকে তো স্পর্ধাশীল যুবকের মতো ঘুরে দাঁড়াতেই হবে
> কবচকুণ্ডলে পরিপাটি।"

সমস্ত চেনা জগৎ ক্রমে অচেনা হয়ে উঠে বিম্বিত মুখের সামনে। তাই কবি 'বিম্বিত মুখ'-কে প্রাজ্ঞ করে তুলতে চান নিজস্ব পরিসরের আয়নায় ম্লান করে। কারণ এই আয়নায় পৃথিবী নিজেকে ধুয়ে উঠেছে এই বিম্বিত মুখের আড়ালে। এই পৃথিবীর সকল আলো জল আগুনকে অতিক্রম করে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য মন্ত্র দিচ্ছেন। যেখানে টিকে থাকার কথাটাই বড় হয়ে ওঠেছে। সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে চুরমার করে দিয়ে একটা সামগ্রিক জীবনবোধ নির্মাণের ইঙ্গিত দিচ্ছেন, এই বয়ানের গভীরে। আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মবিস্তার এই ভাববস্তুকে দ্বিবাচনিকতায় ফুটে তুলতে চান। সময়ের অন্তর্বস্তু আছে কিন্তু তার মর্মে জীবনের সকল দিক আরোপিত মুখোশে আবৃত। এই জালকে ভেঙে ফেলার এক সাহসী প্রচেষ্টা আছে এই কবিতায়।

আরেকটা জিনিস কবি বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের কবিতায় বিশেষ করে কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় আগাগোড়া একটা সামগ্রিক মানে অর্থ মিল আছে। কবিতার শারীরিক ও অন্তর্বস্তুর মিল আছে সংযোগ আছে। কেন না তাঁর বেশিরভাগ কবিতাই কিন্তু বিবরণধর্মী। তাই ধারাবাহিকভাবে অন্তর্বস্তু বহির্বস্তু প্রকাশিত হয়। এখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যও মনে রাখতে হবে যে কবি বিজয়কুমার ভট্টাচার্য তাঁর কবিতায় বয়ানে সমস্ত আরোপিত আধুনিকতাকে প্রত্যখ্যান করার একটা দৃঢ় চেষ্টা করেন। নাগরিক জীবনের বিষণ্ণতা আছে তাঁর কবিতায় কিন্তু অন্যরকম—এবং ছদ্ম নাগরিকতার কথাও। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা খুলে দেখাতে চেয়েছেন তা হল আধুনিক জীবনের অবক্ষয়, মানুষের মিথ্যা বিবর্তন রূপান্তর, শেকড়হীনতার উশৃংখলতা, ঔপনিবেশিকতার জাল সব মিলিয়ে যদি সামগ্রিকভাবে দেখি তাঁর কবিতাকে তবে বলা যায় তাঁর কবিতা গভীর প্রগতিশীল সমসাময়িক সময়ের উপাদানে ভরপুর।

এই অধ্যায়ে বিশ্লেষিত নির্বাচিত কবিতার কবি ছাড়া অন্যান্য অনেক কবি যেমন, ছবি গুপ্তা, দিলীপকান্তি লস্কর, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, আবুল হোসেন মজুমদার, মহুয়া চৌধুরী, অশোক বার্মা, ভক্ত সিং, জয়দেব ভট্টাচার্য, ইত্যাদি এ উপত্যকার কবিতার ভৌগোলিক অঞ্চল আরও বিস্তারিত করেছেন নিজস্ব প্রতিভায়, শৈলীতে, স্বাতন্ত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে। এবং এইসব কবিদের মধ্যে বেশির ভাগ কবি এখনও অবিরাম কবিতা রচনা করে এগিয়ে যাচ্ছেন কালের যাত্রায়।

তথ্যসূত্র—

বাংলা

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—'আধুনিক কাব্য', বৈশাখ সংখ্যা, প্রবাসী, কলকাতা, ১৩৩৯।

২। বসু, বুদ্ধদেব (সম্পাঃ)— 'আধুনিক বাংলা কবিতা', এম.সি সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা-৭৩, ২০০৭, পৃঃ-৭।

৩। তদেব, পৃঃ-৭।

৪। আইয়ুব, আবু সায়ীদ—'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৯২, পৃঃ-১২।

৫। দাশ, জীবনানন্দ—'কবিতার কথা', সিগনেট প্রেস, কলকাতা-৭৩, ১৪০৫, পৃঃ-১১২।

৬। তদেব, পৃঃ-২৩।

৭। সমীর, চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ) —'শক্তিপদ ব্রহ্মচারী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য—সৃষ্টির অভিমুখ', পত্রলেখা, কলকাতা-৯, ২০১০, পৃঃ-১৮।

৮। ত্রিপাঠী, দিপ্তী—'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৭।

৯। মজুমদার, সুশান্ত প্রভৃতি (সম্পাঃ)—আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ', অনুষ্টুপ, কলকাতা-৯, ১৯৯৬।

১০। জ্যোতি, হাসান (সম্পাঃ) —'বারুদ', শিলচর, আসাম, ২০০৫।

১১। চট্টোপাধ্যায়, সমীর (সম্পাঃ)—'বাচন আর নৈঃশব্দের যুগলবন্দি তপোধীর ভট্টাচার্যের কবিতা', পত্রলেখা, কলকাতা-৯, ২০১০, পৃঃ-৪৬।

১২। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'আধুনিকতা ঙ্ম পর্ব থেকে পর্বান্তর', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, ১৯৯৫।

১৩। গগৈ, লীলা (সম্পাঃ)—'আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের পরিচয়', ডিব্রুগড়, আসাম, ১৯৯০।

১৪। ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন (সম্পাঃ)— ফুকন, হলিরাম ডেকিয়াল—'আসাম বুরঞ্জী', মোক্ষদা পুস্তকালয়, গুয়াহাটি, আসাম, ১৯৬২।

১৫। কর, সুবীর—'বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস', করিমগঞ্জ, আসাম, ১৯৯১, পৃঃ-১১৭।

১৬। তদেব, পৃঃ-১১৭-১১৮।

১৭। তদেব, পৃঃ-১০১-১০২।

১৮। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'আমাদের কবিতা, ওদের আধুনিকতা', পাণ্ডুলিপি ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আসাম, শিলচর, পৃঃ-১৮।

১৯। ব্রহ্মচারী, শক্তিপদ—'শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা-১৭, ১৯৯৫।

২০। দে, কুমার বিষ্ণু—'সুরমা বরাকের কবি ও কবিতার কথা', স্বপ্ন, লামডিং, আসাম, ২০১২, পৃঃ-৮৬-৮৭।

২১। দাশ, জীবনানন্দ—'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', নাভানা, কলকাতা-১৩, ১৩৭০, পৃঃ-১৩১।

২২। দেবনাথ, ননীগোপাল (সম্পাঃ)—'ঈশান বাংলার কবি ও কবিতা', অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ত্রিপুরা-১, ২০১১, পৃঃ-১৩০।

২৩। দাশ, জীবনানন্দ—'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', নাভানা, কলকাতা-১৩, ১৩৭০, পৃঃ-৩৩।

২৪। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২২১।

২৫। দাশ, জীবনানন্দ—'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', নাভানা, কলকাতা-১৩, ১৩৭০, পৃঃ-৬৬।

২৬। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২১৫।

২৭। তদেব, পৃঃ-২১৯।
২৮। দেবনাথ, ননীগোপাল (সম্পাঃ)—'ঈশান বাংলার কবি ও কবিতা', অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ত্রিপুরা-১, ২০১১, পৃঃ-১২৯।
২৯। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২২৪।
৩০। ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার (সম্পাঃ)—'অতন্দ্র এবং বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা, সাহিত্য প্রকাশনী, হাইলাকান্দি, আসাম, ১৯৮৮, পৃঃ-৪৫।
৩১। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২২৩।
৩২। চৌধুরী, বিমল—'কেবল খেলা', সাহিত্য প্রকাশনী, হাইলাকান্দি, আসাম, ২০০৪।
৩৩। তদেব, আমার কথা।
৩৪। দেবনাথ, ননীগোপাল—'ঈশান বাংলার কবি ও কবিতা', অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ত্রিপুরা-১ ২০১১, পৃঃ-১৪০।
৩৫। দেবনাথ, ননীগোপাল (সম্পাঃ)—'ঈশান বাংলার কবি ও কবিতা', অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ত্রিপুরা-১, ২০১১, পৃঃ-১৩৪।
৩৬। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২৩৩-২৩৪।
৩৭। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২৩৪।
৩৮। ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার (সম্পাঃ)—' অতন্দ্র এবং বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা', সাহিত্য প্রকাশনী, হাইলাকান্দি, আসাম, ১৯৮৮।
৩৯। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২৩৬।
৪০। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২৩৭।
৪১। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২২৪।
৪২। গুণ, সুমন প্রভৃতি (সম্পাঃ)—'আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ বৈচিত্র্য ও বিস্তার', রত্নাবলী কলকাতা-৯, ২০১২, পৃঃ-১০৩।
৪৩। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২২৪।
৪৪। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২২৫।
৪৫। ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার (সম্পাঃ)—'অতন্দ্র এবং বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা', সাহিত্য প্রকাশনী, হাইলাকান্দি, আসাম, ১৯৮৮।
৪৬। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২২৬।
৪৭। পুরকায়স্থ, রমা—'বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা', অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ২০০৫, পৃঃ-১০৭।
৪৮। পুরকায়স্থ, রমা—'বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা', অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ২০০৫, পৃঃ-৯৪।
৪৯। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২২৮।
৫০। তদেব, পৃঃ-২২৮।
৫১। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০১৫, পৃঃ-১৪১।
৫২। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২৪২।
৫৩। চট্টোপাধ্যায়, সমীর (সম্পাঃ)— 'বাচন আর নৈঃশব্দ্যের যুগলবন্দি তপোধীর ভট্টাচার্যের কবিতা', পত্রলেখা, কলকাতা-৯, ২০১২, সূচনা।

৫৪। দাশ, জীবনানন্দ—'জীবননন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', নাভানা, কলকাতা-১৩, ১৩৭০, পৃঃ-৮৩।
৫৫। ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার (সম্পাঃ)— 'অতন্দ্র এবং বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা', সাহিত্য প্রকাশনী, হাইলাকান্দি, আসাম, ১৯৮৮।
৫৬। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২৪১।
৫৭। দেবচৌধুরী, অমিতাভ ও সাহা, তমোজিৎ (সম্পাঃ)— 'বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতা', শিলচর, আসাম, ২০১৩, ভূমিকা।
৫৮। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-১৪১।
৫৯। সামন্ত, সুবল (সম্পাঃ)—'বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা-১', এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৯০, ১৯৯৯।
৬০। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩।
৬১। সামন্ত, সুবল (সম্পাঃ)—'বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা-১', এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৯০, ১৯৯৯।
৬২। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩।
৬৩। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩।
৬৪। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩।
৬৫। দে, কুমার বিষ্ণু—'সুরমা বরাকের কবি ও কবিতার কথা', স্বপ্ন, লামডিং, আসাম, ২০১২, পৃঃ-১২৩-১২৪।
৬৬। তদেব, পৃঃ-১২৪ ।
৬৭। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২৫০।
৬৮। বিশ্বাস, অনুরূপা—'অদ্ভুত আঁধার এক', (আমার কথা), শিলচর, ১৯৮০।
৬৯। বিশ্বাস অনুরূপা—'তৃষ্ণার ভৃঙ্গার', প্রাক্‌কথা, শিলচর—২০০০।
৭০। বিশ্বাস, অনুরূপা— 'আমার সাহিত্যজীবন', প্রবাহ—৫ম বর্ষ ৩য় প্রকাশ ১৯৯১
৭১। ব্রহ্মচারী, শক্তিপদ ও চৌধুরী, বিশ্বতোষ (সম্পাঃ)—'ঈশানের পুঞ্জমেঘ', বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর, আসাম ১৯৯১, পৃঃ-১২
৭২। দে, কুমার বিষ্ণু—'সুরমা বরাকের কবি ও কবিতার কথা', স্বপ্ন, লামডিং, আসাম, ২০১২, পৃঃ-১০৫
৭৩। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার বহুস্বর', প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৯, পৃঃ-১৭৯।
৭৪। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২৫০
৭৫। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'কবিতার রূপান্তর', সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০৩, পৃঃ-২৪৯
৭৬। ভট্টাচার্য, বিজয়কুমার—'কবিতা সংগ্রহ-১', শিল্পী প্রকাশনী, শিলচর-৫, ২০১৪, পৃঃ-৪৩৬।
৭৭। তদেব, পৃঃ-৪৩৭।
৭৮। পুরকায়স্থ, রমা—'বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা', অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ২০০৫, পৃঃ-১১৫।

English

1. Stillinger, Jack & Lynch, Deidre Shauna (Ed) – "The Norton Anthology of English Literature- The Romantic Period", (8th ed), ww. Norton & Company, 500 fifth Avenue, New York-10110, 2006, Page No-906.
2. Jacques, Derrida– "Of Grammatology", (Translated by Gayatri Chakravorty Spivak) Johns Hopkins University Press, London, 1976.

3. Frued, Sigmund – "The Ego and the Id", (Trans & Ed by Tames Strachey) London, 1961.
4. Adam, Laurie Schneider– " Art across Time", McGraw Hill (3rd Ed), New York-I0020, 2007.
5. Moi, Toril– " Sexual Textual Politics", Routledge, London, 1994.
6. Lazarus, Neil (Ed) – "Postcolonial Literary Studies", Cambridge University Press, New York 2004.
7. Lucy, Nail– 'Postmodern Literary Theory', Blackwell Publishers Ltd, UK, 2002, Preface–viii.
8. Ibid, Preface–ix.
9. Carter, Ronald & McRae, Johan– "The Routledge History of Literature in English, Britain and Ireland". Routledge, London, 1997, Page No–449.
10. Shillong Times, 29th August, 1947, Assam.
11. Assam Assembly Proceeding, 1948, page-585.
12. Cachar District Records, June 1834, Silchar, (Ed).
13. Wells, Stanlay (Ed) – "Shakespeare Studies", The Cambridge University Press, New York, 1992.
14. Fraser, G.S. (Ed) – "Keats : Odes," The Macmillan Press ltd. (15th Ed), London, 1993.
15. Moody, David A– "Thomas Stearns Eliot poet", Cambridge University Press, New York, 1994.
16. Stallworthy, Jon & Ramazani, Jahan (Ed) – "The Norton Anthology of Englsih Literature -The Twentieth Century and After", (8th Ed) WWW. Norton & Company, 500 fifth Avenue, New York-10110, 2006. Page No - 2319-2325.
17. Stillinger, Jack & Lynch, Deidre Shauna (Ed) – "The Norton Anthology of English Literature- The Romantic Period", (8th ed), ww. Norton & Company, 500 fifth Avenue, New York-10110, 2006, Page No–670.
18. Jump, John (Ed) – " Shakespeare : Hamlet", The Macmillan Press Ltd, London, 1994.
19. Cox, B.C and Hinchliffe, P. Arnold (Ed) – "T.S.Eliot : The Waste Land", The Macmillan Press Ltd, London, 1993.
20. Stallworthy, Jon & Ramazani, Jahan (Ed) – "The Norton Anthology of Englsih Literature -The Twentieth Century and After", (8th Ed) WWW. Norton & Company, 500 fifth Avenue, New York-10110, 2006. Page No - 2312-2313.
21. Geddes & Grosset (Ed)– "The Complete Works of William Shakespeare", David Dale House, Scotland, 2006. Page No-521-536.
22. Holt, Henry (Ed) – " The Complete Poems of Robert Frost", Henry Holt and Company, London, 1949.